
ইতিহাস
পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ্ কর্তৃক নব-প্রবর্তিত ইতিহাসের সিলেবাস অনুসারে
অষ্টম শ্রেণীর জন্য লিখিত।

Vide Circular No. Syll/81/2, Dated 30. 4. 81.
and also Circular No. Syll/82/5, Dated 21. 9. 82.

ইতিহাস পরিচয়

[আধুনিক যুগ]

॥ অষ্টম শ্রেণীর জন্য ॥

Submission No. Syll/H/8/82/87 dated 30.12.82

শ্রীকমলেশচন্দ্র লাহিড়ী, এম. এ.
প্রধান অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ,
ত্রিবেণী দেবী ভালোটিয়া কলেজ, রাণীগঞ্জ, বর্ধমান।
ইতিহাস পরিচয় (৬ষ্ঠ ও ৭ম) গ্রন্থের গ্রন্থকার
প্রণীত

পরিমার্জিত সংস্করণ

চলন্তিকা প্রকাশক
৪ কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯।

প্রকাশক :
শ্রীতপনকুমার চৌধুরী
চলন্তিকা প্রকাশক
৪, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ—ডিসেম্বর, ১৯৮১
দ্বিতীয় প্রকাশ—ডিসেম্বর, ১৯৮২
তৃতীয় প্রকাশ—জানুয়ারি, ১৯৮৫

মূল্য : চৌদ্দ টাকা মাত্র

মুদ্রক :
শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক নবনির্ধারিত অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুযায়ী "ইতিহাস পরিচয়—আধুনিক যুগ" বইটি লিখিত হলো। পর্ষদের নির্ধারিত পাঠ্যসূচী ও তৎসংক্রান্ত নির্দেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়েছে এবং অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রহণ-যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন থেকেছি। প্রশ্নপত্রের পরিবর্তিত পদ্ধতির কথা মনে রেখে পরিশিষ্ট অংশে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী এবং বিশিষ্ট ঘটনার সন-তারিখ দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য লিখিত বইটি তাদের প্রত্যাশিত আশা মেটাতে পারবে ব'লে বিশ্বাস রাখি। বর্তমান পরিমার্জিত সংস্করণে কিছু কিছু সংযোজন ও সংশোধনে সচেষ্ট হয়েছি। তবুও মুদ্রণ-প্রমাদ ও ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। বইটি সম্পর্কে সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সহযোগিতা কামনা করি ও বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করতে তাঁদের উপদেশ প্রার্থনা করি। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রীমতী সুনন্দা লাহিড়ী ও চলন্তিকা প্রকাশকের কর্ণধার শ্রীতপনকুমার চৌধুরীর আন্তরিক উৎসাহ ও সহায়তা পেয়েছি। তাঁদের আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

টি. ডি. বি. কলেজ
রানীগঞ্জ, বর্ধমান

কমলেশচন্দ্র লাহিড়ী

সিলেবাস

১। **আধুনিক যুগ :** ইউরোপের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন : সামন্তপ্রথার অবক্ষয়—কৃষি-উৎপাদন প্রণালীর কিছু উন্নয়ন—শিল্পোৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পশ্চাতে নূতন নূতন ফসল উৎপাদনের অবদান—ইহার প্রভাব।

২। **ইউরোপের নবজাগরণ :** (অত্যন্ত সহজ ও সরল উপস্থাপন বাঞ্ছনীয়) (ক) ইহার স্বরূপ—দ্বাদশ শতাব্দী হইতে প্রবহমান এক বিবর্তনের ধারা কনস্ট্যান্টি-নোপ্‌লের পতনের দ্বারা (১৪৫৩) উদ্দীপিত—প্রাচীন গ্রীক ও রোমক জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবন—বৈজ্ঞানিক সত্য ও যাথার্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধা—প্রাচীন গ্রীক জীবনচর্চার পুনঃপ্রতিষ্ঠা—পরলোক-চিন্তা ও যাজকের মধ্যস্থতার প্রতি অনাস্থা—প্রথাগত কর্তৃত্বে অবিশ্বাস—প্রাকৃতিক ঘটনার পশ্চাতে ঐশ্বরিক কোন অবদানকে অস্বীকার—যুক্তিবাদী মন লইয়া জীবন অনুসন্ধান—মানুষের গতানুগতিক সংস্কারকে জীয়াইয়া রাখিবার জন্য ক্যাথলিক চার্চের ব্যর্থ প্রয়াস—ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে যুক্তিগ্রাহ্য অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ ও প্রসার। (খ) ইটালীর নেতৃত্বদান—শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতায় ফ্লোরেন্সের ধনী বণিকদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা—তথা হইতে মিলান, রোম এবং অন্যান্য নগর-রাষ্ট্রে তাহার বিস্তার—অতঃপর আল্পস্ পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া জার্মানি ফ্ল্যাণ্ডার্স, নেদার-ল্যাণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে উহার অনুপ্রবেশ।

(i) **নব বোধোদয় বা মানবতাবাদ :** পরিশীলিত মাতৃভাষার মাধ্যমে

সাহিত্যের বিকাশ : সেই পরিপ্রেক্ষিতে দান্তে, পেত্রার্ক, মেকিয়াভেলি, বোকাচ্চিও, স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন্, চসার, স্পেন্সার, শেকস্পীয়র, ইরাস্মাস, সার্ভান্তিস্ ও রাবেলের অবদান।

(ii) **শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ :** (অঙ্কন, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প) লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, রাফায়েল, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো।

(iii) **বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ :** রোজার বেকন্, স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন্, লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, গুটেন্বার্গ (মুদ্রাযন্ত্র)।

৩। **ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার :** পরিবর্তিত অর্থনীতি ও ইটালীর নবজাগরণের মূলভাব পর্তুগাল ও স্পেনের দুঃসাহসী নাবিকদের উন্নতমানের বিভিন্ন যন্ত্রের (দিক্নির্ণয় ও উচ্চতামাপক যন্ত্র) সাহায্যে নূতন নূতন দেশ আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করিল—প্রিন্স হেনেরী, বার্থেলোমিউ ডিয়াজ, আল্বুকার্ক, ভাস্কো-দা-গামা, কেব্রাল, কলম্বাস, বাল্বোয়া, আমেরিগো ভেস্পুচি, ম্যাগেলান। ফলশ্রুতি : (ক) মানুষের ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধি—নব-আবিষ্কৃত মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত পরিচিত। (খ) জলপথ ভূপ্রদক্ষিণ (গ) বাণিজ্যের প্রসার—উপনিবেশ স্থাপন—ঔপনিবেশিক শোষণ—স্পেনীয় নাবিকদের রাজ্যজয়। (ঘ) জাতিসমূহের সংগঠন ও উত্থান।

৪। **ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন :** (ক) ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—এই প্রসঙ্গে জন ওয়াইক্লিফ, জন হাস্ ও মার্টিন লুথারের বাণী ও কর্মপদ্ধতি (গল্পচ্ছলে)। (খ) ফলাফল—জার্মানির কয়েকটি রাজ্যে লুথরান অথবা প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রতিষ্ঠা—উত্তর ইউরোপ, ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের প্রসার। (গ) ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরীণ সংস্কার : (১) অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংহতির প্রয়োজন—যাজকদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন—দমনমূলক নীতি প্রয়োগ এবং যাজকদের বিচার-সভায় (Inquisition Court) বিচারের দ্বারা প্রচলিত ধর্মমত বিরোধীদের মতবাদের উচ্ছেদসাধন—জেসুইট সোসাইটি কাউন্সিল অফ্ ট্রেণ্ট (১৫৪৫-১৫৬৩)। (ক্যাথলিক চার্চের অন্ধবিশ্বাসের বিবরণ উপেক্ষা করিয়া কেবল প্রসঙ্গ উল্লেখ করিলেই চলিবে)। (২) পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ—প্রোটেস্ট্যান্ট রাজ্য-সমবায় বনাম পঞ্চম চার্লস্ (১৫৪৬-১৫৫৫)—অগ্‌স্বার্গের সন্ধি—১৫৫৫। (ঘ) নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উচ্ছেদসাধনে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা—তাঁহার অপশাসন ও প্রজাদের উপর অত্যধিক করস্থাপনের ফলে উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জের নেতৃত্বে ওলন্দাজ বিদ্রোহ—উহার ফলাফল—১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদের স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং ডাচ প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা—দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডে (অষ্ট্রিয় নেদারল্যাণ্ড) বেলজিয়াম নামে পরিচিত হইল (ক্যাথলিক রাজ্য)। (ঙ) প্রোটেস্ট্যান্ট ইংলণ্ড ও উহার চার্চকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আনয়নের জন্য ফিলিপের প্রয়াস (সংক্ষিপ্তাকারে)—স্প্যানিশ আর্মাডা—ফিলিপের ব্যর্থতা।

৫। **সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব :** রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ—গৃহযুদ্ধ—ক্রম্ওয়েল এবং কমন্ওয়েল্থ—স্টুয়ার্টবংশের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা—১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লব—বিল অব্ রাইট্স (১৬৮৯) এবং অন্যান্য ফলাফল।

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা

প্রথম ঃ আধুনিক যুগ ঃ ... ১-৩

ইউরোপের পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ; প্রশ্নাবলী।

দ্বিতীয় ঃ ইউরোপের নবজাগরণ ঃ ... ৪-১৬

স্বরূপ, ইটালী ও ইউরোপের নবজাগরণ, চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ, শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ, প্রশ্নাবলী।

তৃতীয় ঃ ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার ঃ ... ১৭-২২

নাবিকের দিকনির্ণয় যন্ত্র, মানচিত্র, আবিষ্কার, প্রিন্স হেনেরী, বার্থেলোমিউ ডিয়াজ, ভাস্কো-দা-গামা, কেব্রাল, আল্‌বুকার্ক, কলম্বাস, বাল্‌বোয়া, আমেরিগো ভেসপুচি, ম্যাগেলান, ফলাফল, প্রশ্নাবলী।

চতুর্থ ঃ ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন ঃ ... ২৩-৩৫

(ক) ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ—জন ওয়াইক্লিফ, জন হাস্, মার্টিন লুথার ; (খ) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল ; (গ) ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরে সংস্কার ; (ঘ) নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের উচ্ছেদ সাধনে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা ; (ঙ) প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড ও উহার চার্চকে নিজের কর্তৃত্বে আনার জন্য দ্বিতীয় ফিলিপের প্রয়াস, প্রশ্নাবলী।

পঞ্চম ঃ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব ঃ ... ৩৬-৪০

রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ ; অলিভার ক্রম্‌ওয়েল ও কমনওয়েল্‌থ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ১৬৮৮ খ্রীঃ বিপ্লব, প্রশ্নাবলী।

ষষ্ঠ ঃ ভারতবর্ষ ঃ ... ৪১-৫৮

(ক) মুঘল সাম্রাজ্য ; (খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ; (গ) মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার ; (ঘ) শিখ শক্তির উত্থান, প্রশ্নাবলী।

সপ্তম ঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঃ ... ৫৯-৭৩

(১) প্রথম স্তর—১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ; (২) পরবর্তী স্তর—১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ; (৩) সিপাহী-বিদ্রোহ ; (৪) বৃটিশ শাসনের ফলাফল—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ, প্রশ্নাবলী।

অষ্টম ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ—যুক্তিবাদের যুগ ঃ ... ৭৪-৯০

(ক) আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ ; (খ) ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব ; (গ) ফরাসী বিপ্লব ; প্রশ্নাবলী।

নবম : ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইউরোপের ইতিহাস : ... ৯১-১০৩

(ক) ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্বন্দ্ব ; (খ) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ ; (গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ; (ঘ) ইউরোপের শিল্পায়ন ; শ্রমিকশ্রেণী ; মার্কস ও এঙ্গেলস্ ; প্রশ্নাবলী।

দশম : চীন ও জাপান : ... ১০৪-১১৩

(ক) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা-প্রবাহ ; (খ) চীনের প্রতিক্রিয়া—তাইপিং বিদ্রোহ ; শতদিনের সংস্কার ; বক্সার বিদ্রোহ, সংস্কার—১৯১১ খ্রীঃ বিপ্লব ও সান্-ইয়াৎ-সেন ; (গ) জাপান—১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বৃহৎ শক্তি হিসেবে জাপানের অভ্যুদয় ; জাপানের পাশ্চাত্তীকরণ ; জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ; প্রশ্নাবলী।

একাদশ : ব্রিটিশরাজের অধীনে ভারতবর্ষ : ... ১১৪-১২৩

নতুন শাসনব্যবস্থা ; সাম্রাজ্য বিস্তার ; ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার ; জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ ; ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ; চরমপন্থী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১৪) ; প্রশ্নাবলী।

দ্বাদশ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ : ... ১২৪-১৩১

কারণ ; ব্যাপকতা ; ফলাফল ; ভারতের জাতীয় আন্দোলনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ; বিপ্লবী আন্দোলন ; হোমরুল লীগ ও লক্ষ্মৌ-চুক্তি ; গান্ধীজীর আবির্ভাব ; প্রশ্নাবলী।

ত্রয়োদশ : রুশ-বিপ্লব : ... ১৩২-১৩৭

কারণ, ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের ওপর প্রভাব ; প্রশ্নাবলী।

চতুর্দশ : ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯ খ্রীঃ) : ... ১৩৮-১৪৪

প্যারিস শান্তি-সম্মেলন ও ইউরোপের পুনর্গঠন, ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব, জাতি-সংঘ, উহার সাফল্য ও ব্যর্থতা, প্রশ্নাবলী।

পঞ্চদশ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : ... ১৪৫-১৪৮

কারণ ; ফলাফল ; প্রশ্নাবলী।

ষোড়শ : ভারতবর্ষ, (১৯১৯-১৯৪৭ খ্রীঃ) : ... ১৪৯-১৫৮

স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর : অসহযোগ আন্দোলন, আইন-অমান্য আন্দোলন ; "ভারত-ছাড়"; আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ; ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতালাভ ; প্রশ্নাবলী।

সপ্তদশ : চীনের বিপ্লব (১৯১১-১৯৪৯ খ্রীঃ) : ... ১৫৯-১৭১

(ক) ইউ-য়ান্-সিকাই ও সান্-ইয়াৎ-সেন, ৪ঠা মে'র আন্দোলন, কুয়োমিন-তাঙ্ ও কমিউনিস্ট দলের সম্পর্ক, ডাঃ সানের মৃত্যুর পর কুয়োমিন্-তাঙ্ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে বিচ্ছেদ ; (খ) ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া ; (গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার ; প্রশ্নাবলী।

পরিশিষ্ট : কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার সন-তারিখ ... ১৭-১৮৫১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী ... i-xiv

৬। **ভারতবর্ষ ঃ** (ক) মুঘল সাম্রাজ্য—প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার (১৫২৬-১৭০৭)—মুঘল যুগের সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের অর্থনৈতিক জীবন—কয়েকজন বৈদেশিক ভ্রমণকারীর নামোল্লেখ—সাম্রাজ্যের পতন (১৭০৭-১৭৫৭) (সংক্ষিপ্তাকারে)।

(খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন (i) পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা (সংক্ষিপ্তাকারে) (ii) মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার (iii) শিখ জাতির উত্থান ও তাহার সংগঠন।

৭। **ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঃ** (১৮৫৭ সাল পর্যন্ত) (সংক্ষেপে)।

(ক) প্রথম স্তর—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (খ) পরবর্তী স্তর—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত (গ) সিপাহী-বিদ্রোহ - কারণ, প্রকৃতি ও ব্যর্থতার কারণ (ঘ) বৃটিশ শাসনের ফলাফল —রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অসন্তোষ (সিপাহী-বিদ্রোহের পরবর্তী কালে)।

৮। **অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ ঃ** যুক্তিবাদের যুগ। (ক) আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ—কারণ—আমেরিকার সাফল্যের কারণ—ফলাফল। (খ) ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব—ইহার অর্থ—কৃষি-বিপ্লব—আবিষ্কার—ফলাফল। (গ) ফরাসী বিপ্লব ঃ (i) প্রাক্-বিপ্লব চিন্তাধারা—কয়েকজন বিখ্যাত নেতা—রুশো, ভল্‌তেয়ার, মণ্টেস্কু—বিপ্লবের কারণ ও প্রসার। (ii) বিপ্লবের একজন সৈনিক এবং সম্রাট হিসাবে নেপোলিয়ন—ইউরোপের বিদ্রোহ (iii) ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল।

৯। **১৮১৫ সাল হইতে ইউরোপের ইতিহাস ঃ** (ক) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র বনাম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যাহা ন্যায্য অধিকার-নীতির সমর্থনে চতুঃশক্তি মিতালি ও মেটারনিকের কার্যাবলীর মধ্য দিয়া প্রতিভাত। (খ) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে (ইটালী ও জার্মানিতে) জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ। (গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ—মূল কারণসমূহ—আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা। (ঘ) ইউরোপের শিল্পোন্নয়ন (যন্ত্রসভ্যতা)—ইহার ফলাফল—শ্রমিকশ্রেণী—মার্কস ও এ্যাঙ্গেলস।

১০। **১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনাপ্রবাহ ঃ** (সাধারণভাবে চীন ও জাপানের কথা সহজ করিয়া উপস্থাপিত করিতে হইবে। যুদ্ধ ও সন্ধির বিশদ বিবরণের প্রয়োজন নাই)। (১) অহিফেন-যুদ্ধ, নান্‌কিং-এর সন্ধি (১৮৪২) এবং বৃটিশ বাণিজ্যচুক্তি টিয়েন্‌সিনের সন্ধি ; বন্দর-চুক্তি—বিদেশীদের বসতি ও তাহাদের অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ—চীনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তাহার অংশবিশেষ অধিকারের জন্য বিদেশী শক্তিসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—হের উন্মুক্তদ্বার নীতি (১৯০১)। (২) চীনের প্রতিক্রিয়া—তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫৩)—শত দিনের সংস্কার (১৮৯৮)—বক্সার বিদ্রোহ —ডাওয়েজার সম্রাজ্ঞীর প্রতিক্রিয়া—অভ্যন্তরীণ সংস্কারের নব প্রচেষ্টা (১৯০২-১৯০৮)—শেষ মাঞ্চু সম্রাটের পদচ্যুতি (১৯১১) প্রজাতান্ত্রিক চীন (১৯১২)—সান্-ইয়াং-সেন ও ইউ-য়ান্ সিকাই। (সবটাই সংক্ষেপে গল্পচ্ছলে) (খ) **বৃহৎ শক্তি হিসাবে জাপানের অভ্যুদয় (১৯১৪ সাল পর্যন্ত)**—মেইজি যুগে সম্রাটের শক্তি পুনঃ-প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭)—সম্রাটের ক্ষমতা ও মর্যাদা—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক ব্যবস্থার পাশ্চাত্তীকরণ—চীন-জাপান যুদ্ধের পথে (১৮৯৪-১৮৯৫) জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সূচনা—১৯০২ সালে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী (প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানী শক্তি প্রতিষ্ঠার

দিত। প্রতিটি কৃষককে সামন্তরা পশু, লাঙ্গল, বীজ ইত্যাদিও দিত ও বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যের অংশ পেত।

এইভাবে পুরানো কৃষি-ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেল। শহরের অধিবাসীদের কৃষিজাত জিনিসের চাহিদার ফলে কৃষকরা বেশী জমি কৃষির আওতায় নিয়ে আসতে লাগল। কিছুদিনের মধ্যে কৃষকরা বুঝতে পারল, জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য জমি ফেলে রাখার প্রয়োজন নেই। জমিতে মূলজাতীয় ফসল ফলালে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। উচ্চমানের লোহার যন্ত্রপাতি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হতে শুরু হল। শারীরিক পরিশ্রম করে জমি চষার স্থান নিল ঘোড়ায়-টানা লাঙ্গল। আগের মত জমিতে বীজ ছড়িয়ে না দিয়ে গর্ত করে বীজ রোপণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হল। শস্য ঝাড়া ও বোনার যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় কৃষিকাজে যন্ত্রের ব্যবহার বেড়ে গেল। বাজারের প্রতি লক্ষ রেখে তরিতরকারির বাগান ও ফলের বাগান করার ঝোঁক দেখা দিল। গম, সরষে এক জমিতে, অন্য জমিতে ওট, বীন, মটর ও তৃতীয় জমিতে শিকড়জাতীয় সব্ জির উৎপাদন হতে থাকল।

কৃষিতে উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেও নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। নতুন নতুন শিল্প-সামগ্রী তৈরি হতে শুরু হল। বস্ত্রশিল্প ছিল প্রাচীন শিল্প, যা কারিগররা ঘরে বসে সবকিছু করত। কাপড়ের চাহিদা ও বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় ও প্রচুর তুলো উৎপাদনের ফলে কোনও কারিগরের পক্ষে একা সব কাজ করা সম্ভব হল না ;—সুতো তৈরি, তাঁত চালান, কাপড় রং করা ইত্যাদিতে শ্রম ভাগ হয়ে, আলাদা আলাদা কারিগরের কাজ হয়ে দাঁড়াল। কাঁচামাল প্রচুর পাওয়ায় ও জিনিস বেশী পরিমাণে তৈরির প্রয়োজনীয়তার ফলে এমন ব্যবসায়ীর আবির্ভাব হল, যারা কারিগরকে কাঁচামাল দিয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে জিনিস তৈরি করিয়ে নিয়ে একচেটিয়া ব্যবসা করত। ক্রমে এই ব্যবসায়ীরাই ৮–১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে প্রচুর জিনিস তৈরি করতে আরম্ভ করল। কুটিরশিল্পের জায়গায় কলকারখানা ব্যবস্থা এসে গেল। নতুন নতুন শিল্প,—যেমন সাবান, চিনি, মদ, বারুদ, কাগজ প্রভৃতি তৈরিতে প্রচুর কাঁচামালও পাওয়া যেত কৃষিক্ষেত্র থেকে। এইসব শিল্পে প্রয়োজন হত বয়লার, চাষ দেওয়ার যন্ত্র, আগুন জ্বালানোর চুল্লি ইত্যাদি মহার্ঘ যন্ত্রপাতির। ফলে কারখানা-ব্যবস্থা স্থায়ী হয়ে গেল। কৃষি

ও শিল্প ক্ষেত্রে পুঁজির প্রয়োজনে পুঁজিপতি-শ্রেণীর আবির্ভাব হল। পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর সৃষ্টির ফলে মধ্যযুগের সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়ে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থা রূপ নিল।

প্রশ্নাবলী

১। আধুনিক যুগের শুরুতে কৃষি-ব্যবস্থায় কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল?

২। আধুনিক যুগের শুরুতে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শিল্পক্ষেত্রে কি পরিবর্তন হয়?

৩। সামন্ত-ব্যবস্থার স্থলে কৃষিক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হয়েছিল?

৪। কৃষি ও শিল্পে কি কি পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল?

২

ইউরোপের নবজাগরণ
(Renaissance in Europe)

(ক) নবজাগরণের স্বরূপ ঃ 'নবজাগরণ' শব্দটির মূল অর্থ পুনর্জন্ম। সাধারণভাবে নবজাগরণ বলতে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা সম্পর্কে জানার তীব্র উৎসাহ বোঝায়। প্রাচীন সবকিছু জেনে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বুঝে, তার থেকে যা-কিছু ভালো, তা গ্রহণ করার আগ্রহ নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মনের স্বাধীন চেতনা, এবং বলিষ্ঠ সমালোচনা ও জানার মনোবৃত্তিই হল নবজাগরণ।

বহুদিনের প্রস্তুতির ফলে এই নবজাগরণ বা রেনেসাঁস ঘটেছিল। মধ্যযুগের কঠিন বন্ধনের মধ্যেই শিক্ষার চর্চা চলছিল। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমরা জ্ঞান আহরণের আগ্রহের প্রকাশ দেখতে পাই। ধর্মযুদ্ধে যোগদানের ফলে ইউরোপ তার মধ্যযুগের তন্দ্রা থেকে মুক্তি পায়। এক নতুন উৎসাহ ও আগ্রহ ইউরোপবাসীদের মনে জেগে ওঠে। এই জাগরণই পরবর্তী কালে ব্যাপক জাগরণের দিকে ধাবিত করে। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীরা পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্টান্টিনোপল দখল করায় সেখানকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটি ধ্বংস হয়। কন্স্টান্টিনোপলের পণ্ডিতগণ ইটালীর বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হলে ইটালীতে গ্রীক সাহিত্যের আকর্ষণ বেড়ে যায়। এর ফলে নবজাগরণ ত্বরান্বিত হয়। নবজাগরণ ইউরোপের চিন্তার জগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। নবজাগরণের সময়ে ইটালী ও ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্য এবং শিল্পের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়। এর ফলে ইউরোপবাসীদের সামনে এক নতুন জগতের দ্বার খুলে যায়। তারা ধর্ম বাদ দিয়ে পৃথিবীর মানুষ ও সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মধ্যযুগের আদর্শ ছিল আত্মার উন্নতি ও পরবর্তী জীবনকে সুখী করার জন্য এই জগতের সব সুখ-সুবিধা ত্যাগ করা। মধ্যযুগের বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের স্থান নিল সমালোচনামূলক জানার আগ্রহ। নবজাগরণের ফলে মানুষ বুঝতে পারল যে আত্মার উন্নতির জন্য

এই জগতের সুখ-সুবিধা বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে বেঁচে থাকা ও সুখ-সুবিধা ভোগ করার মূল্য আছে। মধ্যযুগের সবকিছু ধর্মকে ঘিরেই আবর্তিত হত,—অন্য কিছু জানা ছিল ধর্মবিরুদ্ধ। কিন্তু নবজাগরণের ফলে মানুষের মনে এক স্বাধীন ও যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাশক্তি এল। মানুষ বুঝতে পারল প্রকৃতিতে সবকিছুই ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়; —যা কিছু ঘটেছে তার যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যাও আছে। মানুষের মনে বৈজ্ঞানিক, যুক্তিসম্মত চিন্তাধারায় সৃষ্টি নবজাগরণের বড় বৈশিষ্ট্য। মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস রক্ষায় চার্চ বা গীর্জার নিরলস চেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ খোলা-মনে সবকিছু যাচাই করে নিতে শিখল। পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা হল মানুষের মনের হাতিয়ার, যার সাহায্যে সে সিদ্ধান্ত নিতে শিখল। এই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার সাহায্যে সবকিছু গ্রহণের শিক্ষা শুরু হয় এয়োদশ শতাব্দীতে এবং তা পূর্ণতা লাভ করে নবজাগরণের মধ্যে।

(খ) **ইটালী ও ইউরোপের নবজাগরণ**ঃ নবজাগরণ প্রথমে ইটালীতে শুরু হয় ও বিকাশ লাভ করে। ইটালীর শহরগুলির পরিবেশ ছিল আত্মনির্ভরশীল, বলিষ্ঠ ও ধর্মনিরপেক্ষ। রাজনৈতিক, মানসিক, সাহিত্যিক ও শিল্পের দিক থেকে বিবেচনা করলে ইটালীর শহরগুলি প্রাচীন গ্রীক শহরগুলির মত সৃষ্টির উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলেছিল। ইটালীর বিভিন্ন শহর-রাষ্ট্রের ব্যবসায়ী ও শাসকরা বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। এইসব শহর-রাষ্ট্রের মধ্যে ফ্লোরেন্স, মিলান, রোম ও ভেনিসের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ফ্লোরেন্সকে "দ্বিতীয় এথেন্স" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। বিখ্যাত মেডিসিবংশ ছিল এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। কেসিমো ও লরেঞ্জো মেডিসির চেষ্টায় ফ্লোরেন্সে প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির পুনর্জন্ম ঘটে। বিখ্যাত শিল্পী গিয়াত্তো, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, রাফায়েল প্রভৃতিরা মেডিসিদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। মিলানের ভিসকন্তি ও সাফ্রোজা বংশের পৃষ্ঠপোষকতায় মিলানে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। নবজাগরণের ক্ষেত্রে রোম ক্রমশ প্রাধান্য পায়। ফ্লোরেন্সে মেডিসিদের প্রাধান্যলোপ ও পোপদের সাহিত্য ও শিল্পপ্রীতি রোমে নবজাগরণ সৃষ্টি করে। পোপ পঞ্চম নিকোলাসের নাম এইক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পোপ দ্বিতীয়

জুলিয়াস ও পোপ দশম লিও রোমকে সাহিত্য ও শিল্পের বিশিষ্ট কেন্দ্রে পর্যবসিত করেন। বাণিজ্যিক শহর ভেনিসও শিল্পী-জীবনের জন্য ছিল আদর্শ স্থান। নবজাগরণ আন্দোলন ইটালীর সীমা পেরিয়ে আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে উত্তরে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেইসব দেশের শিক্ষার্থীরা ইটালীতে এসে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভ করল। তারা নবজাগরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সবকিছু দেখে, বুঝে যা ভাল, কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ দেখাল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্য থেকে জার্মান যুবকরা গ্রীকভাষা শেখার জন্য আল্পস্ পর্বত পেরিয়ে ইটালীতে আসতে শুরু করে। গ্রীক শেখার জন্য জার্মান পণ্ডিত রেউচলিন ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীতে আসেন। জার্মানিতে নবজাগরণ প্রাচীন গ্রীক বা রোমানদের অনুকরণ না করে ধ্যান-ধারণায় প্রাচীন জার্মান রূপ নেয়। এর ফলেই পরবর্তী কালে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু হতে পেরেছিল। চিত্রশিল্পে জার্মানির কোলন চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীর চিত্রকলার প্রভাব দেখা যায় জার্মান চিত্রশিল্পী আলব্রেক্ট ডুরার হানস্ হলবিইনের চিত্রে।

হল্যাণ্ড ও ফ্লাণ্ডর্সে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভ্যান আইক ভ্রাতৃদ্বয়ের মাধ্যমে নতুন চিত্রশিল্পের সূচনা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই শিল্প চরম পূর্ণতা লাভ করে। নেদারল্যাণ্ডে এই সময় প্রচুর প্রতিভাময় শিল্পীর আবির্ভাব হয়। শিল্পী রুবেনের চিত্রে ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ফ্লেমিশ ও ডাচ শিল্পীদের মধ্যে সবচাইতে বিশিষ্ট হলেন রেমব্রাণ্ট। হল্যাণ্ডের ইরাস্মাস্ নবজাগরণ প্রভাবিত স্বাধীন চিন্তাকে ধর্মের দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন।

নবজাগরণের প্রভাব স্পেন ও পর্তুগালেও দেখা দেয়। সারভান্তিস্ (১৫৪৭-১৬১৬ খ্রীঃ) স্পেনে নবজাগরণ আবহাওয়া নিয়ে আসেন। পর্তুগালে নবজাগরণের প্রভাব দেখা যায় ক্যামেওনস্ (১৫৪২-১৫৮০ খ্রীঃ)-এর মহাকাব্য "লুসিয়াড" রচনায়।

ফরাসী দেশে নবজাগরণ প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে। ফরাসী দেশেও প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের অনুকরণে নাটক, কবিতা ও গদ্য-সাহিত্য রচনা করা হতে শুরু হল। ফরাসী

দেশের শিল্প ও ভাস্কর্য তাদের নিজস্বতা হারিয়ে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান শিল্প ও ভাস্কর্যের অন্ধ অনুকরণ করতে লাগল।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইংলণ্ডে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। কিছুদিন স্তিমিত হওয়ার পর রাজা অষ্টম হেনরীর রাজত্বে পুনরায় সাহিত্য-প্রীতি বেড়ে যায়। ইটালীর নবজাগরণের প্রভাব এই সময় দেখা গেল। নবজাগরণের প্রভাবে এই সময় ইংলণ্ডে অনুবাদ-সাহিত্যের উদ্ভব হয়। ইংরেজ মনীষীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় নাট্য-সাহিত্যে। খ্রীস্টফার মার্লো (১৫৬৪-৯৩ খ্রীঃ), উইলিয়ম শেক্স্‌পীয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রীঃ) তাঁদের নাট্য-সাহিত্যে স্বাধীন, সাহসী ও স্বাভাবিক চেতনার পরিচয় দেন। শেক্স্‌পীয়ারের পরবর্তী কালে মিল্টন গ্রীক ও ল্যাটিন সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে "প্যারাডাইস লস্ট" ও "প্যারাডাইস রিগেইণ্ড" নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করেন।

(ক) চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা মানবতাবাদ

জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির ফলে নবজাগরণের চেতনা জাগ্রত হয়। ধর্মযুদ্ধের সময়ে ও তারপরে ইউরোপে বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য রূপ নিতে শুরু করে। লেখক ও সাহিত্যিকরা পৃথিবীর মানুষ, সৌন্দর্য এবং নানাবিধ সমস্যা নিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন।



দান্তে

দান্তে ছিলেন ইটালীর প্রতিভাশালী কবি, ল্যাটিন ভাষায় লিখলেও তিনি তাঁর নিজের ভাষা টাস্কান ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন। ফ্লোরেন্স থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি চিরস্মরণীয় মহাকাব্য "কমেডিয়া" রচনা করেন। এই মহাকাব্যের মূল্য বুঝে তাঁর অনুরাগীরা একে "ডিভাইন কমেডিয়া" নাম দিলেন। এই মহাকাব্যটি মধ্যযুগের জীবন ও চিন্তার মূর্ত প্রতীক। মধ্যযুগের কথা লিখলেও দান্তে নতুন যুগের পথপ্রদর্শক—নবজাগরণের পূর্বসূরী। তাঁর স্বাধীন বিচার, সমালোচনামূলক মনোভাব তাঁকে আধুনিক লেখকের গুণে ভূষিত করেছে।

ইটালীর নবজাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন ফ্রান্সিস্‌কো পেত্রার্ক। কেউ কেউ তাঁকে "নবজাগরণ আন্দোলনের জনক" বলেন। পেত্রার্ক তাঁর সাহিত্যে মানুষের প্রেম ও ভালবাসার কাহিনীকে স্থান দেন। পরলোকের কথা না বলে তিনি ইহলোকের কথা শোনান। মানুষের জীবনের কথাই তাঁর সাহিত্যে রূপ পায়। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রা উদ্ধার করে তার মর্ম ব্যাখ্যা করেন। পেত্রার্ক তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যুক্তিবাদী ও অনুসন্ধানী মন তৈরি করায় নবজাগরণের সূচনা হয়।



পেত্রার্ক

পেত্রার্কের শিষ্যদের মধ্যে বোকাচ্চিও (১৩১৩-১৩৭৫ খ্রীঃ) ছিলেন প্রধান। প্রাচীন বই-এর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও তার প্রতিলিপি তৈরি করে গ্রীক ও রোমান সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তিনি বাড়িয়ে তোলেন। পেত্রার্কের আদেশে তিনি গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করে হোমারের মহাকাব্য দুটি ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। বোকাচ্চিওকে ল্যাটিন গদ্য-সাহিত্যের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত "ডেকামেরন" বইটি ল্যাটিন গদ্য-সাহিত্যের বিশিষ্ট নিদর্শন।



বোকাচ্চিও

শুধু সাহিত্যেই নয়, রাজনীতি, ইতিহাস, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদিতেও প্রচুর উন্নতি দেখা দেয়। মেকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রীঃ) ছিলেন ঐ যুগের ঐতিহাসিক ও রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর "দি প্রিন্স" নামক বইয়ে তিনি পুনরায় রোমান সাম্রাজ্যকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়, সেই বিষয়ে লিখে গিয়েছেন। তাঁর মতে রাজনীতিতে নৈতিকতা কিংবা ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই।

ইংলণ্ডে মানবতাবাদিগণের মধ্যে জিওফ্রে চসার, এড্‌মণ্ড স্পেন্সার, উইলিয়াম শেক্‌স্পীয়ার ও স্যার ফ্রান্সিস বেকনের নাম উল্লেখযোগ্য। জিওফ্রে চসার (১৩৪০—১৪০০ খ্রীঃ) "ক্যান্টারবেরী টেল্‌স" নামে বই লেখেন।



মেকিয়াভেলি



জিওফ্রে চসার

এই বইতে তিনি লণ্ডন থেকে ক্যান্টারবেরী যাচ্ছে এমন ত্রিশজন লোকের ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখেছেন। এই ত্রিশজনই তখনকার সমাজের প্রতিনিধি। তাদের দেখতে কেমন, তারা কি পোশাক পরেছে ও কিভাবে কথা বলে, তার বাস্তব বর্ণনা আছে।

ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের সময় ইংরেজী সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ



এড্‌মণ্ড স্পেন্সার



উইলিয়াম শেক্‌স্পীয়ার

হয়। এড্‌মণ্ড স্পেন্সারের (১৫৫২-১৫৫৯ খ্রীঃ) "ফেয়ারী কুইন" ইংলণ্ডের রানীর উদ্দেশ্যে ক্লাসিকাল গঠনে লেখা। তাঁর ভাষার পারিপাট্য কাব্যধর্মী।

উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়ার—(১৫৬৪—১৬১৬ খ্রীঃ) হলেন এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। শুধু এই যুগের নয়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি মোট ৩৭টি নাটক লেখেন। এদের মধ্যে অনেকগুলি বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক রূপে পরিচিত। মিলনান্ত নাটকগুলির মধ্যে "মার্চেন্টস অব্ ভেনিস", "এ মিড্‌সামার নাইট্‌স্ ড্রিম", "অ্যাজ্ ইউ লাইক ইট" বিখ্যাত। করুণরসাত্মক নাটকের মধ্যে "রোমিও এ্যাণ্ড জুলিয়েট", "হ্যামলেট", "ওথেলো", "কিং লীয়ার", "জুলিয়াস সীজার" ও "ম্যাক্‌বেথ" শেক্‌স্‌পীয়ারের অমর সৃষ্টি। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের চরিত্রগুলি কোন দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এরা সর্বদেশের সর্বকালের নরনারীর প্রতিনিধি।

এলিজাবেথের সময়ে গদ্য-সাহিত্যও অনেক উন্নতি লাভ করে। স্যার ফ্রান্সিস বেকন তাঁর প্রবন্ধগুলি লিখে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে "এসেজ", "নোভাম আর্গানাম" এবং "অ্যাট্‌লান্টিস" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



ইরাস্‌মাস্



রাবেলে

নবজাগরণের যুগের নেদারল্যাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হলেন ডেসিডে-রিয়াস ইরাস্‌মাস্ (১৪৬৬—১৫৩৬ খ্রীঃ)। যাজকের বৃত্তি গ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন বই-প্রেমিক ও অনবদ্য লেখক। মানবতাবাদী হিসেবে তিনি কুসংস্কারকে আক্রমণ করেন। তিনি ধর্মশাস্ত্রবিদ্, সন্ন্যাসী ও বিধর্মীদের নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। অজ্ঞানতা ছিল তাঁর শত্রু। তাঁর বিখ্যাত বই-এর নাম "প্রেইজ অব্ ফলি"।

সারভান্তিস্ (১৫৪৭—১৬১৬ খ্রীঃ) স্পেনে নবজাগরণের সৃষ্টি করেন। তাঁর "ডন কুইট্জোট" বইটি পৃথিবীর সাহিত্য-জগতে অমূল্য সম্পদ। তিনি মধ্যযুগের নাইট ও শিভ্যাল্‌রিকে আক্রমণ করেছেন।

নবজাগরণের যুগে ফরাসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন ফ্রাঁসোয় রাবেলে (১৪৯৫—১৫৫৩ খ্রীঃ)। দীর্ঘকাল মঠে কাটালেও ইনি বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা করতেন। মঠের হাজার রকমের কুসংস্কারে বিরক্ত হয়ে তিনি মঠ ছেড়ে দিয়ে লিয়ঁ শহরে ডাক্তারি করতে থাকেন। তিনি যুদ্ধ, হৃদয়ের শ্লেষ, বিদ্রূপ ও সমালোচনার আঘাতে ধর্মজীবনের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। তাঁর বিখ্যাত রচনার নাম "প্যান্ট গ্রুয়েল" ও "গরগান্টুয়া"।

(খ) শিল্পের ক্ষেত্রে নবজাগরণ

সাহিত্যের মত শিল্পকলার ক্ষেত্রেও নবজাগরণের প্রভাবে জোয়ার দেখা দেয়। মধ্যযুগের মানুষের জীবন ছিল নিশ্চল ও বাঁধাধরা,—শিল্পের ক্ষেত্রেও কোনও প্রাণের স্পর্শ ছিল না। শিল্পকলা ছিল গীর্জার নিয়ন্ত্রণে। যীশুখ্রীষ্টের জীবনকে কেন্দ্র করে শিল্প, চিত্র ও ভাস্কর্য চর্চা করা হত। নবজাগরণের প্রভাবে মানুষের জীবনকে শিল্পে ও ভাস্কর্যে নানা ভাবে প্রকাশ করা হতে থাকে। ইটালী ছিল নবজাগরণ যুগের শিল্পের পীঠস্থান।

এই সময় ইটালীতে লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, রাফায়েল ও মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর মত বিখ্যাত শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল।



লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি

লি ও না র্দো-দা-ভিঞ্চি—লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির জন্ম হয় ফ্লোরেন্সে। তিনি প্রথম জীবনে শিক্ষাও নেন ফ্লোরেন্সে। জীবনের বিভিন্ন সময়ে তিনি মিলানের সাফ্রোজা পরিবার, ফ্লোরেন্সের মেডিসি পরিবার, এবং পোপ ও ফ্রান্সের রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন।

তাঁর হাতে তৈরি হল সর্বকালের বিশিষ্ট চিত্র 'মোনালিসা' ও "দি লাস্ট সাপার"। তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন "দি লাস্ট সাপার" চিত্রটি শেষ করতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চিন্তা করেছেন—অসংখ্য স্কেচ তৈরি করেছেন—তাঁর কাজের উপযুক্ত মাথা ও মুখ খুঁজবার জন্য মিলানের রাস্তায় পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছেন। ছবিটির বিষয়বস্তু অপূর্ব—কিন্তু পাত্র সব পুরুষ। এখানে কেউই চুপ করে নেই—তাদের নড়াচড়া একটা পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যা আগে দেখা যায়নি। 'লাস্ট সাপার' আঁকার



দি লাস্ট সাপার

পর লিওনার্দো পুনরায় ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন ও এইখানে আঁকা হয় সেই রহস্যময়ীকে যা আজও নাড়া দিচ্ছে সবাইকে—'মোনালিসা'। মোনালিসাকে যে দেখতে খুব সুন্দর, তা-ও নয়; কিন্তু তাঁর হাসিটি—কেন? আজও তার উত্তর পাওয়া যায়নি। ফ্লোরেন্সে আরও তিনটি বিশিষ্ট চিত্র তিনি আঁকেন—"দি ভার্জিন", "চাইল্ড" ও "সেণ্ট অ্যান"। লিওনার্দো দক্ষ ভাস্করও ছিলেন। মিলানে তাঁর তৈরী ফ্রান্সেস্কো সাফ্রোজার মূর্তি-র প্লাস্টার মডেলটি দেখে কবিরা কবিতা পর্যন্ত রচনা করেছিলেন।

রাফায়েল ছিলেন নবজাগরণের যুগের অপর একজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী। তিনি ছিলেন লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি ও মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর সমসাময়িক। ভাস্কর্য ও প্রাচীন শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। চিত্র-

শিল্পী হিসাবেই তিনি প্রসিদ্ধ। তাঁর আঁকা "ম্যাডোনা" ছবিটি তাঁকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছে।



রাফায়েল



মাইকেল এ্যাঞ্জেলো

মাইকেল এ্যাঞ্জেলো—মাইকেল এ্যাঞ্জেলো ছিলেন নবজাগরণের যুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। তিনি ছিলেন একাধারে ভাস্কর্য, অঙ্কন ও স্থাপত্য-শিল্পে দক্ষ। রোমের সেণ্ট পিটার গীর্জার উপরের বড় গম্বুজটি তাঁর নক্‌শায় তৈরি হয়। তিনি ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পেও চিরস্থায়ী খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। ফ্লোরেন্স শহরে তাঁর তৈরী "ডেভিড"-এর মূর্তিটির শিল্প-সুষমার তুলনা নেই। তিনি "শেষ বিচার" বা "লাস্ট জাজ্‌মেণ্ট" নামে একটি সুবিখ্যাত ছবি আঁকেন। রোমের ভাটিক্যান প্রাসাদের ভিতরের গীর্জার দেওয়ালে তাঁর আঁকা বহু ছবি দেখা যায়।



মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর আঁকা ছবি

(গ) বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নবজাগরণ

ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে স্কুল্‌মেন্‌দের প্রভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হয়। নবজাগরণের ফলে বিজ্ঞানেরও প্রচুর উন্নতি হয়। এই সময় কয়েকজন বিজ্ঞানীর আবির্ভাব হয়।



রোজার বেকন

রোজার বেকন—ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রোজার বেকন প্যারিস ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। তিনি যাজক ছিলেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তার জন্য তাঁকে বারবার সন্দেহ করা হত ও শেষ পর্যন্ত তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তাঁর প্রধান রচনা—"অপাস্ মজুস্", "অপাস্ মাইনাস্" ও "অপার টার্‌টিয়াম"। এই রচনাগুলিতে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রোজার বেকন ছিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা। তিনি বলতেন সত্য জানার পথে চারিটি বাধা আছে—(১) অজ্ঞ শিক্ষকের দৃষ্টান্ত; (২) প্রচলিত প্রথা; (৩) অজ্ঞ জনতার মতামত; (৪) নিজের অজ্ঞানতাকে জ্ঞানীর ভূমিকায় আড়াল করা। এই চারটি বাধা অতিক্রম করলেই সত্যের উপলব্ধি সম্ভব। তিনি সৃষ্টিবিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে বহু নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেন।



স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন

স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন—স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে দার্শনিক তত্ত্বে বর্ণনা করেছেন। তিনি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই তিনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন। বেকন অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন—"এসেজ্", "অ্যাড্‌ভান্স্‌মেন্ট অব্ লার্নিং", "নোভাম্ অর্গানাম্" ও "নিউ অ্যাট্‌ল্যান্টিস্"

বেকনের মতে নতুন দর্শন হবে পরীক্ষামূলক, কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে।

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি—শিল্পের মধ্য থেকে লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি বৈজ্ঞানিকে পরিণত হন। তাঁর চিত্রশিল্পই তাঁকে শারীরবিদ্যা, অনুপাত-বিজ্ঞান, পরিবেশের আইন, আলোর গঠন ও প্রতিফলন, রং এবং তেলের রসায়ন সম্পর্কে অবহিত করে। এইসব গবেষণার ফলে তিনি গাছপালা ও পশুদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হন। সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের মত লিওনার্দো পরীক্ষা থেকে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করেন। তিনি গণিত, আলোর গতি ও প্রতিফলন ইত্যাদি বিষয়েও সচেতন ছিলেন। তিনি একটি বায়ুযানের মডেল তৈরি করেছিলেন।

কোপার্নিকাস্—কোপার্নিকাস্ ছিলেন পোলিশ যাজক। তিনি তাঁর সময় ধর্মীয় কাজ, গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা গবেষণায় ভাগ করে দিয়েছিলেন। যোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাস্ দশ বছরের জন্য ইটালীতে ধর্মীয় আইন, ঔষধশাস্ত্র ও গ্রীক জ্যোতির্বিদ্‌দের বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি গ্রীক জ্যোতির্বিদ্ টলেমির তত্ত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। কোপার্নিকাস্ তাঁর লেখায় প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত নয় ও অন্যান্য গ্রহের মত পৃথিবীও একটি গ্রহ। তিনি বলেন পৃথিবী সূর্যের চারদিকে



কোপার্নিকাস্



গ্যালিলিও

ঘুরছে। তাঁর মত বাইবেল-বিরুদ্ধ বলে ধর্মীয় পণ্ডিতরা তাঁর এই মত গ্রহণ করলেন না।

গ্যালিলিও—গ্যালিলিও ছিলেন ইটালীর বৈজ্ঞানিক। তিনি গণিতশাস্ত্র, যন্ত্রশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বকে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একটি টেলিস্কোপ তৈরি করে তিনি দেখান যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। গ্যালিলিও বায়ু-থার্মোমিটার ও জলমাপক-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তাঁর অভিমতের জন্য তাঁর বিপদ উপস্থিত হয় ও তাঁকে ধর্মীয় নজরে রাখা হয়।


যোহান গুটেন্‌বার্গ

যোহান গুটেন্‌বার্গ—যোহান গুটেন্‌বার্গ জার্মানির অধিবাসী ছিলেন। ছাপার যন্ত্র আবিষ্কার করে তিনি বিখ্যাত হন। ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে গুটেন্‌বার্গ পৃথক পৃথক অক্ষর সাজিয়ে ছাপার কাজ করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর ফলে বই লেখা বা পড়ার দিকে লোকের ঝোঁক বেড়ে যায়। ছাপার ফলে বই-এর মূল্য কমে যায় ও বহু লোকের কাছে পৌঁছে যায়। গুটেন্‌বার্গের ছাপা বাইবেল বোধ হয় ইউরোপে প্রথম ছাপা বই।

প্রশ্নাবলী

১। 'নবজাগরণ' কথাটির অর্থ কি? ইউরোপে নবজাগরণের স্বরূপ সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। ইউরোপের কোন্ অঞ্চলে নবজাগরণ প্রথমে দেখা দেয় ও কেন?

৩। ইটালী থেকে ইউরোপে কিভাবে নবজাগরণ প্রসারিত হয়েছিল?

৪। দান্তে, পেত্রার্ক ও বোকাচ্চিও-র সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। নবজাগরণের যুগের ইংলণ্ডের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে যা জান লেখ।

৬। ইটালীর শিল্পে নবজাগরণের প্রভাব নিয়ে আলোচনা কর।

৭। ইউরোপের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে নবজাগরণের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। রোজার বেকন, কোপার্নিকাস্ ও গ্যালিলিও-র বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

ইউরোপীয় জগতের পরিধি বিস্তার
(Europeans widen their world)

৩

ইউরোপের সভ্যতায় নবজাগরণের দান অপরিসীম। নবজাগরণের প্রভাব ইউরোপবাসীদের মনে ভৌগোলিক আবিষ্কারের ইচ্ছা ও অভিযান-প্রিয়তা বাড়িয়ে দেয়। নবজাগরণের যুগের পূর্বেই নাবিকের কম্পাস ও সমুদ্রের মানচিত্র আবিষ্কৃত হয়। নবজাগরণের ফলে যে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা ও জানার আগ্রহ জেগেছিল, তা ভৌগোলিক জ্ঞানবৃদ্ধির সহায় হয়েছিল। পৃথিবী যে গোল,—এই সত্য ও অক্ষরেখা সম্পর্কে জ্ঞান নবজাগরণের যুগেই সম্ভব হয়েছিল। দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্রপাতি এবং মানচিত্র আবিষ্কারের ফলে সমুদ্রযাত্রা অনেক সহজ হয়। নতুন দেশ আবিষ্কার করে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করাও ভৌগোলিক আবিষ্কারের অন্যতম কারণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্যটক মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত পড়েও অনেকের ভৌগোলিক আবিষ্কারের স্পৃহা বৃদ্ধি পায়।



দিক্‌নির্ণয়-যন্ত্র

ভৌগোলিক আবিষ্কারে পর্তুগাল সবথেকে অগ্রণী ছিল। পর্তুগালের যুবরাজ ইন্‌ফ্যান্টি হেনেরী মার্কোপোলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করে প্রাচ্য-দেশে যাওয়ার সমুদ্রপথ আবিষ্কারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর উৎসাহে পর্তুগীজ নাবিকরা ভারতবর্ষের দক্ষিণে সিংহল, লাক্ষাদ্বীপে পৌঁছবার চেষ্টা করে। ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ হেনরীর মৃত্যু পর্যন্ত এই চেষ্টা চলে।

১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বারথেলোমিউ ডিয়াজ নামে এক পর্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে যাত্রা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি আফ্রিকার দক্ষিণতম প্রান্তে পৌঁছান। তিনি স্বেচ্ছায় সেখানে আসেননি। ঝড়ে চালিত

হয়ে তাঁর জাহাজ আফ্রিকার দক্ষিণ অন্তরীপের তিনদিক ঘুরে এসেছিল। কিন্তু কোথায় এসেছেন জানার আগেই মাঝি-মাল্লারা তাঁকে ফিরে যেতে বাধ্য করে। ডিয়াজ জায়গাটিকে 'ঝড়ের অন্তরীপ' নাম দিয়েছিলেন। তাঁর মুখে এই জায়গার কথা শুনে পর্তুগালের রাজার আশা হয় যে, এবার ভারতের পথ পাওয়া যাবে। তাই তিনি নাম দিলেন 'উত্তমাশা অন্তরীপ' (Cape of Good Hope)।



বারথেলোমিউ ডিয়াজ

পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পথ ধরেই এগিয়ে গেলেন। ভাস্কে-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে চলতে লাগলেন। পথে ঝড় উঠল, —জাহাজ ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল, —খালাসীরা বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ভাস্কো-দা-গামা কিছুতেই ভয় পেলেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ভারত মহাসাগরে এসে উপস্থিত হলেন ও ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কালিকট বন্দরে পৌঁছলেন। কালিকটের জামোরিন বা শাসককে প্রচুর উপহার দিয়ে তাঁরা বহু জিনিস নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। এইভাবে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হল।



ভাস্কো-দা-গামা

ভাস্কো-দা-গামা ফিরে আসার পরেই পর্তুগালের রাজা ম্যানুয়েল আল্‌ভারেজ কেব্রালের নেতৃত্বে এক জাহাজ-বাহিনী ভারতে পাঠালেন। কেব্রালের সঙ্গী ছিলেন বিখ্যাত নাবিক বারথেলোমিউ ডিয়াজ। অবশেষে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল তাঁরা ব্রেজিলে পৌঁছান। এই খবর দিয়ে একটি জাহাজ দেশে পাঠিয়ে দিয়ে অবশিষ্ট জাহাজ নিয়ে কেব্রাল ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে

চারটি জাহাজ হারিয়ে তিনি কালিকটে উপস্থিত হলেন। তিনি কোচিন ও ক্যানানোর থেকে প্রচুর জিনিস সংগ্রহ করে ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনে পৌঁছান।



আল্‌বুকার্ক

১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাল্‌ফান্‌সো-ডি-আল্‌বুকার্ক ভারতে পর্তুগালের গভর্নর হয়ে আসেন। আল্‌বুকার্ক বিজাপুরের কাছ থেকে গোয়া দখল করে নেন। গোয়াই ভারতবর্ষের পর্তুগীজদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। দু'বছর পর তিনি মালাক্কা আবিষ্কার করায় জাভা, সিয়াম ও পেগুর সঙ্গে পর্তুগালের ব্যবসা করার সুবিধে হয়।

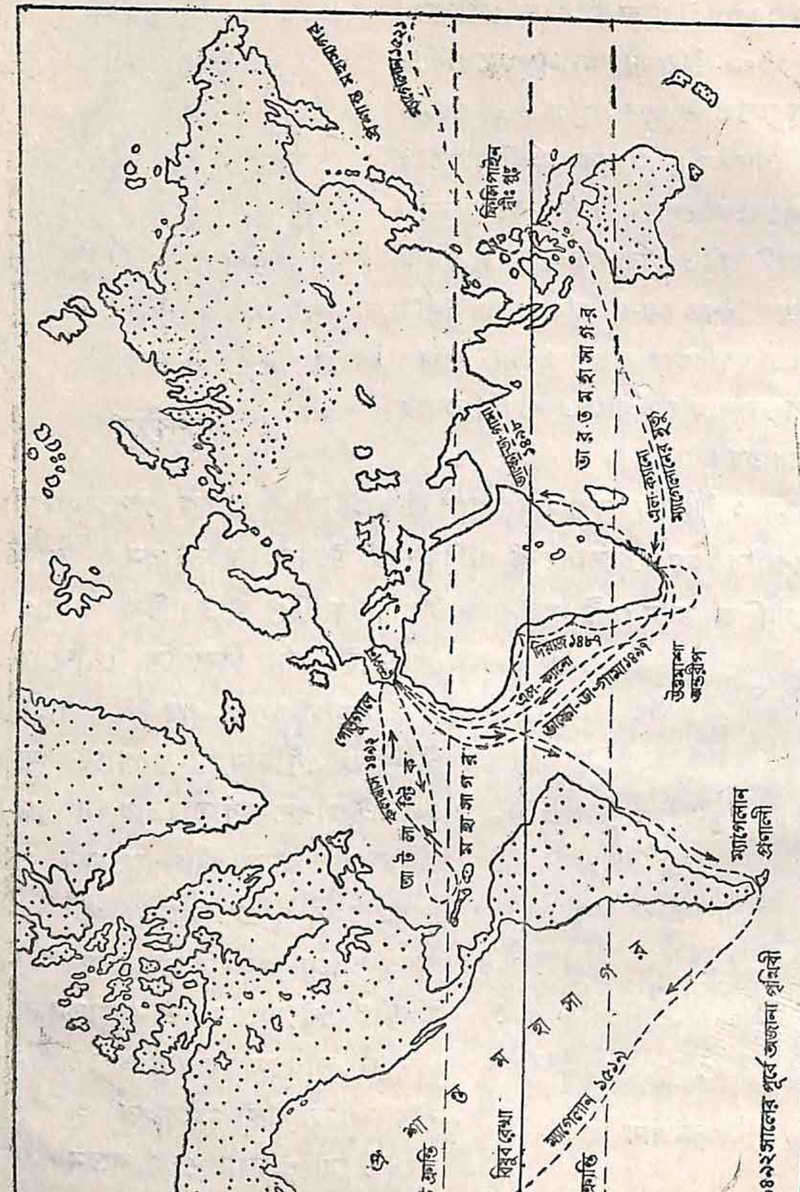
১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস নামে এক ইটালীয় নাবিক স্পেনের রানী ইসাবেলার অনুগ্রহে ভারতবর্ষ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তখনও ভৌগোলিক জ্ঞান বেশী হয়নি। তাঁর ধারণা ছিল আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়েই তিনি চীনদেশে পৌঁছবেন। পাঁচ সপ্তাহ চলার পর তিনি বাহামা দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান। কলম্বাসের মনে হল এই জায়গা পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। এই কারণে বাহমা দ্বীপপুঞ্জ এখন 'পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ' নামেই পরিচিত। কলম্বাস যে আমেরিকা নামে "নতুন জগতে" পৌঁছেছেন, তা জানতেন না। এই ভুল ভাঙলে কলম্বাস আরও তিন-বার আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে চীনে পৌঁছবার চেষ্টা করেন।



কলম্বাস

১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে বাল্‌বোয়া নামে এক স্পেনীয় নাবিক ডারিয়েন যোজক আবিষ্কার করলেন। সেখানকার আদিম অধিবাসীদের মুখে পশ্চিমে এক জল-রাশির কথা শুনে এক পর্বত থেকে বালবোয়া প্রশান্ত মহাসাগর দেখতে পান।

ফ্লোরেন্সের একজন ঠিকাদার আমেরিগো ভেস্‌পুচি কলম্বাসের জাহাজে জিনিসপত্র জোগান দিতেন। তিনি স্পেনে স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে



থাকেন। ভেসপুচিও অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার তটভূমি ধরে অগ্রসর হন। তিনিই ঘোষণা করেন, এই দেশ

একটা নতুন দেশ ;—ভারতবর্ষ নয়। তাঁরই নামানুসারে আমেরিকার নামকরণ হয়েছে।


আমেরিগো ভেস্‌পুচি

এর ছ'বছর পর নাবিক ম্যাগেলান স্পেনের রাজার সহায়তায় নতুন দেশ আবিষ্কার করতে বেরুলেন। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ হয়ে (যা আজ 'ম্যাগেলান অন্তরীপ' নাম নিয়েছে) তিনি প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছান। প্রশান্ত মহাসাগর ধরে তিনি ফিলিপিন্‌সে আসেন ও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা যান। তিন বছর পর তাঁর একটি জাহাজ কয়েকজন মাত্র নাবিককে নিয়ে স্পেনে ফিরে আসে।


ম্যাগেলান

ফলাফল ঃ এইভাবে ভৌগোলিক নূতন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর ভৌগোলিক জ্ঞান প্রসারিত হল। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর আবিষ্কারের ফলে জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করল। নতুন দেশ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন লোকজনের আচার-ব্যবহার, ভাষা, ও সভ্যতা পৃথিবীর মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করল। নতুন দেশ দেখা ও তাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ অত্যধিক বৃদ্ধি পেল।

পৃথিবী যে গোল,—এই ধারণা অনেকেরই ছিল না। যাঁরা বিশ্বাস করতেন, তাঁদের সব সময়ে চার্চের ভয়ে ভীত হয়ে থাকতে হত। যদি পৃথিবী গোল হয়, তবে পশ্চিমদিকে গেলে চীন ও ভারতবর্ষে পৌঁছান সম্ভব নয়। ম্যাগেল্যান সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবীর এক

জায়গা থেকে রওনা হয়ে পৃথিবী ঘুরে আবার সেই জায়গায় পৌঁছান যায়। নাবিক ও অভিযানকারীরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীকে নিকট করে তুলল।

যেখানেই অভিযানকারীরা গেছে, সেইসব জায়গায় তাদের দেশের পতাকা ও ধর্মযাজক উপস্থিত হয়েছে। আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপনের ঢেউ শুরু হয়েছিল। এই ঘটনাই ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গতি নির্ধারণ করেছে। আবিষ্কার ও উপনিবেশ স্থাপনের পেছনে তিনটি বিষয় উৎসাহিত করেছে—সোনা, গৌরব ও ভগবান। কলম্বাসের মতে, সোনা-ই সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রী। অভিযানকারীদের পিছন পিছন এল দখলকারীরা। আমেরিকায় স্পেনীয় দখলকারীদের "কন্‌কুইস্টাডোর" বলা হত। অধিকৃত মানুষদের কঠিন শ্রম করতে হত—বাধা দিলেই মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। স্পেনীয় হিস্‌পানিওলাতে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৫,০০০ থেকে ২৫০ জনে কমে আসে। দুঃখজনক ফল হল দাস-ব্যবসায়ে। আফ্রিকার নতুন আবিষ্কৃত এলাকার অধিবাসীদের দাস হিসাবে বিক্রি করা হত। ভৌগোলিক আবিষ্কারের প্রথম যুগে স্পেন ও পর্তুগাল নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করে এবং সেইসব দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। ক্রমে ইংলণ্ড, নেদারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স, স্পেন ও পর্তুগালের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার জনগণ ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী দেশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আমেরিকা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পৃথক হয়ে স্বাধীন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। আমেরিকার অধিবাসীরা ইংরাজী ভাষায় কথা বললেও আমেরিকান জাতি হিসেবে পরিচিত হয়। ক্রমে উপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়। দক্ষিণ আমেরিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, সিংহল, ভারত ও আফ্রিকার দেশসমূহে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিংশ শতাব্দীতে এইসব দেশের মানুষরা নিজেদের আলাদা জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করে।

প্রশ্নাবলী

১। ভৌগোলিক আবিষ্কারের পিছনে কি কি কারণ ছিল?

২। পর্তুগীজ নাবিকদের সামুদ্রিক অভিযান সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। স্পেনীয় নাবিকদের সামুদ্রিক অভিযান সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর।

ইউরোপের সংস্কার আন্দোলন
(Reformation in Europe)

৪

ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানের দূর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নবজাগরণ-সৃষ্ট অনুসন্ধিৎসা ও সমালোচনামূলক চিন্তা ধর্মকেও আঘাত করে। নবজাগরণের ফলে মানুষ বিনা প্রমাণে বা যুক্তিতে কোন কিছু গ্রহণ করতে রাজী হয় না। এর ফলে খ্রীষ্টান যাজক বা পুরোহিতদের প্রতিও মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তি কমে যায়; গীর্জার আদেশ ও নির্দেশগুলির ভাল ও খারাপ দিক সম্পর্কে মানুষ বিচার করতে শুরু করে। ষোড়শ শতকে গীর্জার বেশির ভাগ যাজক বা পুরোহিত ছিল নীতিহীন ও অর্থলোভী বিলাসী। যাজকদের জীবন ও চরিত্র ধর্মীয় নিয়মমত চলত না। সাধারণ মানুষকে তারা পরলোকের ভয় দেখিয়ে নানাভাবে শোষণ করত। পুরোহিতদের বিবাহ ও সংসার পালন নিষিদ্ধ হলেও, তারা তা মানত না। কেউ কেউ অর্থ দিয়ে যাজকের পদ কিনত। যাজকদের এই দুর্নীতির ফলে সাধারণ মানুষের মনে গীর্জার প্রতি বিরাগ দেখা দেয়। পোপ বা ধর্মগুরু ছিলেন খ্রীষ্টানধর্মের সর্বেসর্বা। তিনি যাজকদের এই দুর্নীতি দূর করার চেষ্টা করেন নি। বরং, ধর্ম-বিশ্বাসী মানুষের কাছ থেকে নানাভাবে অর্থ আদায় করে বিলাসের উপকরণে ব্যয় করতেন।

মধ্যযুগে পোপ ও বিশপরা দাবি করতেন যে, তাঁরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং রাজারা তাঁদের আদেশ মেনে চলতে বাধ্য। এর ফলে রাজাদের ক্ষমতা কমে যায়;—রাজারা পোপের এই দাবি পছন্দ করতেন না। জার্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের অধিবাসীরা তাদের দেশের ক্ষেত্রে পোপের হস্তক্ষেপ পছন্দ করত না। নবজাগরণের ফলে ইউরোপের সাধারণ মানুষ গীর্জার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্রমশ মুখর হয়ে উঠে। রাজারা তাঁদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে এদের দমন করেন নি। এইভাবে গীর্জার বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বইতে থাকে।

মধ্যযুগ থেকেই গীর্জা সাধারণের কাছ থেকে টাইথ, এ্যানেট প্রভৃতি

নানা রকমের কর আদায় করত। এ ছাড়াও গীর্জা ও বিশপদের ছিল বড় বড় জমিদারি ও প্রচুর সম্পদ। খ্রীষ্টধর্মের নিয়ম অনুসারে গীর্জার ধনসম্পদ জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বিদ্যালয়, চিকিৎসাকেন্দ্র ও সেবা-কাজে ব্যয় করার নিয়ম। কিন্তু তা হত না। মানুষ দেখত তাদের দেওয়া অর্থে যাজকেরা বিলাসে ডুবে আছে। গীর্জার হাতে এত অর্থ ও সম্পদ জমিদার এবং সামন্তরাও পছন্দ করত না। এই সম্পদের প্রতি তাদেরও লোভ ছিল। এইজন্য তারা ধর্মসংস্কারে সহযোগিতা করে।

খ্রীষ্টান গীর্জার দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের জন ওয়াইক্লিফ, চতুর্দশ শতাব্দীতে তীব্র আন্দোলন শুরু করেন। তিনি প্রচার করেন যে, (ক) বাইবেলের মতে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক আছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার জন্য যাজকের বা পুরোহিতের প্রয়োজন নেই—



জন ওয়াইক্লিফ

(খ) ধর্মযাজক বা পুরোহিতের অর্থচিন্তা ছেড়ে ঈশ্বরের চিন্তা করা উচিত। (গ) ওয়াইক্লিপ বলেন, বাইবেলের মতে সম্পত্তির উপর সমাজের সকলের সমান অধিকার আছে। ঈশ্বর কাউকে ধনী বা দরিদ্র করে সৃষ্টি করেন নি। ওয়াইক্লিফ ইংরেজীতে বাইবেল অনুবাদ করেন এবং সাধারণ মানুষ বাইবেল পড়ে তাতে কি বলা আছে জানতে পারলে যাককরা বিপদে পড়ে। ওয়াইক্লিফের প্রচারের ফলে ইংলণ্ডে লোলার্ড নামে এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। এই লোলার্ডদের আন্দোলনই ইংলণ্ডে ধর্মসংস্কারের ভিত্তি তৈরি করে।

অস্ট্রিয়ার বোহেমিয়ার **জন হাস্** চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় বিধর্মী বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। জন হাস্ ছিলেন বোহেমিয়ার প্রাগ্-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। জন ওয়াইক্লিফের মতবাদ জন হাসকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি বোহেমিয়ান গীর্জার নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেছেন যে, ধর্মশাস্ত্রই শেষ বিচারক—পোপ

যতক্ষণ ধর্মশাস্ত্র অনুসরণ করছেন, ততক্ষণই তাঁকে মানা যায়। কাউন্সিল অব্ কন্‌স্টান্স তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেন। জন হাসকে পুড়িয়ে মারা হয়।


জন হাস্

পোপের বিরুদ্ধে সার্থক প্রতিবাদের নেতৃত্ব দেন জার্মানির মার্টিন লুথার। লুথার জার্মানির থুরিঙ্গিয়া প্রদেশের ইলিস্‌-বেন গ্রামে এক দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। লুথারের সাহস ও প্রতিভা ছিল অপরিসীম। আত্মার প্রকৃত শান্তির জন্য তিনি আরফার্টে অগাস্টাইন ভ্রাতৃসংঘে যোগ দেন।

১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে লুথার উইটেন্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। এর দু'বছর পরে ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খ্রীষ্টানধর্মের কেন্দ্রস্থল রোম ভ্রমণে যান। যাজক সম্প্রদায়ের অহংকার ও বিলাসিতা তাঁকে কষ্ট দেয়। তিনি দেখলেন খ্রীষ্টান ধর্মাধিষ্ঠান অন্তঃসারশূন্য বাইরের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তিনি উইটেন্‌বার্গে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পরে টেট্‌জেল নামে একজন যাজক সেণ্ট পিটার গীর্জার সংস্কারের খরচ যোগাড় করার জন্য জার্মানির স্যাক্সনীতে উপস্থিত হলেন। টেট্‌জেল 'ইন্‌ডাল্‌জেন্স' বা পাপমুক্তির ছাড়পত্র জার্মানদের কাছে বিক্রি করতে আরম্ভ করলেন। লুথার ধর্মের নামে এই অধর্ম সহ্য করতে পারলেন না। খ্রীষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানের ইন্‌ডাল্‌জেন্স বা পাপমুক্তির ছাড়পত্র বিক্রির প্রতিবাদ জানিয়ে ৯৫ দফা কারণ দেখিয়ে এক প্রতিবাদ-পত্র উইটেন্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় পেরেক দিয়ে লাগিয়ে দিলেন। খ্রীষ্টান ধর্মাধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যে নিজের ধর্মমত প্রকাশ করেছিলেন বলে তাঁর প্রচারিত ধর্মমত প্রতিবাদী


মার্টিন লুথার

খ্রীষ্টধর্ম বা 'প্রোটেস্ট্যান্ট' নামে পরিচিত হয়। লুথারের প্রতিবাদের শাস্তি হিসেবে তাঁকে ধর্ম থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল। পোপ তাঁকে খ্রীষ্টান-ধর্ম থেকে বহিষ্কার করলেন। লুথার তাঁর বহিষ্কারের আদেশ প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলেন। পোপ লুথারের সঙ্গে আপসের কথা চিন্তা করেননি। তাঁকে পোপের সমর্থকরা ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করল।

পোপ দশম লিও-র ইচ্ছানুসারে পবিত্র রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লস ওর্মস নামক স্থানে এক আলোচনা-সভা আহ্বান করলেন। এর মধ্যে জার্মানিতে লুথারের সমর্থকদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। পঞ্চম চার্লস যাতে লুথারের মনে কোনও সন্দেহ না জাগে, সেইজন্য লুথারকে "ভ্রাতা মার্টিন" সম্বোধন করলেন ও জানালেন যে, তাঁর ওপর কোনও অত্যাচার করা হবে না। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে ওর্মসের আলোচনা-সভা বসল। লুথারকে তাঁর মতবাদ ত্যাগ করতে বলা হয়। লুথার জানালেন যে, বাইবেলের ওপর নির্ভর করে যদি কেউ তাঁর মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণ করেন, তবেই তিনি তাঁর মতবাদ ত্যাগ করবেন। তিনি সম্রাট ও সভ্যদের আদেশে ও অনুরোধে তাঁর আদর্শ ত্যাগ করতে রাজী হলেন না। লুথারের আচরণ ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে মনে করা হল। লুথারকে আইনের আশ্রয় থেকে বহিষ্কার করা হল ও তাঁর রচিত বইগুলি জ্বালিয়ে দেবার আদেশ দেওয়া হল। স্যাক্সনীর শাসক ছিলেন লুথারের শুভাকাঙ্ক্ষী। তিনি লুথারের জীবন সম্পর্কে আশঙ্কিত হয়ে তাঁকে ওয়ার্টবার্গ দুর্গে লুকিয়ে রাখলেন।

(খ) ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল

কয়েক বছরের মধ্যে লুথারের শিক্ষা উত্তর ও মধ্য জার্মানিতে ধুলোর ঝড়ের মত সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে গেল। লুথারের বিদ্রোহ ছিল জাতীয়-ধর্মী ও জনপ্রিয়। এই বিদ্রোহ গীর্জার দুর্নীতিতে অসন্তুষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট করেছিল। বাস্তববাদীরা গীর্জার সম্পত্তি দখলের আশায় খুশী হয়েছিলেন। জার্মান দেশপ্রেমীরা ইটালী ও রোমের ক্ষমতা থেকে মুক্ত হওয়ার আশায় এই আন্দোলনে যোগ দেয়। যদিও লুথার ওয়ার্টবার্গ দুর্গে লুকিয়ে থাকলেন, কিন্তু বিদ্রোহের জন্য তাঁর উপস্থিতি আর প্রয়োজন হল না। এমন একটা প্রেরণা এই বিদ্রোহ লাভ করল যে, তাকে আর থামিয়ে

রাখা গেল না। ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জার্মানিতে লুথারের সমর্থনে ও তাঁর আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার জন্য প্রচুর সাহিত্য রচিত হল। জন্ এবার্লীন নামে গান্স্বার্গের একজন প্রাক্তন ফ্রান্সিন্কান সন্ন্যাসী লুথারের প্রধান প্রচারকে পরিণত হলেন। তিনি দেখালেন, কি পরিমাণ অর্থ জার্মানি থেকে প্রতি বছর রোমে চলে যেত। শহরের পর শহর বিদ্রোহী হয়ে গীর্জা আক্রমণ করে পুরানো ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জও জানাল। লুথার স্যাক্সনীর শাসক ফ্রেডারিক ও উইটেন্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য পেয়েছিলেন। ফ্রেডারিকের রাজ্যে, ফ্রেডারিকের সাহায্যে লুথারের মতাদর্শ এক ধর্মীয় মতে পরিণত হয়েছিল। উইটেন্বার্গ বিশ্ববিদ্যালয় লুথারের মত নিয়ে আলোচনা ও প্রচারের ব্যবস্থা করে। জার্মানির কিছু রাষ্ট্র লুথারের ধর্মমত গ্রহণ করে ; আবার কিছু রাষ্ট্র পুরানো মতেই বিশ্বাসী থাকে। স্যাক্সনী, হেসে, প্রাশিয়া ও ব্রাডেনবার্গ নতুন ধর্মমত গ্রহণ করল। ব্যাভেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও রাইন নদীতীরবর্তী দেশগুলি পুরানো মতকেই সমর্থন জানায়।

গীর্জা ও পোপের বিরুদ্ধে লুথারের প্রতিবাদ কিছুদিনের মধ্যেই ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের শাসকরা প্রথমে লুথারের ধর্মমতকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের সঙ্গে একইভাবে গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিন পরে রোমান ক্যাথলিকরা বিদ্রোহ করলে লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতই সরকারী ধর্মমতে পরিণত হয়। এইসব দেশে নিজস্ব কোন ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব না হওয়ায় তারা লুথারের ধর্মমতকেই গ্রহণ করে।

সুইট্জার্ল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত প্রচার করেন জুইংলি। বাল্যকালেই তিনি মানবতাবাদে প্রভাবিত হন। ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মঠে যাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন ও সেই সময় থেকেই তিনি ধর্মসংস্কারে মন দেন। লুথারের মত পাপমুক্তির ছাড়পত্র বিক্রির প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই জুইংলির সংস্কার-আন্দোলন শুরু হয়। তাঁর অনুগামীরা "ক্যাল্ভিন্পন্থী" নামে পরিচিত হন। তিনি জাতিতে ফরাসী হলেও তাঁর কর্মকাণ্ড ছিল সুইট্জারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরকে কেন্দ্র করে। ক্যাল্ভিন যাজকদের দুর্নীতির বিরুদ্ধেই নয়, এমন কি রাজা বা শাসকদের স্বৈরাচারী শাসন ও

দমননীতিরও প্রতিবাদ করেছেন। তিনি নাগরিকদের বিলাসিতা বর্জন করে কঠোর শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বলেন। ক্যাল্‌ভিন শিক্ষার উপর জোর দিতেন। তাঁর স্থাপিত জেনেভার শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্ররা পড়তে আসত। তারা দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর মতবাদকে জনপ্রিয় করে তুলত। এর জন্যই ক্যাল্‌ভিনের মতবাদ লুথারের মতবাদের চেয়ে আরো অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠে।


ক্যাল্‌ভিন

মানবতাবাদীদের প্রভাবে ইংলণ্ডে ধর্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর পূর্বে ওয়াইক্লিফের নেতৃত্বে ধর্মসংস্কার-আন্দোলন শুরু হয়েছিল। 'ধর্মকর' হিসাবেও ধর্মগুরু পোপ ইংলণ্ড থেকে প্রচুর অর্থ পেতেন। ইংলণ্ডের কৃষি-জমির বড় অংশ গীর্জা ও মঠের অধীনে ছিল। অভিজাতরা এই জমি নেওয়ার জন্য উৎসুক ছিল। যাজকদের দুর্নীতির ফলেও জনসাধারণ গীর্জার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। এইভাবে যখন ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছিল, তখন রাজা অষ্টম হেনরীর সঙ্গে তাঁর প্রথমা পত্নী ক্যাথারিনের বিবাহ-বিচ্ছেদকে কেন্দ্র করে পোপের সঙ্গে বিরোধ শুরু হয়। ক্যাথারিনের কোনও পুত্রসন্তান ছিল না। রাজা অষ্টম হেনরী এ্যানি বোলেন নামে এক মহিলাকে বিবাহ করতে চান। তিনি পোপের কাছে আবেদন করেন ক্যাথারিনের সঙ্গে তাঁর বিবাহবিচ্ছেদের অনুমতি দিতে। পোপ অযথা দেরী করায় রাজা অষ্টম হেনরী রেগে গিয়ে মন্ত্রী টমাস ক্রমওয়েলের পরামর্শে ও পার্লামেণ্টের (আইনসভা) সাহায্যে পোপের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে ইংলণ্ডের গীর্জাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। রাজা হেনরী পার্লামেণ্টের আইন বলে ইংলণ্ডের গীর্জার প্রধান বলে ঘোষিত হন। গীর্জার অনুমতিতে রাজা হেনরীর বিবাহবিচ্ছেদ হয় ও তিনি এ্যানি বোলেনকে বিবাহ করেন। এ্যানি বোলেনের গর্ভে হেনরীর কন্যা এলিজাবেথ ভবিষ্যৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বলে ঘোষিত হন। ইংলণ্ডের গীর্জার উপর

থেকে পোপের সব অধিকার ও ক্ষমতা লোপ করা হয়। এইভাবে ইংলণ্ডে ধর্মসংস্কার-আন্দোলন শুরু হয়।

স্কটল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার আন্দোলন জনসাধারণের দ্বারা শুরু হয়। ক্যাল্‌ভিনের শিষ্য জন নক্স ছিলেন স্কটল্যাণ্ডে ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের নেতা। সেই সময়ের রাজনৈতিক আবহাওয়াও ছিল সংস্কারের উপযুক্ত। ধর্ম-



রানী এলিজাবেথ



অষ্টম হেনরী

সংস্কার আন্দোলন দমনের জন্য রানীমাতা ফ্রান্স থেকে সৈন্য আমদানি করলে সামন্তরা তার বিরোধিতা করে। ফরাসী সৈন্য অপসারিত হলেই ধর্মসংস্কারের কাজ দ্রুত অগ্রসর হল। পোপের ক্ষমতা বিলোপ করে ক্যাল্‌ভিনের আদর্শ অনুযায়ী প্রেস্‌বাইটেরিয়ান-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হল।

(গ) ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরে সংস্কার

(১) অভ্যন্তরীণ সংস্কার ও সংহতি ঃ ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতির ফলেই প্রতিবাদী বা প্রোটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলন শুরু হয়েছিল। আবার, ঠিক সেই কারণেই প্রতিসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ক্যাথলিকরাও নিজেদের ধর্মের ত্রুটি ও অনৈতিকতা দূর করার প্রয়োজনীতা বুঝতে পারছিলেন। স্পেনেই প্রথম সংস্কার আরম্ভ হয়। আত্মশুদ্ধির আন্দোলন স্পেনে শুরু হয়ে ইটালীতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্যাথলিক মাত্রেই জীবনকে পবিত্র করে তোলা ও ধর্মাধিষ্ঠানকে পাপমুক্ত করার আন্দোলন শুরু করে। নানারকম সংঘ—থিয়েনৃটাইন, বার্নাইট প্রভৃতি শুদ্ধ জীবন ও দারিদ্র্যের

ভিত্তিতে জীবনের আদর্শ বদলাবার চেষ্টা শুরু করে। ক্রমে এই আত্মশুদ্ধি-আন্দোলন পোপগণও গ্রহণ করেন।

ক্যাথলিক ধর্মের প্রতিবাদীদের দমন করার জন্য পোপ চতুর্থ সিক্স্টাস 'ইনকুইজিশন' বা যাজকদের বিচারসভা প্রবর্তনের আদেশ দেন। এর পিছনে বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীতে একমাত্র সত্যধর্ম হ'ল ক্যাথলিক ধর্ম। স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ড স্পেনে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উচ্ছেদের জন্য ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'ইনকুইজিশন' প্রথা চালু করেন। পোপ চতুর্থ সিক্স্টাসের আদেশে ছ'জন ক্যাথলিক যাজক দ্বারা এই আদালত গঠিত হয়। এই আদালতের বিচারকরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে তাদের কাছে স্বীকারোক্তি আদায় করত যে, তারা ক্যাথলিক ধর্ম মেনে চলবে। তারা এই দাবি না মানলে তাদের উপর দৈহিক অত্যাচার করা হ'ত।

জেস্যুইট সোসাইটি স্থাপিত হলে প্রতিসংস্কার আন্দোলন শক্তিশালী হয়। ইগ্নেশিয়াস লায়লা এই সোসাইটি স্থাপন করেন। লায়লা প্রথম জীবনে সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে তিনি পঙ্গু হয়ে যান ও তখন থেকেই খ্রীষ্টধর্মের সেবকের কাজ করতে থাকেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেস্যুইট সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় পল জেস্যুইট সোসাইটি অনুমোদন দেন। এই সংঘের সভ্যদের ৪টি নীতি পালন করতে হত—(১) চারিত্রিক পবিত্রতা, (২) স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য, (৩) আজ্ঞানুবর্তিতা ও (৪) পোপের আদেশ পালন করা। এ ছাড়াও শিক্ষাবিস্তার করা, অ-খ্রীষ্টানদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া, প্রোটেস্ট্যাণ্টদের ক্যাথলিক ধর্মে ফিরিয়ে আনা ছিল জেস্যুইটদের আদর্শ। জেস্যুইটরা রাজনীতিতেও অংশ গ্রহণ করত। জেস্যুইটদের চেষ্টার ফলেই স্পেন, পোল্যাণ্ড, ইটালী ও ফ্রান্সে প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম লোপ পায়। ইউরোপের বহু দেশের প্রোটেস্ট্যাণ্টদের তারা ক্যাথলিক ধর্মে ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়।

ট্রেন্টের কাউন্সিল প্রতিসংস্কার আন্দোলনকে জোরদার করেছে। এই সভা পবিত্র রোমক সম্রাট পঞ্চম চার্লস স্থাপন করেন। পোপের সমর্থন না পেয়েও নানা বাধা উপেক্ষা করে তিনি সভা স্থাপন করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর যাবতীয় খ্রীষ্টান প্রতিনিধিদের নিয়ে লুথার-প্রচারিত প্রোটেস্ট্যাণ্ট-সমস্যা সমাধান করা। ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সভা কয়েকটি

অধিবেশনে মিলিত হয়। ট্রেন্টের সভার মাধ্যমে পঞ্চম চার্লস ক্যাথলিক ধর্মাধিষ্ঠানের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা হল না। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মের মধ্যে আপসও সম্ভব হয়নি। এই সভায় প্রোটেস্ট্যাণ্ট-বিরোধী মনোভাব দেখে প্রোটেস্ট্যাণ্ট প্রতিনিধিরা সভা ত্যাগ করে। এই সভায় পোপের প্রাধান্য স্বীকার করে লুথারের মতবাদকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

(২) পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ ঃ পবিত্র রোমক সম্রাট পঞ্চম চার্লস ওর্মসের সভায় লুথারের বিরুদ্ধে প্রস্তাব নিতে অগ্রণী ছিলেন। কারণ লুথারের ধর্মকে বাড়তে দিলে জার্মান রাজারা চার্লসের বিরুদ্ধে চলে গিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। ওর্মসের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার আগেই চার্লস ইটালীর যুদ্ধে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। জার্মানির লুথার-পন্থী রাজ্যগুলি ওর্মসের সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যাখ্যান করল। ক্যাথলিক রাজ্য-গুলিও সেই সিদ্ধান্ত প্রয়োগের একাগ্রতা দেখাল না। ফ্রান্সকে পরাজিত করে চার্লস পুনরায় ধর্মসংস্কার আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করলেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অগস্‌বার্গে এক সভা আহ্বান করলেন। সেখানে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্টপন্থী রাজারা উপস্থিত ছিলেন। "অগস্‌বার্গ স্বীকারোক্তি" নামে দলিলে প্রোটেস্ট্যাণ্টরা তাদের ধর্মনীতি ব্যাখ্যা করল। চার্লস ক্যাথলিক পক্ষ গ্রহণ করেন। আত্মরক্ষার্থে প্রোটেস্ট্যাণ্টরা "স্মলক্যাণ্ডি লীগ" নামে এক সংঘ স্থাপন করল। চার্লস তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ায় আপাতত যুদ্ধ বন্ধ রইল। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ট্রেন্টের সভা আহ্বান করলে প্রোটেস্ট্যাণ্টরা সেই সভা ত্যাগ করে। আপসে মীমাংসা সম্ভব নয় দেখে চার্লস প্রোটেস্ট্যাণ্ট লীগের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। জার্মানিতে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে যুদ্ধে ক্যাথলিক পক্ষের নেতা পঞ্চম চার্লস প্রথম দিকে জয়ী হলেও শেষ পর্যন্ত লুথারপন্থীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে অগস্‌বার্গের সন্ধিতে আপস হয়। এই সন্ধিতে লুথার-প্রতিষ্ঠিত প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম আইনত স্বীকৃত হল। জার্মানির রাজন্যবর্গ ইচ্ছামত প্রোটেস্ট্যাণ্ট বা ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে ও নিজের ধর্ম প্রজার ওপর চাপাতে পারবে স্থির হয়; অর্থাৎ রাজার ধর্ম-ই প্রজার ধর্ম হবে ঠিক হল।

(৩) নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উচ্ছেদ-সাধনে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপের প্রচেষ্টা :

বর্তমান হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম নিয়ে গঠিত ছিল নেদারল্যাণ্ড। এই রাজ্যের উত্তর অংশ ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট ও দক্ষিণ অংশ ক্যাথলিক। সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ নেদারল্যাণ্ডকে পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন। স্পেনের সম্রাটের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নেদারল্যাণ্ডের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর অনুরাগীদের উচ্চপদে নিয়োগ করেন। নেদারল্যাণ্ডের অভিজাতরা তাঁদের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে অসন্তুষ্ট হলেন। নেদারল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ তাদের দেশে স্পেনীয় সৈন্য রাখা বরদাস্ত করত না। দ্বিতীয় ফিলিপ নেদারল্যাণ্ডে প্রচুর করভার বাড়িয়ে দেন ও ডাচ ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর নানারকম বাধানিষেধ আরোপ করেন। এই বাধানিষেধ আরোপ করা হয় স্পেনীয় বাণিজ্যের স্বার্থে। এইভাবে তিনি নেদারল্যাণ্ডের বাণিজ্যে আঘাত করেন। এইসব অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত হল 'ইন্‌কুইজিশন' বা যাজকদের আদালতের অত্যাচার। সম্রাট পঞ্চম চার্লসের অত্যাচারী ব্যবস্থা সত্ত্বেও নেদারল্যাণ্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মকে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি। অপর দিকে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম ক্যাল্‌ভিন মতবাদ গ্রহণ করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গোঁড়া ক্যাথলিক দ্বিতীয় ফিলিপের পক্ষে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম সহ্য করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং, তিনি অকথ্য অত্যাচার শুরু করলেন। তিনি নেদারল্যাণ্ডে বিশপদের সংখ্যা বাড়ালেন। যাজকদের বিচারসভার কার্যকলাপ বৃদ্ধি করে দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর প্রজাদের ওপর জোর করে ক্যাথলিক ধর্ম চাপাবার চেষ্টা করেন। এই অত্যাচার ও দ্বিতীয় ফিলিপের জাতীয়তাবিরোধী ব্যবস্থা নেদারল্যাণ্ডে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি করে। এই অসন্তুষ্টি বিদ্রোহে পরিণত হল।

এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জ। দ্বিতীয় ফিলিপ জবরদস্ত শাসক ডিউক অব্ আল্‌ভাকে পাঠিয়েও এই বিদ্রোহ দমন করতে পারলেন না। উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নেমে আল্‌ভার কাছে জেমিন্‌জেন নামক স্থানে পরাজিত হন। আল্‌ভার অত্যাচারে অনেক ডাচ দেশ ত্যাগ করে জলদস্যুর বৃত্তি গ্রহণ করে "সমুদ্র-ভিখারী" নামে পরিচিত হয়। এরা হঠাৎ ব্রিল শহরটি দখল করলে প্রকৃতপক্ষে ডাচ স্বাধীনতা-

আন্দোলন শুরু হল। ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জের নেতৃত্বে উত্তরের সাতটি রাষ্ট্র "ইউনিয়ন অব্ ইউট্রেক্ট" গঠন করে ও ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অধিকার থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করে।



১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম অব্ অরেঞ্জ মারা যান। ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথ এই সময় ডাচ স্বাধীনতা-যুদ্ধে সাহায্য পাঠান। 'স্প্যানিশ আর্মাডা'র ইংলণ্ড দখলের চেষ্টা ব্যর্থ হলে স্পেনের আক্রমণের ধার নষ্ট হয়ে যায়। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেক্টের সন্ধিতে উত্তরের রাজ্যগুলি স্বাধীন হয়ে যায়। উত্তরের অংশ হল্যাণ্ড নামে পরিচিত হল। দক্ষিণ অংশ বেলজিয়াম নাম দিয়ে ক্যাথলিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

(ঙ) প্রোটেস্ট্যাণ্ট ইংলণ্ড ও উহার চার্চকে নিজের কর্তৃত্বে আনার জন্য দ্বিতীয় ফিলিপের প্রয়াস :

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডকে তাঁর প্রভাবে আনতে চেষ্টা করেন। ইংলণ্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব না থাকলে নেদারল্যাণ্ডের ওপর কর্তৃত্ব রাখা মুশকিল। ক্যাথলিক ধর্মের রক্ষক হিসেবেও ইংলণ্ডকে পুনরায় মাতৃধর্মে ফিরিয়ে আনা তাঁর কর্তব্য মনে করেছিলেন। রাজত্বের শুরুতে দ্বিতীয় ফিলিপ ইংলণ্ডের রানী মেরীকে বিবাহ করলে ইংলণ্ড ও স্পেনের মধ্যে তাঁর ইপ্সিত সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়। মেরী ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ফিলিপের সন্তুষ্টি বিধান করলেন। মেরীর মৃত্যুর পর ইংলণ্ডে স্পেনের প্রভাব কমতে থাকে। ইংলণ্ডের সিংহাসনে এই সময় এলিজাবেথ বসেন। ফিলিপ এলিজাবেথকে বিবাহ করে তাঁর প্রভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষার পর এলিজাবেথ সেই প্রস্তাব নাকচ করেন। এরপর ফিলিপ এলিজাবেথের বিরুদ্ধে ক্যাথলিকদের ষড়যন্ত্রে সাহায্য করতে থাকেন। এইসব ষড়যন্ত্রের মূলে ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের রানী মেরী স্টুয়ার্ট। তিনি স্কটল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে ইংলণ্ডে এসে এলিজাবেথের আশ্রয়ে ছিলেন। মেরী স্টুয়ার্টের মৃত্যুদণ্ড হলে ফিলিপের ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি এলিজাবেথকে শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হলেন। ইংরেজ জলদস্যুদের ক্রমাগত স্পেনীয় জাহাজ আক্রমণ ও নেদারল্যাণ্ডকে এলিজাবেথের সাহায্য ফিলিপের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেয়। ইংলণ্ডকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি 'স্পানিশ আর্মাডা' নামে এক শক্তিশালী নৌবহর তৈরি করেন। কিন্তু এই নৌবহর সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এর ফলে স্পেনের জায়গায় ইংলণ্ড বাণিজ্যিক ও সামুদ্রিক প্রাধান্য লাভ করল।

প্রশ্নাবলী

১। ক্যাথলিক চার্চের দুর্নীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। জন ওয়াইক্লিফ ও জন হাস্ কিভাবে ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন ?

৩। মার্টিন লুথার কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন? তিনি কিভাবে ও কেন চার্চের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন?

৪। জার্মানিতে লুথারের প্রতিবাদের ফলাফল কি হয়েছিল?

৫। জুইংলি ও ক্যাল্ভিন সম্পর্কে যা জান লেখ।

৬। ইংলণ্ড কিভাবে ও কেন ক্যাথলিক চার্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়?

৭। ক্যাথলিক চার্চের অভ্যন্তরে সংস্কার সম্পর্কে যা জান লেখ।

৮। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে যা জান লেখ।

৯। নেদারল্যাণ্ডে বিদ্রোহের বর্ণনা দাও।

১০। দ্বিতীয় ফিলপ কিভাবে ইংলণ্ডকে নিজের কর্তৃত্বে আনার চেষ্টা করেছিলেন? তার ফল কি হয়?

৫

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের বিপ্লব
(The English Revolution in the 17th Century)

রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিবাদের মূল কারণ ঃ স্টুয়ার্ট বংশ যখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করে, তখন ইংরেজ জনসাধারণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। রাজার স্বৈরাচারী ক্ষমতা তারা নির্বিবাদে মানতে রাজী ছিল না। স্টুয়ার্টরা ছিলেন ভগবদ্দত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাসী। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, তাঁরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েছেন। সুতরাং কারও কাছে তাঁরা কৈফিয়ত দেবেন না। ফলে জন-প্রতিনিধি-সভা, —পার্লামেণ্টের সঙ্গে তাদের বিরোধ দেখা দেয়।

স্টুয়ার্ট রাজত্বকালে ইংলণ্ডে এক নতুন শ্রেণীর আবির্ভাব হয়েছিল। জমিদার, সচ্ছল ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও উচ্চশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা এই শ্রেণীভুক্ত ছিল। টিউডর যুগে গীর্জার জমি কিনে এই শ্রেণী খুব ধনবান হয়ে ওঠে। এই শ্রেণীর থেকেই বেশির ভাগ মানুষ পার্লামেণ্টে নির্বাচিত হত। ফলে, স্টুয়ার্টদের সঙ্গে এই শ্রেণীয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

পার্লামেণ্ট ও রাজার মধ্যে চরম বিবাদ শুরু হয়। ধর্মই ছিল এই বিবাদের প্রধান কারণ। স্টুয়ার্টরা ছিলেন রক্ষণশীল প্রোটেস্ট্যাণ্ট, আর পার্লামেণ্টের বেশির ভাগ সদস্যই ছিলেন সংস্কারপন্থী পিউরিটান। পিউরিটানরা এলিজাবেথ প্রতিষ্ঠিত চার্চের আমূল সংস্কার দাবি করলেন। তাঁরা চার্চের কয়েকটি অনুষ্ঠানের বিলুপ্তি চাইলেন। স্টুয়ার্টরা এই দাবি না মানলে ক্রমাগত বিবাদ চলতে থাকে।

কর স্থাপন নিয়েও স্টুয়ার্ট রাজাদের সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিবাদ দেখা দেয়। স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম জেমস ও প্রথম চার্লস পার্লামেণ্টের বিনা অনুমতিতে কর তোলেন। প্রথম চার্লসের সময় এই বিবাদ চরমে ওঠে। চার্লস অবৈধভাবে অর্থ তুললে পরবর্তী পার্লামেণ্ট "অধিকারের আবেদন" জানায়। পার্লামেণ্ট স্পীকারকে জোর করে বসিয়ে রেখে ধর্ম এবং অর্থ-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রস্তাব পাস করে।

প্রথম চার্লস এরপর ব্যক্তিগত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন। এই শাসনব্যবস্থা "থরো" নামে পরিচিত। পিউরিটানদের ওপর এই সময় অত্যাচার হয়। স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে চার্লস পার্লামেণ্ট ডাকেন। এই পার্লামেণ্ট 'দীর্ঘ পার্লামেণ্ট' নামে পরিচিত (১৬৪০ খ্রীঃ)। এই পার্লামেণ্টে রাজার স্বৈরাচারী অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। পার্লামেণ্ট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা দাবি করল। এই সময় পার্লামেণ্টের যে সদস্যরা রাজার পক্ষে ছিলেন, তাঁরা ক্যাভালিয়ার, ও যাঁরা পার্লামেণ্টের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা 'রাউণ্ডহেড' বা "নেড়া মাথার দল" নামে পরিচিত হন। রাজা পাঁচজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে এলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় (১৬৪২ খ্রীঃ)। প্রায় পাঁচ বছর যুদ্ধ চলার পর পার্লামেণ্ট জয়লাভ করে। প্রথম চার্লস বন্দী হন ও ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। পার্লামেণ্ট এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

ক্রম্‌ওয়েল ও কমন্‌ওয়েথ ঃ প্রথম চার্লসের মৃত্যুর পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পার্লামেণ্ট এক প্রস্তাব পাস করে রাজপদের উচ্ছেদ করে। ইংলণ্ডকে একটি কমন্‌ওয়েল্‌থ বা সাধারণতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হল। লর্ড-সভাও উঠিয়ে দেওয়া হয়। শাসন পরিচালনার দায়িত্ব পড়ল "কাউন্সিল অব স্টেট" নামে কার্য-নির্বাহক সভার ওপর। এই ব্যবস্থা উপযুক্ত না হওয়ায় গৃহযুদ্ধে পার্লামেণ্টের সেনাপতি অলিভার ক্রম্‌ওয়েল ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দিয়ে "লর্ড প্রটেক্টর" উপাধি নিয়ে শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। প্রথম নির্বাচিত পার্লামেণ্টের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধলে তিনি "মেজর জেনারেল" নামে কর্মচারীদের সাহায্যে দেশ শাসন করতে লাগলেন। নতুন পার্লামেণ্ট ক্রম্‌ওয়েলকে রাজমুকুট গ্রহণের জন্য উপদেশ



অলিভার ক্রম্‌ওয়েল

দিলে ক্রমওয়েল পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন। প্রথম চার্লসের চেয়ে ক্রমওয়েলের স্বেচ্ছাচার আরও কঠোর ছিল। তাঁর সময়ে ইউরোপে ইংলণ্ডের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব : ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল লর্ড প্রটেক্টরের পদ গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাজ্যে যে গোলমাল দেখা দিল, তা তিনি দমন করতে পারলেন না। এই অবস্থায় সেনাপতি মঙ্ক নতুন পার্লামেন্টের নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন। লর্ড-সভাও পুনরায় আহ্বান করা হল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি মঙ্ক প্রথম চার্লসের পুত্রকে সিংহাসনে বসার আমন্ত্রণ জানালেন। দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসনে বসলে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা পার্লামেন্টের ইচ্ছা অনুযায়ী হয়েছিল। সুতরাং দ্বিতীয় চার্লস পার্লামেন্টের বিরোধিতা করেননি। দ্বিতীয় চার্লস ক্যাথলিক ধর্মের সমর্থক ছিলেন। কিন্তু পার্লামেন্ট প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের অনুরাগী থাকায় চার্লস ক্যাথলিকদের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে পারেননি। তিনি বুদ্ধিমান হওয়ায় তাঁকে আর বিদেশে থাকতে হয়নি। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। যাঁরা চার্লসের ভ্রাতা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী জেমসের সিংহাসন আরোহণের বিরুদ্ধে ছিলেন, তাঁরা "আবেদনকারী" ও যাঁরা দ্বিতীয় চার্লসের সমর্থক ও দ্বিতীয় জেমসের সিংহাসনে আরোহণের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা "ঘৃণাকারী দল" নামে পরিচিত হয়। এই দল দুটি পরে যথাক্রমে 'হুইগ' ও 'টোরী' নামে পরিচিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় চার্লসের পর সিংহাসনে বসেন তাঁর ভাই ক্যাথলিক দ্বিতীয় জেমস। দ্বিতীয় চার্লসের মত শান্ত স্বভাব তাঁর ছিল না। তিনি ছিলেন ঘোর ক্যাথলিকপন্থী। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডে ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করা। তিনি যে-কোনও ব্যক্তিকে আইনের প্রয়োগ থেকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানান। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি পূর্বতন আইন ভঙ্গ করে বহু ক্যাথলিককে ধর্মাধিষ্ঠানে ও শাসনকাজে চাকরি দিতে আরম্ভ করলেন। যে কোনও আইন স্থগিত রাখার ক্ষমতাও দাবি করেন। তিনি একের পর এক ক্যাথলিক-বিরোধী আইনগুলি স্থগিত রাখতে শুরু

করলেন। তিনি একজন ক্যাথলিককে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডীন' না-করার অপরাধে সব 'ফেলো'কে পদচ্যুত করলেন ও নিজের মনোনীত একজন ক্যাথলিককে ডীন-এর পদে নিযুক্ত করলেন। একজন ক্যাথলিককে বিনা পরীক্ষায় ডিগ্রি না-দেওয়ার অপরাধে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারকে পদচ্যুত করা হল। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "ডিক্লারেশন অব্ ইন্‌ডাল্‌জেন্স" ঘোষণা করে ক্যাথলিক ও অন্যান্য বিরোধীদের বিরুদ্ধে সব আইন স্থগিত রাখলেন। পরের বছর ঐ ঘোষণা পুনরায় জারী করে আদেশ দিলেন যে, এই ঘোষণা সব ধর্মাধিষ্ঠানেই পাঠ করতে হবে। ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপ সমেত ছ'জন বিশপ এই আদেশ না মানলে তাঁদেরকে বন্দী করা হয়। বিচারে তাঁরা মুক্তি পান।



দ্বিতীয় জেমস্

ইংরেজরা দ্বিতীয় জেমসের উপর ভীষণ রুষ্ট হয়ে উঠল। এই সময় দ্বিতীয় জেমসের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইংরেজরা ভেবেছিল, অপুত্রক জেমসের কন্যা হল্যাণ্ডের শাসক উইলিয়ামের স্ত্রী মেরী ভবিষ্যতে রানী হবেন। মেরী ছিলেন ধর্মে প্রোটেস্ট্যান্ট। জেমসের পুত্র পিতার মত ক্যাথলিক হবেন মনে করে হুইগ ও টোরী দল ইংরেজ-জাতির পক্ষে হল্যাণ্ডের শাসক উইলিয়ামকে সিংহাসনে বসার জন্য আমন্ত্রণ জানাল। প্রথমে ঠিক ছিল মেরী হবেন রানী ও উইলিয়াম হবেন তাঁর সহচর। কিন্তু উইলিয়াম তাতে রাজী না হওয়ায় তাঁদেরকে যুগ্ম রাজা ও রানীর পদ দেওয়া হল। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে উইলিয়াম ডেভন্‌শায়ারে উপস্থিত হলে দ্বিতীয় জেমস্ ফ্রান্সে পালিয়ে যান। বিনা রক্তপাতে এই বিপ্লব হয়েছে বলে একে 'গৌরবময় বিপ্লব' বলে। ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট উইলিয়াম ও মেরীকে সিংহাসন দেওয়ায়

ভগবদ্দত্ত মতবাদের অবসান হল। ইংরেজ শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্ট সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হল।

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্ট "বিল অব্ রাইট্স" বা অধিকারের আইন পাস করে। এই আইনে বলা হয়—(১) উইলিয়াম ও মেরীর পর কে সিংহাসন পাবে; (২) কোনও ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি বা ক্যাথলিকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ কেউ ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসতে পারবে না; (৩) স্টুয়ার্ট আমলে অত্যাচারের যন্ত্র 'হাই কমিশন' ও অন্যান্য বিচারালয় তুলে দেওয়া হল; (৪) পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কোনও কর তোলা যাবে না। এই আইনের ফলে রাজার স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা রইল না। প্রকৃতপক্ষে গৌরবময় বিপ্লবের পর ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। মূল ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকার পেল জনগণের প্রতিনিধি-সভা 'পার্লামেন্ট'।

প্রশ্নাবলী

১। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে কি কি কারণে বিবাদ শুরু হয়েছিল?

২। অলিভার ক্রমওয়েলের শাসনের বিবরণ দাও।

৩। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কি কারণে বিপ্লব দেখা দেয়?

৪। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর।

ভারতবর্ষ
(India)

৬

(ক) মুঘল সাম্রাজ্য

(১) প্রতিষ্ঠা, বৃদ্ধি ও বিস্তার (১৫২৬ থেকে ১৭০৭ খ্রীঃ): ভারতবর্ষের ইতিহাসে সুলতানী রাজত্বের পর মুঘল রাজত্ব আরম্ভ হয়। মুঘলদের শরীরে তুর্কী ও মোঙ্গল রক্তের মিলন ঘটেছিল। এদের ভাষা ছিল তুর্কী। মুঘলরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে চাঘ্‌তাই তুর্কী।

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে মুঘলরাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন বাবর। তাঁর আসল নাম ছিল জহিরউদ্দিন মুহম্মদ। বাবর পিতার দিক থেকে তৈমুরের ও মাতার দিক থেকে চেঙ্গিস খাঁর বংশধর। তাঁর পিতা ওমর শেখ মির্জা মধ্য এশিয়ার ফরগনা নামে ছোট রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। এগার বছর বয়সে বাবর পিতার মৃত্যুর পর ফরগনার শাসনভার পান। কিন্তু তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। উজবেক নেতা সাহাবানী খাঁ বাবরের রাজ্য দখল করলে তিনি রাজ্যহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাবুল দখল করেন। পিতৃভূমি উদ্ধারের কোন আশা না থাকায় বাবর ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। তখন ভারতের ভিতরে বিশৃঙ্খলা তাঁকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করে। আফগান লোদী বংশের ইব্রাহিম লোদী ছিলেন দিল্লীর সুলতান। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ও সুলতানের খুল্লাতত আলম খাঁ লোদী নিজ-নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান। সেই সুযোগে ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পাঞ্জাবে উপস্থিত হন। কিন্তু অন্য প্রয়োজনে তিনি কাবুলে ফিরে যান। ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পুনরায় ভারতে এসে



বাবর

পাঞ্জাব দখল করে নেন। বাবর দিল্লী ও আগ্রার দিকে অগ্রসর হলে ইব্রাহিম লোদী তাঁকে বাধা দেওয়ার জন্যে সসৈন্যে পানিপথের প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে তুমুল যুদ্ধের পর বাবর পানিপথে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন। তিনি দিল্লী ও আগ্রা দখল করে ভারতবর্ষে মুঘল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। বাবর জানতেন রাজপুতদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য। ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খানুয়ার যুদ্ধে রাজপুত বীর সংগ্রামসিংহকে পরাজিত করেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিরা ইব্রাহিম লোদীর ভাই মামুদ লোদীর নেতৃত্বে শক্তি সঞ্চয় করছিল। বাবর গোগ্‌রার (১৫২৯ খ্রীঃ) যুদ্ধে আফগান দলপতিদের পরাজিত করেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাবরের মৃত্যু হয়।

হুমায়ুন (রাজত্বকাল—১৫৩০-৪০ খ্রীঃ; ১৫৫৫-৫৬ খ্রীঃ): বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ্‌কে শাস্তি দেওয়ার জন্য হুমায়ুন গুজরাট দখল করেন। এই সময়ে আফগান নেতা শের খান বিহারে শক্তি সুদৃঢ় করে বাংলার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। হুমায়ুন ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে শের খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হুমায়ুন বাংলায় পৌঁছলে শের খান আগ্রার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে শের খান চৌসা নামক স্থানে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন। ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন পুনরায় শের খানের কাছে কনৌজের নিকটে বিল্লগ্রামে পরাজিত হয়ে (১৫৪০ খ্রীঃ) ভারত ত্যাগ করে পারস্যে আশ্রয় নেন। শের খানের মৃত্যুর পর তিনি পারস্যের সাহায্যে কাবুল ও কান্দাহার পুনরুদ্ধার করেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সরহিন্দের যুদ্ধে সেকেন্দার শূরকে পরাজিত করে পুনরায় ভারতে মুঘল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের মৃত্যু হয়।


হুমায়ুন

শের শাহ (রাজত্বকাল—১৫৪০-১৫৪৫ খ্রীঃ): দিল্লীর শূন্য সিংহাসনে বসে শের খান "শের শাহ" উপাধি নেন ও আফগান রাজত্ব পুনঃস্থাপন

করলেন। ১৫৪০-১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাত্র ৫ বছরের রাজত্বকালে, তিনি একটি বিশিষ্ট শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই সময়ের জন্য তিনি বাংলার বিদ্রোহ দমন করে সিন্ধু, মুলতান, গোয়ালিয়র, মালব ও যোধপুর জয় করেন। কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধ করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।



শের শাহ

আকবর (রাজত্বকাল—১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ): মুঘলবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবর ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আফগান ও রাজপুতরা তখনও ছিল শক্তিশালী। সিন্ধু, কাশ্মীর, মালব, গুজরাট, উড়িষ্যা, বাংলা ও দাক্ষিণাত্য তখনও ছিল স্বাধীন। হুমায়ুনের মৃত্যুর সময় আকবর ও তাঁর অভিভাবক বৈরাম খাঁ ছিলেন পাঞ্জাবে। আফগান দলপতি বাংলা ও বিহারের শাসক আদিল শূর তাঁর মন্ত্রী হিমুকে পাঠালেন দিল্লী ও আগ্রা দখল করতে। হিমু মুঘল কর্মচারীদের বিতাড়িত করে আগ্রা ও দিল্লী দখল করে নিজে "বিক্রমজিৎ" উপাধি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রান্তরে আকবরের সঙ্গে হিমুর মুখোমুখি সাক্ষাৎ হল। তুমুল যুদ্ধের পর হিমু পরাজিত ও নিহত হলেন। আকবর দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করলেন। আকবর পুরোপুরি সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট ছিলেন। সমগ্র ভারত জয় করে অখণ্ড সাম্রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছা তাঁর ছিল।



আকবর

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মধ্যপ্রদেশের গণ্ডোয়ানা রাজ্য জয় করেন। আকবর রাজপুতদের কাছ থেকে 'বন্ধুত্বমূলক বশ্যতা' আদায় করে তাঁদের সাহায্যে সারা ভারতে রাজ্যবিস্তারের পরিকল্পনা করেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে অম্বররাজ বিহারীমল আকবরের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়া বন্ধুত্ব করেন। মেবারের রানা উদয় সিংহ বশ্যতা স্বীকার না করলে আকবর ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মেবার আক্রমণ করেন। চিতোর আকবরের অধিকারে এলেও সম্পূর্ণ মেবার দখল করা সম্ভব হল না। চিতোর দখলের পর একে একে রণথম্বোর, জয়সলমীর, বিকানীর, বুন্দি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে। ১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে রানা উদয় সিংহের মৃত্যুর পর রানা প্রতাপ সিংহ মেবারের রানা হন। ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে রানা প্রতাপ হলদিঘাটের যুদ্ধে রাজা মানসিংহ ও যুবরাজ সেলিমের কাছে পরাজিত হয়েও আত্মসমর্পণ করেননি। তাঁর বীরত্ব ও স্বাধীনতাস্পৃহা তাঁকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। আকবর মেবার দখল করতে ব্যর্থ হন। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আকবর গুজরাট দখল করেন। বাংলার শাসক দাউদ কাররানী বিদ্রোহী হলে আকবর ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা জয় করলেন। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তাঁর দখলে আসে। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারে পারস্যদেশীয় শাসক আকবরের হাতে কান্দাহার দুর্গ তুলে দেন। এরপর আকবর দাক্ষিণাত্যের দিকে দৃষ্টি দেন। দাক্ষিণাত্যে চারটি স্বাধীন রাজত্ব ছিল—খান্দেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা। এদের মধ্যে খান্দেশ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে। আকবরের বন্ধু আবদার রহিমের নেতৃত্বে মুঘলবাহিনী আহম্মদনগর আক্রমণ করে। নাবালক শাককের পিসি চাঁদবিবি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত সন্ধি করে বেরার প্রদেশ মুঘলদের হাতে ছেড়ে দেন। আহম্মদ-নগরের অভিজাতরা এই সন্ধি অগ্রাহ্য করলে পুনরায় মুঘল সৈন্যবাহিনী আক্রমণ করে দৌলতাবাদ দুর্গ দখল করে নেয়। খান্দেশের শাসক মিঞা বাহাদুর শাহ আকবরের বশ্যতা অস্বীকার করলে ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে আকবর



প্রতাপ সিংহ

আসীরগড় দুর্গ ও বুর্‌হানপুর দখল করে নেন। এই যুদ্ধই তাঁর জীবনের শেষ বড় যুদ্ধ। ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে যুবরাজ সেলিম বিদ্রোহ করেন ও পরাজিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়।


জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর (রাজত্বকাল ১৬০৫–১৬২৭ খ্রীঃ): আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম নিয়ে মুঘল সিংহাসনে বসেন। রাজত্বের প্রথমেই তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র খস্‌রু বিদ্রোহ করে। জাহাঙ্গীর খস্‌রুকে দমন করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। শিখগুরু অর্জুন খস্‌রুকে সাহায্য করায় জাহাঙ্গীর তাঁকে হত্যা করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রাজপুত্র খুর্‌রম মেবারের রানা অমর সিংহকে পরাজিত করেন। জাহাঙ্গীর নামেমাত্র বশ্যতা স্বীকারের বিনিময়ে মেবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর শের আফগানের বিধবা স্ত্রী মেহেরুন্নেসাকে বিয়ে করে 'নূরজাহান' নাম দেন। এর পর শাসনক্ষমতা নূরজাহানের হাতে চলে আসে। দাক্ষিণাত্যে আহম্মদনগরের মন্ত্রী মালিক অম্বর মুঘল রাজত্ব দখল করতে থাকলে সমস্যা দেখা দেয়। ১৬১৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুত্র খুর্‌রম মালিক অম্বরকে পরাজিত করে আকবরের আমলের রাজ্যসীমা পুনরুদ্ধার করেন। জাহাঙ্গীর খুর্‌রমকে 'শাহজাহান' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আব্বাস কান্দাহার দখল করে নেন। এর পর শাহজাহান নূরজাহানের ষড়যন্ত্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। মহব্বৎ খাঁ ও রাজপুত্র পারভেজ শাহজাহানকে দমন করলেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়।

শাহজাহান (রাজত্বকাল ১৬২৮–১৬৫৮ খ্রীঃ): জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সিংহাসন নিয়ে রাজপুত্র শাহরিয়র ও শাহজাহানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।

শাহজাহান এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন শাহজাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর পুরোপুরি দখল করা হয়। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বশ্যতা স্বীকার করে। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিনা যুদ্ধে কান্দাহার পুনরায় মুঘল অধিকারে আসে। শাহজাহান মধ্য এশিয়া জয়ের পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যে রাজপুত্র মুরাদের নেতৃত্বে এক সেনাদল বাল্‌খে পাঠানো হয়। মধ্য এশিয়ার কঠোর জীবনযাত্রা সহ্য করতে না পারায় মুরাদ ফিরে আসেন। ঔরঙ্গজেবকে পাঠানোর ফলেও কোনও লাভ হয় না। মধ্য এশিয়া জয় করা সম্ভব হল না। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য পুনরায় কান্দাহার দখল করে। ১৬৪৯, ১৬৫২ ও ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে দু'বার ঔরঙ্গজেব ও তৃতীয়বার রাজপুত্র দারা চেষ্টা করেও কান্দাহার পুনরুদ্ধার করতে পারলেন না। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব দ্বিতীয়বার দাক্ষিণাত্যের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখলের পরিকল্পনা করলেও শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার হস্তক্ষেপের ফলে তা সম্ভব হয়নি।



শাহজাহান

ঔরঙ্গজেব (রাজত্বকাল ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) : শাহজাহানের মৃত্যুর আগে তাঁর চারপুত্র দারা, শিকো, সুজা, ঔরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই হয়। ঔরঙ্গজেব অন্য তিন জনকে পরাজিত করে ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে "আলমগীর" উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। সিংহাসনে বসেই তিনি রাজ্য-বিস্তারে মন দেন। মীরজুমলাকে তিনি বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। মীরজুমলা কুচবিহার ও আসাম দখল করতে সক্ষম হন। উত্তর-পশ্চিমের উপজাতিরা মুঘল রাজত্বে হানা দিতে আরম্ভ করলে ঔরঙ্গজেব কঠোর হাতে তাদের দমন করেন। ঔরঙ্গজেব গোঁড়া সুন্নী

মুসলমান ছিলেন। তার সংকীর্ণ ধর্মনীতির ফলে জাঠ, সৎনামী, শিখ ও রাজপুতরা বিদ্রোহ করে। ঔরঙ্গজেব শিখগুরু তেগ বাহাদুরকে হত্যা করেন। ফলে শিখরা গুরু গোবিন্দের নেতৃত্বে মুঘলদের বিরোধিতা করতে আরম্ভ করে। তিনি রাজপুতনার মারোয়াড়ের অধিপতি যশোবন্ত সিং-এর মৃত্যুর পর তাঁর শিশুপুত্র অজিত সিং-কে আটক করে মাড়োয়ার দখল করতে চেষ্টা করলে রাজপুতরা যুদ্ধে নামে। রাজপুতরা রাঠোর-সর্দার দুর্গাদাসের নেতৃত্বে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। মেবারের রানা রাজসিংহও এই যুদ্ধে যোগ দেন। ঔরঙ্গজেবের পুত্র আকবর এই সময় বিদ্রোহী হয়ে রাজপুতদের পক্ষে যোগ দেন। ঔরঙ্গজেব বাধ্য হয়ে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের সঙ্গে সন্ধি করেন। কারণ দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মারাঠারা শিবাজীর নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে ঔরঙ্গজেব শিবাজীকে দমন করতে পারেননি। পরে তিনি মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীকে দমন করার জন্য দাক্ষিণাত্যে পাঠালে শিবাজী তাঁকে অতর্কিতে আক্রমণ করে পরাজিত করেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সেনাপতি দিলীরখাঁ পুরন্দরদুর্গ অবরোধ করলে শিবাজী মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। মুঘলদের আমন্ত্রণে শিবাজী আগ্রায় এলে ঔরঙ্গজেব কৌশলে তাঁকে বন্দী করেন। কোনওক্রমে শিবাজী পালিয়ে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন ও পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শম্ভুজী মারাঠাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

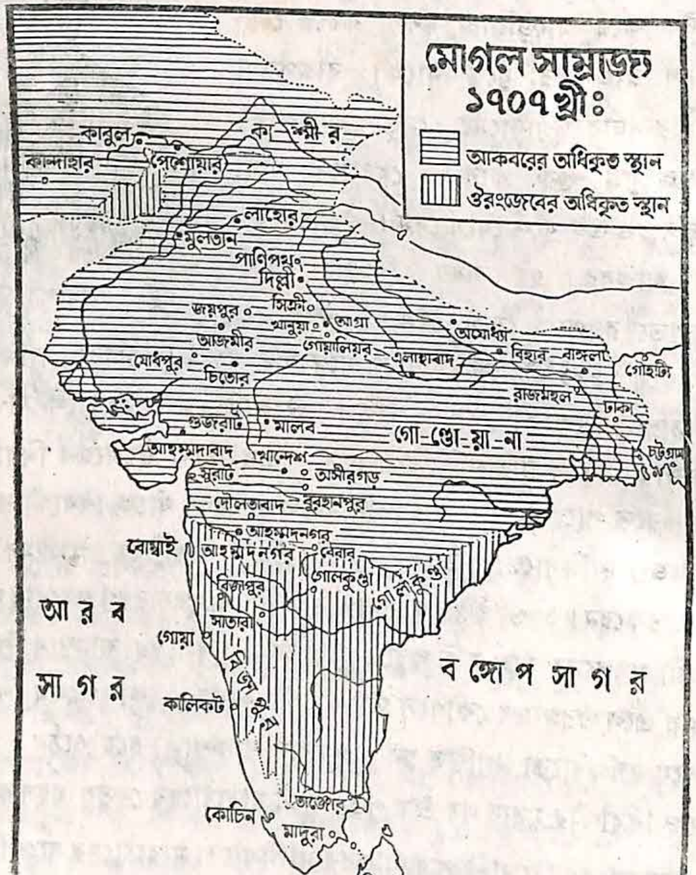


ঔরঙ্গজেব

ঔরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবর দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে মিলিত হলে তিনি চিন্তিত হয়ে ওঠেন। তিনি ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে নিজে দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হলেন। মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭ খ্রীঃ) তিনি দাক্ষিণাত্যেই ছিলেন। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিজাপুর ও ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গোলকুণ্ডা দখল করেন। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে বন্দী করে হত্যা করেন। শম্ভুজীর পুত্র শাহুকে তিনি মুঘল পরিবারে আটক করে রাখেন। কিন্তু

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু যুদ্ধ করেও মারাঠাদের দমন করতে তিনি পারলেন না। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

মুঘল যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনঃ মুঘল যুগে সমাজ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। এই ব্যবস্থায় সম্রাট ছিলেন সব থেকে ওপরে। তাঁর নীচে ছিল অভিজাতসম্প্রদায়। অভিজাতরা বিলাসে জীবনযাপন করতেন। এদের দোকানদার, মহাজন,



চিকিৎসক প্রভৃতি ছিলেন মধ্যবিত্তশ্রেণীভুক্ত। সর্বনিম্নে ছিল সাধারণ মানুষ। তাদের পরার কাপড়, জুতো ও গরম জামা প্রায়ই জুটত না। তারা মাটির কুটিরে বাস করত। সতীদাহ-প্রথা ও বাল্যবিবাহ এবং

বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত। বিবাহে যৌতুক নেওয়া হত। সাধারণভাবে সমাজে রক্ষণশীল ভাব ছিল। পর্দা-প্রথা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই প্রচলিত ছিল।

ভারতবর্ষ খুবই সম্পদ্‌শালী দেশ ছিল। তখন আগ্রা, ফতেপুর, দিল্লী লাহোর, বুর্‌হানপুর ইত্যাদি বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল। সম্রাটরা কৃষি ও শিল্পে উৎসাহ দিতেন। ভূমি-রাজস্ব ছিল প্রধান আয়। কৃষিই ছিল সাধারণ মানুষের প্রধান জীবিকা। ধান, গম, যব, তুলা, ইক্ষু ছিল প্রধান কৃষিজাত পণ্য। এখনকার মত হাল-লাঙ্গল-বলদ দিয়েই কৃষিকাজ করা হত। শিল্প বলতে কুটির-শিল্পকে বোঝাত। সুতোর কাপড় তৈরি করা ছিল বড় শিল্প। রেশম দিয়ে কাপড় বোনা, সোরা, খেলনা, গহনা তৈরি করা ছিল অন্যান্য শিল্প। বিদেশী বণিকরা ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর পণ্যদ্রব্য কিনতেন। বাইরের দেশ থেকে চিনেমাটির জিনিস, গহনা, রূপো, হীরে, জহরত, গন্ধদ্রব্য ও অশ্ব আমদানি করা হত।

কয়েকজন বিদেশী পর্যটক ঃ মুঘল রাজত্বে বহু বিদেশী পর্যটক ভারত-পরিভ্রমণে আসেন। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন ধর্মযাজক, কেউ বা রাষ্ট্রদূত। অন্যান্যরা ছিলেন ব্যবসায়ী ও পর্যটক। র‍্যাল্‌ফ ফিচ্ নামে একজন ইংরেজ পর্যটক আকবরের সময়ে ভারতে আসেন। তিনি ভারতের শহরগুলির বর্ণনা দেন। ধর্মযাজক মন্‌সারেট ও জেরোম জেভিয়ারের বর্ণনায় আকবরের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারা যায়। জাহাঙ্গীরের সময় আসেন হকিন্স ও স্যার টমাস রো। তাঁরা সরকারের কুশাসনের বিবরণ দেন। টমাস রো মুঘল রাজসভার বৈভবের বর্ণনা দিয়েছেন। ফ্রান্সিস্‌কো পেল্‌সার্ট নামে ডাচ কর্মচারী সমাজের নিম্নশ্রেণীর বিবরণ দিয়েছেন। সবথেকে উল্লেখযোগ্য বিদেশী পর্যটক ছিলেন চিকিৎসক



স্যার টমাস রো

বার্নিয়ার। তিনি শাহজাহানের রাজত্বের শেষদিকে ভারতে আসেন এবং মুঘল শাসন-ব্যবস্থার ভেতরের চিত্র তুলে ধরেন।

(৩) **মুঘল সাম্রাজ্যের পতন (১৭০৭–১৭৫৭ খ্রীঃ) :** ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘল বংশের পতন শুরু হয়ে যায়। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত্র মুয়াজ্জম, আজম ও কামবক্সের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই শুরু হল। অভিজাতরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমে আজম ও পরে কামবক্সকে পরাজিত ও নিহত করে মুয়াজ্জম 'বাহাদুর শাহ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর পুনরায় রাজপুত্র জাহান্দার শাহ, আজিম-উস্-সান, জাহান শাহ ও রফিক-উস্-সানের মধ্যে সিংহাসনের লড়াই শুরু হয়। জাহান্দার শাহ অপর তিনজনকে নিহত করে সিংহাসনে বসেন (১৭১৩ খ্রীঃ)। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফারুক্‌শিয়ার সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় হুসেন আলি ও আবদুল্লার সাহায্য নিয়ে জাহান্দার শাহকে বন্দী ও হত্যা করে সিংহাসনে বসলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করলে ফারুক্‌শিয়ার নিহত হন (১৭১৯ খ্রীঃ)। পর পর দু'জন দুর্বল শাসকের পর মুহম্মদ শাহ সিংহাসনে বসেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিজাম-উল্-মুলকের সাহায্যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে নিহত করেন। বিলাসে মগ্ন থাকায় তাঁর সময়ে দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা, বাংলা প্রভৃতি সুবা হস্তচ্যুত হয়। অবশেষে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ মুঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করে চরম আঘাত দেন (১৭৩৯ খ্রীঃ)। এরপর সম্রাট হন আহম্মদ শাহ। কয়েক বছর পর উজির গাজিউদ্দিন তাঁকে হত্যা করিয়ে আজিজউদ্দিনকে সিংহাসনে বসান। তিনি 'দ্বিতীয় আলমগীর' উপাধি নেন। তাঁর রাজত্বকালেই ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এইভাবে মুঘল রাজবংশের পতন হয়।

(খ) ইউরোপীয় বণিকদের আগমন (Coming of the European Traders) :

বহু শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। মধ্যযুগে এই বাণিজ্য মূলত আরব বণিকদের হাতে চলে যায়। ১৪৫৩

খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা কন্‌স্টান্টিনোপল দখল করলে ইউরোপের সঙ্গে ব্যবসার পথ বন্ধ হয়ে গেল। ইউরোপের দেশগুলি ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্যের বিকল্প পথ আবিষ্কারে আগ্রহী হয়ে উঠল।

পর্তুগাল ও স্পেন প্রথমে এই পথ আবিষ্কারে অগ্রসর হয়। ঐ দুটি দেশের সরকার নাবিকদের উৎসাহ দেন, ফলে ভৌগোলিক আবিষ্কারের এক বিরাট যুগের সূচনা হয়। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে মালাবার উপকূলে কালিকট নামক স্থানে উপস্থিত হন। স্থানীয় শাসক জামোরিন-এর কাছে অভ্যর্থনা পেয়েও তিনি বুঝেছিলেন মালাবারের বণিকদের মনোভাব অনুকূল নয়। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পর্তুগীজ নাবিক পেড্রো আল্‌ভারেজ কেব্রাল এসে কোচিনের হিন্দু রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন এবং কোচিন ও ক্যান্‌নোরে আশ্রয় পান। ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা পুনরায় এসে জামোরিনকে দলে টানার চেষ্টা করেন। কোচিন ও ক্যান্‌নোরে পর্তুগীজ বসতি গড়ে ওঠে। ১৫০৯ খ্রীষ্টাব্দে আলবুকার্ক ভারতে পর্তুগীজ গভর্নর হয়ে আসেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়াবার জন্য তিনি ক্রমাগত যুদ্ধ করে ভারতবর্ষের গোয়া (১৫১০ খ্রীঃ) মালয় উপদ্বীপের কাছে মালাক্কা ও পারস্য উপসাগরে ওরমুজ অধিকার করে পর্তুগীজদের শক্তিশালী করেন। পর্তুগীজরা তাদের আধিপত্য বেশীদিন বজায় রাখতে সক্ষম হয়নি। বিজয়নগরের পতন, মারাঠাদের উত্থান ও ইংরেজদের আগমনে তারা দুর্বল হয়ে যায়। একে একে সব হারিয়ে তারা গোয়া, দমন ও দিউয়ে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ওলন্দাজরাও ভারতে বাণিজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারা মালয় উপসাগর ও ইন্দোনেশিয়া থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করল। মাদ্রাজে নেগাপত্তম্ ও বাংলায় চুঁচড়া ভারতবর্ষে তাদের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। পরবর্তী কালে তাদের ভারতে এই বাণিজ্য-অধিকার ইংরেজরা দখল করে নেয়।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ বণিকরা ভারতে লাভজনক পর্তুগীজ ব্যবসার দিকে দৃষ্টি দেয়। ৩১শে ডিসেম্বর, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রানী এলিজাবেথের সম্মতি নিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে এক ব্যবসায়ী-সংগঠন গঠিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে সুরাটে

বাণিজ্য-কুঠি প্রতিষ্ঠা করল। মোগল সাম্রাজ্যে ব্যবসার সুবিধা আদায় করার জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে হকিন্স ও স্যার টমাস রো-কে দূত হিসেবে পাঠানো হয়। নানাবিধ সুবিধা পাওয়ায় ইংরেজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। ওলন্দাজদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ শুরু হয়। ওলন্দাজ কোম্পানীর সঙ্গে ১৬৫৪ থেকে ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিরোধ চলে। ইংরেজরা ইন্দোনেশিয়ার ওপর সব দাবি ত্যাগ করলে ওলন্দাজরা ভারতে ব্যবসার দাবি ত্যাগ করল। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজরা সুরাট, বরোচ, আমেদাবাদ, আগ্রা ও মসলিপত্তমে কুঠি স্থাপন করে। ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তারা উড়িষ্যায় কুঠি স্থাপন করে। ক্রমে তারা পাটনা, বালেশ্বর, ঢাকা ও বাংলায় ব্যবসার প্রসার ঘটায়। ইংরেজরা ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় শাসকের কাছ থেকে মাদ্রাজ কিনে নেয়। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় চার্লস কোম্পানীর কাছে বোম্বাই বিক্রি করে দেন। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক কলকাতা শহরের পত্তন করেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা সম্রাট ফারুক্‌শিয়ারের কাছ থেকে বছরে তিন হাজার টাকা দিয়ে বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অধিকার আদায় করে।

ক্রমে ফরাসীরাও ভারতে ব্যবসার জন্য উপস্থিত হল। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। সুরাট, মসলিপত্তম্, চন্দননগর, মাহে, কারিকল, পণ্ডিচেরী ও ইয়ানানে ফরাসীরা কুঠি স্থাপন করে। পণ্ডিচেরী ছিল তাদের প্রধান কেন্দ্র। এই কোম্পানী কিছুদিন পরে ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়।

ইংরেজরা সহজেই পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের পরাজিত করতে সক্ষম হলেও ফরাসীদের বিরুদ্ধে তাদের ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইংরেজ ও ফরাসীদের প্রভাববিস্তারের অনুকূল ছিল। ইউরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধের সূত্রে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কর্ণাটক অঞ্চলে পরপর তিনটি যুদ্ধের শেষে ফরাসীরা পরাজিত হয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিতে ফরাসীরা কেবলমাত্র পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল, ইয়ানান ও চন্দননগরের অধিকার পায় ও তারা শুধুমাত্র

এইসব স্থান থেকে বাণিজ্য করার ক্ষমতা পেল। ভারতবর্ষে ইংরেজদের প্রাধান্য স্থাপনের আর কোনও বাধা থাকল না।

(গ) মারাঠা শক্তির উত্থান ও বিস্তার

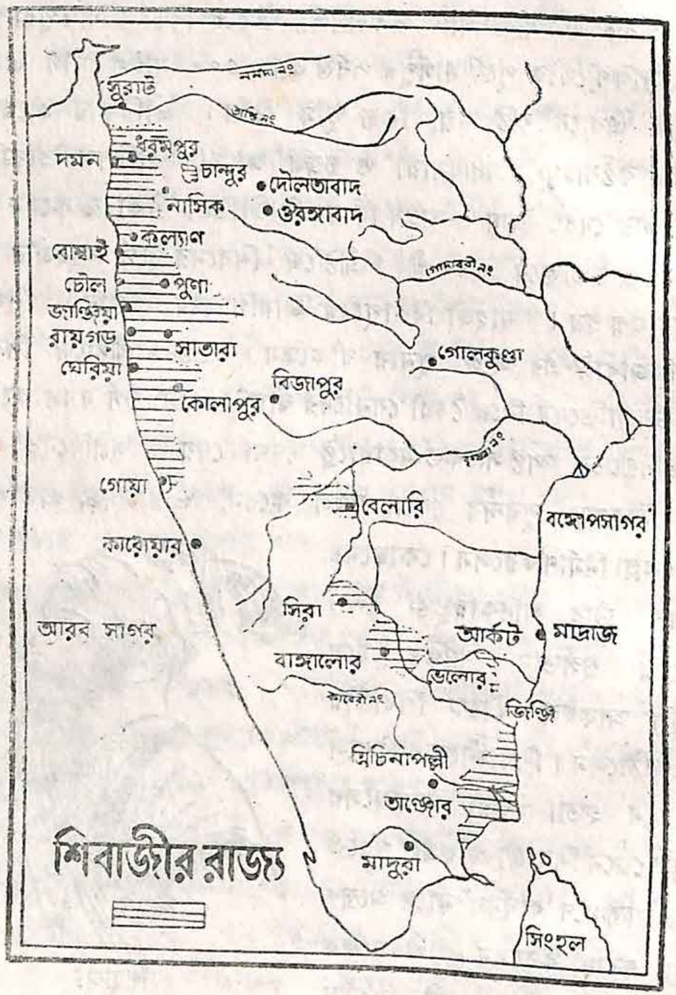
ভারতের ইতিহাসে মারাঠাদের উত্থান এক চমকপ্রদ ঘটনা। পশ্চিমে সহ্যাদ্রি পর্বত ও পশ্চিমঘাট পর্বতাবলী, উত্তরে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত, সুরাটের দক্ষিণ থেকে পূর্বে নাগপুর পর্যন্ত প্রায় ৫০০ মাইল দীর্ঘ এলাকা মহারাষ্ট্র। এখানে বৃষ্টি অল্প, কিন্তু ভূমি উর্বর। জীবিকার প্রয়োজনে মারাঠারা কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী ও দুর্জয় জাতিতে পরিণত হয়েছিল। শিবাজী তাঁর মেধা, উদ্যম ও সাহস দিয়ে এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

১৬২৭ (মতান্তরে ১৬৩০ খ্রীঃ) খ্রীষ্টাব্দে শিবনের দুর্গে শাহজীর পুত্র শিবাজীর জন্ম হয়। শাহজী বিজাপুরের জায়গিরদার ছিলেন। শিবাজী মাতা জিজাবাঈ-এর সঙ্গে পুনায় থাকতেন। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী মাওলী উপজাতিদের নিয়ে তৈরী সেনাদের দ্বারা তোরনা দুর্গ দখল করেন। তখনই ভবিষ্যতের স্পষ্ট সংকেত মহারাষ্ট্রে দেখা দেয়। অল্পদিনের মধ্যে শিবাজী সিংহগড়, পুরন্দর কেল্লা দখল করেন, ও রাজগড়, প্রতাপগড়, রায়গড় কেল্লা নির্মাণ করলেন। কোঙ্কনের উত্তরাংশও তাঁর অধিকারভুক্ত হল। বিজাপুরের সুলতান শঙ্কিত হয়ে সেনাপপি আফজল খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠালেন। শিবাজীকে কৌশলে ডেকে এনে হত্যা করা আফজলের পরিকল্পনা জেনে শিবাজী আফজল খাঁকে অতর্কিত আক্রমণে 'বাঘনখ' নামে অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করলেন। ঔরঙ্গজেব মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠালে শিবাজী অতর্কিতে পুনা আক্রমণ করে শায়েস্তা খাঁকে পরাজিত করেন ১৬৬৩ খ্রীঃ)। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করেন। ঔরঙ্গজেব রাজপুতবীর জয়সিংহ ও সেনাপতি দিলীর খাঁকে মারাঠাদের



শিবাজী

দমনের জন্য পাঠালেন। জয়ের সম্ভাবনা না দেখে শিবাজী মুঘলদের সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি করেন (১৬৬৫ খ্রীঃ)। সন্ধির শর্তানুযায়ী ২৩টি দুর্গ মুঘলদের কাছে ছেড়ে দিয়ে ১২টি দুর্গ নিজের অধিকারে রাখলেন। জয়সিংহের আমন্ত্রণে তিনি আগ্রায় আসেন। ঔরঙ্গজেবের ব্যবহারে তিনি অপমানিত



ও ক্রুদ্ধ হন। সম্রাট তাঁকে বন্দী করলে কৌশলে মুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় নিজরাজ্যে উপস্থিত হন। ফিরে এসে শিবাজী একে একে পুরানো দুর্গ মুঘলদের কাছ থেকে দখল করে নিতে থাকেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড়

দুর্গে শিবাজীর অভিষেক হয়। তিনি 'ছত্রপতি' ও 'গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক' উপাধি গ্রহণ করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে বীর শিবাজীর মৃত্যু হয়।

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শম্ভুজী রাজা হন। শম্ভুজীর সাহসের অভাব না থাকলেও চরিত্রবল ছিল না। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সংগ্রামেশ্বরে তিনি সপরিবারে ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হন; বন্দী অবস্থায় মুঘলদের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হন। তাঁর শিশুপুত্র শাহু মুঘলদের হাতে বন্দী হয়ে মুঘল শিবিরে বড় হতে থাকেন। শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভাই রাজারাম শাসনভার গ্রহণ করে মুঘলদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যান। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রী তারাবাঈ তাঁর শিশুপুত্রকে 'তৃতীয় শিবাজী' নাম দিয়ে সিংহাসনে বসান। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মুঘলরা শম্ভুজীর পুত্র শাহুকে মুক্তি দিয়ে মারাঠাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু করে দেয়। তারাবাঈ ও শাহু দু'জনেই সিংহাসন দাবি করলেন। অবশেষে বালাজী বিশ্বনাথের চেষ্টায় শাহু বিজয়ী হন। তারাবাঈ-এর মৃত্যুর পর রাজারামের অপর পত্নী রাজসবাঈ তাঁর পুত্রকে 'দ্বিতীয় শম্ভুজী' নাম দিয়ে কোলপুরে রাজত্ব করতে থাকেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে শাহু ও দ্বিতীয় শিবাজীর মধ্যে বার্নারের সন্ধিতে সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

পেশোয়া শাসন: বালাজী বিশ্বনাথ শাহু পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। বালাজী বিশ্বনাথ কোঙ্কনের চিৎপাবন গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ। পেশোয়া-পদ পেয়ে বালাজী সব ক্ষমতা তাঁর হাতে নিয়ে নেন। পেশোয়াই হলেন মূল রাষ্ট্র-চালক। বালাজী বিশ্বনাথ নিজের কর্মনৈপুণ্যে ও বিচক্ষণতায় মহারাষ্ট্রের মারাঠা-শক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটান। তাঁর চেষ্টায় ও বিচক্ষণতায় মহারাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে। বিদ্রোহী মারাঠা দলপতিরা দমিত হন।

বালাজী বিশ্বনাথের পর পেশোয়া হন তাঁর পুত্র বাজীরাও। এই সময় থেকে পেশোয়া-পদ বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। বাজীরাও এক হিন্দু-পাদ-পাদ্‌শাহী—এক অখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা পোষণ করতেন। তিনি মালব ও গুজরাট দখলের পর ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সসৈন্যে দিল্লীর কাছে উপস্থিত হন। সম্রাট মুহম্মদ শাহ নিজাম-উল্‌ মুল্‌কের সাহায্যে চাইলে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও নিজামকে পরাজিত করে নর্মদা ও চম্বলের মধ্যবর্তী

অঞ্চল ও ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। বাজীরাও পর্তুগীজদের কাছ থেকে সলসেট ও বেসিন অধিকার করেন। নাদির শাহের ভারত আক্রমণের খবর পেয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমান যৌথ প্রতিরোধের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু তার আগেই ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

এরপর পেশোয়া হন বাজীরাও-এর পুত্র বালাজী বাজীরাও। শাহু মৃত্যুর সময়ে পেশোয়াদের সব অধিকার দিয়ে যান (১৭৪৯ খ্রীঃ)। তাঁর সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তার লাভ করে। বাংলার নবাব আলীবর্দী "চৌথ" দিতে ও উড়িষ্যার কিছু অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। নিজাম উদ্‌গীরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ঔরঙ্গাবাদ, বিজাপুর, দৌলতাবাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। গঙ্গা-যমুনা দোয়াব মারাঠা অধিকারভুক্ত হল। বালাজীর ভাই রঘুনাথ রাও পাঞ্জাব থেকে আফগান অধিপতি আহম্মদ শাহ আবদালীর পুত্র তৈমুরকে বিতাড়িত করলে আবদালী প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হন। আফগানদের বাধা দেওয়ার জন্য সদাশিব রাও-এর নেতৃত্বে বিরাট সৈন্যদল অগ্রসর হল। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয় (১৭৬১ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের শক্তি ও সম্মান যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন বিফল হয়। সেই সুযোগে ইংরেজরা ভারতে রাজত্ব স্থাপন করে।

(ঘ) শিখ শক্তির উত্থান

শিখদের আদিগুরু নানক সব ধর্মের মহত্ত্ব ও ঐক্যের কথা প্রচার করেছিলেন। রাজশক্তির সঙ্গে বিরোধের কথা তিনি কখনও চিন্তা করেননি। চতুর্থ গুরু রামদাসকে আকবর ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। আকবর অমৃতসরে সরোবর সমেত একখণ্ড জমি রামদাসকে দান করেন। সেইখানেই পরে শিখদের প্রধান মন্দির তৈরি হয়। পঞ্চম গুরু অর্জুন শিখ সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তিনি পূর্বগামী গুরুদের বাণী ও উপদেশাবলী সম্পাদিত করে শিখধর্মের "আদিগ্রন্থ" সংকলিত করেন। গুরুর মর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। পিতা গুরু হলে পুত্র সেই পদের উত্তরাধিকারী হবে বলে স্থির হয়। সম্প্রদায়ভুক্ত সকলের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। শিখরা ক্রমশ সুসংহত সংস্থায় পরিণত হয় ও

রাজনীতির সঙ্গেও সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জাহাঙ্গীরের সময়ে বিদ্রোহী খসরুকে সাহায্য করায় গুরু অর্জুনের প্রাণদণ্ড হয়। মুঘলদের বিরুদ্ধে শিখ-বিদ্বেষের বীজ তখনই বপন করা হয়েছিল।

অর্জুনের পুত্র হরগোবিন্দ জাহাঙ্গীরের আদেশে বারো বছর গোয়ালিয়র-দুর্গে বন্দী ছিলেন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শাহজাহানের আমলে বিদ্রোহ করলে পরাজিত হয়ে কাশ্মীর পর্বতে কিরাতপুরে আশ্রয় নেন ও সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। নবম গুরু ছিলেন তেগ বাহাদুর। তিনি রাজা রামসিং-এর বাহিনীতে যোগ দিয়ে ঔরঙ্গজেবের হয়ে আসামে যুদ্ধে যান। ফেরার পথে পাটনায় তাঁর বিখ্যাত পুত্র গুরু গোবিন্দের জন্ম হয়। ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ করলে তাঁকে বন্দী করা হয়। ইসলাম ধর্ম ও মৃত্যু এই দু'টির একটি গ্রহণের আদেশ দিলে তিনি দ্বিতীয়টি গ্রহণ করেন। তিনি রানা প্রতাপের মত পুত্রকে প্রতিহিংসার প্রতিশ্রুতি নিতে পরামর্শ দেন। গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে মুঘলদের সঙ্গে অসম অভিযান শুরু হয়। শিখদের তিনি 'খালসা' বা সামরিক ভ্রাতৃত্বে রূপান্তরিত করেন। তারা প্রতিজ্ঞা করে কেশ, কংহ (চিরুনি), কৃপাণ, কচ্ছ (ছোট ইজের) ও কর (লোহার বালা) এই পাঁচটি 'ক' সর্বদা দেহে রাখবে। মুঘলরা তাঁর দুই পুত্রকে ধরে নৃশংসভাবে হত্যা করে। ঔরঙ্গজেব গুরুগোবিন্দকে দমন করতে পারেননি। বাহাদুর শাহের আহ্বানে তিনি দাক্ষিণাত্যে গেলে একজন আফগান তাঁকে হত্যা করে।

গুরুগোবিন্দ কোনও উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেননি। অন্যতম শিষ্য বান্দাকে তিনি খালসার নেতৃত্ব দিয়ে যান। বান্দা শতদ্রু থেকে যমুনা দখল করলে বাহাদুর শাহ তাঁকে পর্বত অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেন। ফারুকশিয়ারের আমলে তাঁকে বন্দী করে হত্যা করা হয়। কিছু দিনের জন্য শিখ-শক্তি অবদমিত হলেও নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময়ে তারা পাঞ্জাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আহম্মদ শাহ আবদালী শিখদের পরাজিত করলেও দমন করতে পারলেন না।

প্রশ্নাবলী

১। বাবর কিভাবে ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

২। শের শাহ কিভাবে আফগান ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন?

৩। আকবরের রাজ্য-বিস্তারের বর্ণনা দাও।

৪। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের আমলে যুদ্ধগুলির বিবরণ দাও।

৫। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে রাজপুত ও মারাঠাদের যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

৬। মুঘলযুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কি রকম ছিল ?

৭। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে কিভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয় ?

৮। ভারতে ইউরোপীয় বণিকদের আগমনের বিবরণ দাও।

৯। শিবাজীর অধীনে মারাঠা-শক্তির উত্থানের ইতিহাস বর্ণনা কর।

১০। পেশোয়াদের অধীনে মারাঠা-শক্তি শক্তিশালী হওয়ার ইতিহাস বর্ণনা কর।

১১। শিখ-শক্তির উত্থান সম্পর্কে যা জান লেখ।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার (Foundation and Growth of the British Power in india till 1857)

৭

(১) প্রথম স্তর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

বাংলাদেশে ইংরেজ প্রতিপত্তি বিস্তার : কর্ণাটকে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে ইংরেজদের জয়লাভে ভারতে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া কর্ণাটকের মত বাংলাদেশেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে।

নবাব আলিবর্দীর বিদেশী বণিকদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সন্দেহ ও শঙ্কা থাকলেও তিনি তাদের বিরোধিতা করেননি। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার-যুদ্ধের প্রতিফলন তিনি তাঁর এলাকায় হতে দেননি।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা বাংলার নবাব হন। সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের বিরোধ বাধে। ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হলে বাংলায় বিদেশী বণিকেরা পরিখা-খনন, দুর্গ-নির্মাণ ইত্যাদি আরম্ভ করে। সিরাজ এই সমস্ত কাজ বন্ধের আদেশ দিলে ফরাসীরা তাঁর আদেশ মান্য করলেও ইংরেজরা তা করল না। ইংরেজরা নবাবের দূতকে অপমান করে বিদায় দিল। সিরাজ রেগে গিয়ে পূর্ণিয়া অভিযান স্থগিত রেখে ১৭ই জুন ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় উপস্থিত হলেন। ২০শে জুন কলকাতা দখল সম্পূর্ণ হয়।



সিরাজদ্দৌলা

ইংরেজরা তাদের পরাজয়কে চূড়ান্ত বলে মনে করেনি। তাদের পরাজয়ের খবর মাদ্রাজে পৌঁছলে সেখান থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন একদল স্থল ও নৌ-বাহিনী নিয়ে এসে কলকাতা পুনরুদ্ধার করলেন। সিরাজ কলকাতায় এসে ইংরেজদের সঙ্গে "আলিনগরের সন্ধি" নামে সন্ধি করেন। আলি-

নগরের সন্ধির পর সম্পর্ক ভালো হল না। ক্লাইভ সিরাজের নিষেধ অগ্রাহ্য করে চন্দননগর দখল করেন। ইতিমধ্যে মীরজাফর, ইয়ার লতিফ খাঁ, জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভ সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। উমিচাঁদ নামে এক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে ক্লাইভের যোগাযোগ হল। ষড়যন্ত্র পাকা হওয়ার পর ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করলেন। সিরাজও খবর পেয়ে সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। মুর্শিদাবাদ থেকে তেইশ মাইল দূরে পলাশীর আমবাগানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ হয় (২৩শে



রবার্ট ক্লাইভ

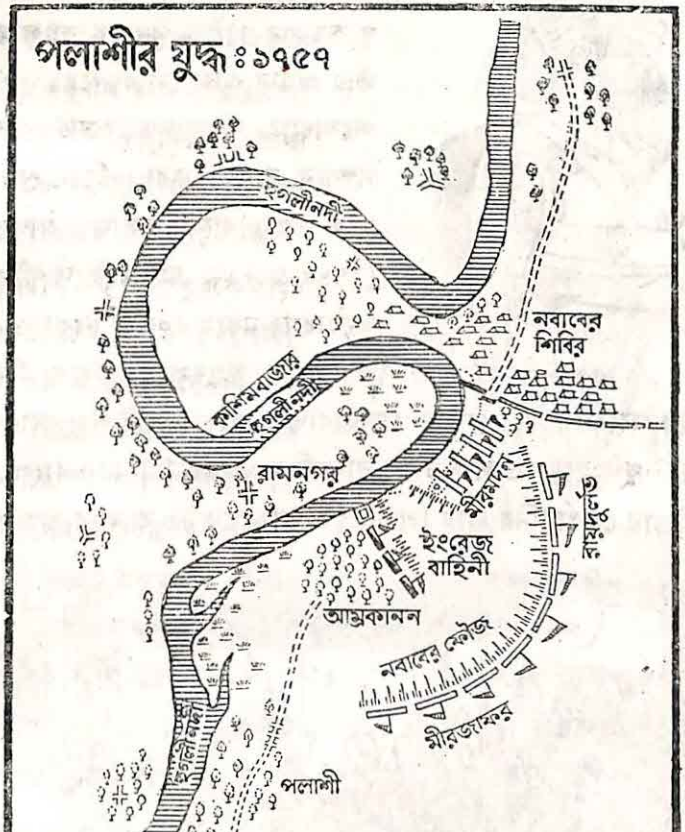


মীরজাফর

জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। মীরজাফর ও রায়দুর্লভ পূর্বশর্ত অনুযায়ী নিষ্ক্রিয় রইলেন। পরাজিত হয়ে সিরাজ পালিয়ে মুর্শিদাবাদে আসেন। ক্লাইভ ও মীরজাফর মুর্শিদাবাদের দিকে আসছেন শুনে সিরাজ পালিয়ে যান। পথে তিনি ধরা পড়েন ও মীরজাফরের পুত্র মিরনের আদেশে মহম্মদী বেগ কর্তৃক নিহত হন।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর ক্লাইভের সাহায্যে বাংলার মসনদে বসলেন। ক্লাইভ ২,৩৪,০০০ পাউণ্ড পুরস্কার পেলেন। ২৪ পরগনার জমিদারি কোম্পানীর হাতে গেল, প্রতিটি ইংরেজ আশাতীত পুরস্কার পেলেন। ইংরেজদের আরও দাবি মেটাতে না পারায় ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা মীরজাফরকে পদচ্যুত করে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে নবাব করেন।

মীরকাশিম ইংরেজদের বাকি পাওনা মিটিয়ে দেন এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেন। তিনি মোটামুটি দূরদর্শী ছিলেন। ইংরেজদের থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি তাঁর রাজধানী

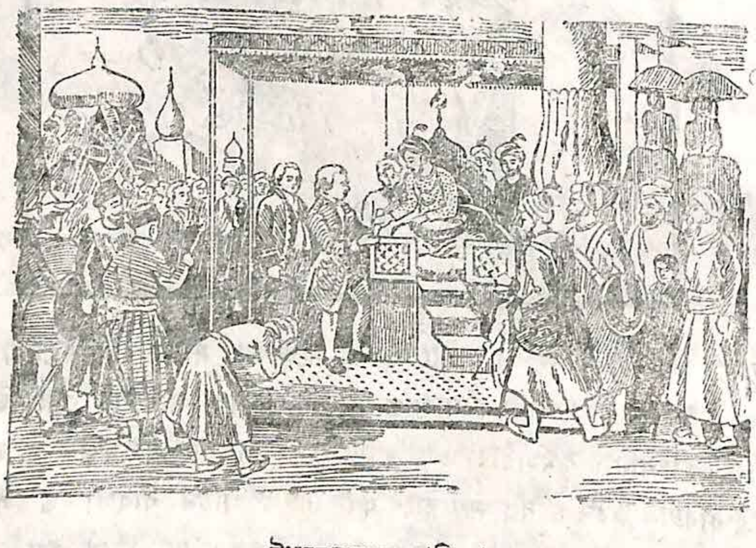


মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধতে দেরী হল না। ইংরেজ কোম্পানী বিনাশুল্কে ব্যবসা করার অধিকার পেয়েছিল। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের নিজেদের ব্যবসায় এই দস্তক বা ছাড়পত্র ব্যবহার করত। বহু অনুরোধে যখন এই বেআইনী ব্যবস্থা বন্ধ হল না, তখন মীরকাশিম সমস্ত রকম শুল্কই তুলে দিলেন। এই নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে প্রকাশ্যে যুদ্ধ শুরু হল। কাটোয়া, মুর্শিদাবাদ, গিরিয়া, উদয়নালা ও মুঙ্গেরের যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি অযোধ্যায়

আশ্রয় নিয়ে নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সাহায্যে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের কাছে পরাজিত হল। মীরজফরকে পুনরায় বাংলার মসনদে বসানো হল। বক্সারের যুদ্ধের পর ক্লাইভ পুনরায় বাংলায় আসেন। তাঁর প্রধান কাজ হল বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত অযোধ্যার নবাব ও সম্রাট শাহ আলম সম্পর্কে ব্যবস্থা করা। তিনি সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে এলাহাবাদের সন্ধি স্বাক্ষর করলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। এই সন্ধিতে ঠিক হল যে, অযোধ্যার নবাব ৫০লক্ষ টাকা ও এলাহাবাদ ও কারা ইংরেজদের দিয়ে নিজের রাজ্য ফিরে পাবেন। পরে ক্লাইভ এলাহাবাদ ও কারা সম্রাট শাহ আলমকে দিলে সম্রাট খুশী হয়ে ২৬ লক্ষ টাকা বাৎসরিক করের বিনিময়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানির ভার দিলেন কোম্পানীকে। বাংলার রাজস্ব আদায়ের



মীরকাশিম



ইংরেজদের দেওয়ানি লাভ

আইনগত অধিকার পেল ইংরেজরা; নবাব হলেন নগণ্য। বাদশাহের ফরমান পেয়ে কোম্পানীর শক্তি ও প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পেল।

মারাঠা ও মহীশূরের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক : ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। এতদিন মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজদের কোনও সংঘর্ষ হয়নি। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। কিন্তু তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হলে রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা পেশোয়া হন। কিছুদিনের মধ্যে নারায়ণ রাও-এরপুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলে স্বনামধন্য মারাঠা কূটনীতিবিদ্ নানা ফড়নবীশ এই শিশুপুত্রকে মাধব রাও নারায়ণ নাম দিয়ে পেশোয়া-পদে অধিষ্ঠিত করেন। রঘুনাথ রাও বোম্বাই গিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে সুরাটের সন্ধি করেন। স্থির হয় যে, সলসেট, বেসিন ও সুরাটের আংশিক রাজস্বের বিনিময়ে ইংরেজরা রঘুনাথ রাওকে সাহায্য করবে। সম্মিলিত বাহিনী জয়লাভ করল। কলকাতা কাউন্সিল এই সন্ধি অনুমোদন না করে পেশোয়ার সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি করল। কোম্পানীর ডাইরেক্টাররা সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। মহাদাজী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে সলবই-এর সন্ধিতে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শেষ হয়। ইংরেজরা মাধব রাও নারায়ণকে পেশোয়া বলে স্বীকৃতি দিল, রঘুনাথ রাওকে ভাতা দেওয়া হল ও ইংরেজরা সলসেট ও বেসিন লাভ করল।


নানা ফড়নবীশ

হায়দার আলী সামান্য সৈনিক থেকে মহীশূরের শাসকে উন্নীত হন। তিনি মহীশূরকে শক্তিশালী করলে মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজরা ঈর্ষান্বিত হয়। এই তিন শক্তি একত্রিত হয়ে হায়দারকে আক্রমণ করলে হায়দার একে একে মারাঠা ও নিজামকে নিজের দলে টেনে নেন। এরপর তিনি সসৈন্যে মাদ্রাজের কাছে উপস্থিত হলে ইংরেজরা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে (১৭৬৯ খ্রীঃ)। পরস্পরের দখলকরা জায়গা ফিরিয়ে দেওয়া হল ও

তৃতীয় কেউ আক্রমণ করলে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে বলে স্থির হল। কিন্তু ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা হায়দারকে আক্রমণ করলে ইংরেজরা তাঁকে সাহায্য করল না। ইংরেজদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার মারাঠা ও নিজামকে নিয়ে এক মৈত্রী সৃষ্টি করলেন। ইংরেজরা মাহে দখল করলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন (১৭৮০ খ্রীঃ)। এটাই ইতিহাসে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। ইংরেজরা কূটকৌশলে মারাঠাদের ও নিজামকে হায়দারের পক্ষ ত্যাগ করাল। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৭৮২ খ্রীঃ হায়দার মারা গেলেন। হায়দারের পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে 'ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি' করে (১৭৮৪ খ্রীঃ) যুদ্ধের অবসান ঘটালেন।



হায়দার আলী

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস একই সঙ্গে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সেনাপতি হয়ে এলেন। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি টিপু ও ইংরেজদের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র। উভয় পক্ষই শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। টিপু ইংরেজদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ করলে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়। টিপু তাঁর রাজধানীতে অবরুদ্ধ হলে সন্ধি প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। শ্রীরঙ্গপত্তম-এর সন্ধিতে টিপুকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ সহ অর্ধেক রাজ্য ছেড়ে দিতে হল।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারতে ইংরেজদের গভর্নর জেনারেল হয়ে এলেন। তিনি ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। ইংরেজ আধিপত্য সুদৃঢ় করার জন্য তিনি "অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি" নামে এক ব্যবস্থা প্রচলন করলেন। যেসব রাজ্য এই মিত্রতা-নীতি গ্রহণ করবে, তাদের অপর কোনও



টিপু সুলতান

শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার দায়িত্ব কোম্পানী গ্রহণ করবে। মিত্ররাজ্যে কোম্পানীর একদল সৈন্য থাকবে ও তাদের ব্যয়ভার বহনের জন্য মিত্র-দেশ তার রাজ্যের কিছু অংশ কোম্পানীকে ছেড়ে দেবে; ইংরেজদের অনুমতি ভিন্ন মিত্র-রাজ্য অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ-ঘোষণা বা শান্তিস্থাপন করতে পারবে না। নিজাম সর্বপ্রথম এই অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি গ্রহণ করল। টিপু এই নীতি গ্রহণ না করায় পুনরায় টিপুর সঙ্গে চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হল। শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে টিপু প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ইংরেজরা মহীশূর রাজ্যের অধিকাংশই দখল করল, নিজামকেও কিছু অংশ দেওয়া হল। এক ছোট অংশের ওপর মূল হিন্দু রাজবংশের এক বংশধরকে রাজপদে বসানো হল।


লর্ড ওয়েলেস্‌লী

নানা ফড়নবীশ যতদিন পুণার শাসন পরিচালনা করেছেন, ততদিন মারাঠারা ইংরেজদের সঙ্গে খুব কমই যোগাযোগ করেছে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে মহারাষ্ট্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় ও মারাঠা-শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। মারাঠা দলপতি সিন্ধিয়া ও হোলকার পেশোয়াকে তাঁদের অধীনে আনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করলে পেশোয়া পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। ইংরেজরা পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে বেসিনের সন্ধি-গ্রহণে বাধ্য করল। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে এই সন্ধিতে অপমানিত হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। পরাজিত হয়ে ভোঁসলে দেওগাঁও-এর সন্ধি ও সিন্ধিয়া শ্রীঅর্জুনগাঁও-এর সন্ধিতে অধীনতামূলক মিত্রতা-নীতি গ্রহণে বাধ্য হলেন। ইংরেজেরা ভোঁসলের কাছ থেকে কটক ও সিন্ধিয়ার কাছ থেকে যমুনার উত্তর দিকের সব জায়গা দখল করে নেয়। এরপর হোলকার যুদ্ধ শুরু করলেন। এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হওয়ার আগেই ওয়েলেস্‌লী এই দেশ ত্যাগ করেন। তিনি এইরকম এক সঙ্কটময় অবস্থায় এসে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে যান।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ময়রা আর্ল অব্ হেস্টিংস গভর্নর জেনারেল হয়ে এলে ওয়েলেস্‌লীর আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ হয়। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও বেসিনের সন্ধি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। পেশোয়াকে শক্তিহীন করার জন্য তাঁকে হেস্টিংস এক নতুন চুক্তিপত্রে সই করতে বাধ্য করেন। পেশোয়া পুণা থেকে ইংরেজ সৈন্য অপসারণের দাবি জানালেন। ইংরেজদের ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি বিদ্রোহী হয়ে ইংরেজী রেসিডেণ্টের বাড়ী আক্রমণ করলেন। কিন্তু, ব্যর্থ হয়ে তিনি কিরকির ইংরেজ সেনানিবাস আক্রমণ করে পরাজিত হলেন। ইতিমধ্যে নাগপুরের ভোঁসলে ও ইন্দোরের হোলকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু দু'জনেই পরাজিত হন। কোরেগাঁও ও অস্তি'র যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পেশোয়া ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন (১৮১৮ খ্রীঃ)। পুণা ইংরেজদের অধিকারে এল। পেশোয়া পরিবারের কেউ যাতে ইংরেজদের বিরোধিতা করতে না পারে, তার জন্য পেশোয়া-পদ বিলুপ্ত করা হল। দ্বিতীয় বাজীরাওকে বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কানপুরের কাছে বিটুতে রাখা হল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব ও সিন্ধু বাদ দিয়ে প্রায় সমগ্র ভারত ইংরেজদের অধিকারে এল।

(২) পরবর্তী স্তর—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত

লর্ড আমহার্স্ট-এর আমলে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ হয়। বৃটিশ রাজ্য ও ব্রহ্মদেশের সীমা প্রায় এক হয়ে পড়লে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ব্রহ্মদেশের রাজা বোদাপায়া ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতির উপর দাবি জানালেন। বর্মীরা দু'জন ইংরেজকে ধরে নিয়ে গেলে যুদ্ধ শুরু হয়। পরাজিত হয়ে ব্রহ্মরাজ ইয়ান্দাবুর সন্ধিতে (১৮২৬ খ্রীঃ) আরাকান ও টেনাসেরিম ইংরেজদের কাছে ছেড়ে দিলেন।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে কাছাড় সরাসরি ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। মহীশূরের কুর্গ অঞ্চলও ইংরেজদের অধিকারে আসে। নরবলি চলত এই অজুহাতে ইংরেজরা আসামের জয়ন্তিয়া এলাকাও দখল করে নেয়।

রঞ্জিৎ সিং-এর নেতৃত্বে শিখ-শক্তি সাফল্যের শিখরে ওঠে। পিতা মোহন সিং-এর মৃত্যুর পর রঞ্জিৎ বারো বছর বয়সে সুকরচাকিয়া মিশ্‌ল্‌-এর

নেতা হন। শতদ্রু নদীর পশ্চিমতীরের শিখ-মিশ্‌লগুলি তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে নেয়। শতদ্রুর পূর্বতীরের দিকে দৃষ্টি দিলে, সেই অঞ্চলের মিশ্‌লগুলি ইংরেজদের সাহায্য চায়। গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টো বিচক্ষণ চার্লস মেট্‌কাফকে পাঠান আলোচনার জন্য। ১৮০৯ খ্রীঃ স্বাক্ষরিত হল বিখ্যাত 'অমৃতসরের সন্ধি'। এই সন্ধিতে স্থির হল রঞ্জিৎ সিং শতদ্রু নদীর পূর্ব দিকের শিখ মিশ্‌লগুলিতে হস্তক্ষেপ করবেন না।



রঞ্জিৎ সিং

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের আমলে (১৮৩৬-৪২ খ্রীঃ) ইংরেজরা আফগানিস্থানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রাশিয়ার মধ্য এশিয়ায় অগ্রগতি ইংরেজদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। অক্‌ল্যাণ্ড ইংরেজ সরকারের নির্দেশে আফগান আমীর দোস্ত মুহম্মদের বন্ধুত্বের জন্য এক প্রতিনিধিদল পাঠান। দোস্ত মুহম্মদ বন্ধুত্বের বিনিময়ে রঞ্জিৎ সিং-এর কাছ থেকে পেশোয়ার দাবি করেন। এই দাবি পূরণ না হলে দোস্ত মুহম্মদ রাশিয়ার দিকে ঝুঁকলেন। অক্‌ল্যাণ্ড পূর্বতন আমীর শাহ সুজাকে স্বীকৃতি দিয়ে আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। প্রথম দিকে সাফল্য লাভ করলেও আফগানরা শাহ সুজাকে মেনে নিল না ও ইংরেজ বাহিনীকে হত্যা করল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র কয়েকজন সেনা নিয়ে ইংরেজ বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে এল। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল লর্ড এ্যালেন্‌বোরা আফগান যুদ্ধের অবসান ঘটান। এ্যালেন্‌বোরার সময়ে সিন্ধু অঞ্চল ইংরেজরা অধিকার করে।

লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে (১৮৪৪-৪৬ খ্রীঃ) প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ হয়। রঞ্জিৎ সিং-এর মৃত্যুর পর 'খাল্‌সা' বা শিখ সেনাবাহিনী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। নাবালক রাজা দিলীপ সিং ও অভিভাবিকা রানী ঝিন্দন ক্ষমতা-শূন্য হয়ে পড়েন। প্রকৃত ক্ষমতা থাকে লাল সিং ও তেজ সিং নামে দুই সামরিক নেতার হাতে। লাহোর দরবার সামরিক শক্তির হাত থেকে

রক্ষা পাওয়ার জন্য সেনাদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে শিখরা পরাজিত হয়ে লাহোরের সন্ধি করে। দেড় কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ এবং শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল ইংরেজরা আদায় করল। লাহোরে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট রাখার ব্যবস্থা হল।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ যাঁরা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন লর্ড ডালহৌসী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর আমলে (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ হয় এবং স্বত্ববিলোপ-নীতি গৃহীত হয়।



লর্ড ডালহৌসী

শিখরা পরাজয়ের প্রতিশোধের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। রানীমাতা ঝিন্দন রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে কাজ করছেন অভিযোগে তাঁকে চুনার দুর্গে স্থানান্তরিত করা হল। এই অপমানে সারা পাঞ্জাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মুলতানের বিদ্রোহী শাসক মুলরাজের বিরুদ্ধে প্রেরিত শের সিং বিদ্রোহ করলেন। এই অবস্থায় লর্ড ডালহৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। চিলিওয়ানওয়ালার যুদ্ধে পরাজিত হলেও গুজরাটের যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করল। ডালহৌসী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই সমস্ত পাঞ্জাব অধিকার করে নিলেন। দিলীপ সিংকে বাৎসরিক ভাতা দিয়ে ইংলণ্ডে পাঠিয়ে দেওয়া হল ও খালসা বাহিনীকে ভেঙ্গে দেওয়া হল।

এরপর ডালহৌসী ব্রহ্মের দিকে নজর দেন। কয়েকজন ইংরেজ বণিক বর্মীদের হাতে উৎপীড়িত হয়েছেন খবর পেয়ে ডালহৌসী ক্ষতিপূরণ দাবি করেন ও যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে ব্রহ্মদেশ পরাজিত হলেই ডালহৌসী ব্রহ্মদেশকে ইংরেজদের অধিকারভুক্ত বলে ঘোষণা করলেন।

ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত ইংরেজ সাম্রাজ্য গঠনের জন্য ডালহৌসী "স্বত্ব-বিলোপ-নীতি" ঘোষণা করেন। এই নীতিতে বলা হল ইংরেজের অধীনে

বা অনুগ্রহে রক্ষিত কোন দেশীয় রাজার কোনও উত্তরাধিকারী না থাকলে তাঁর রাজত্ব ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হবে। কোনও দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার স্বীকৃত হবে না। স্বত্ববিলোপ-নীতির দ্বারা সাতারা, জৈনপুর, সম্বলপুর, ঝাঁসি, নাগপুর ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ড'লহৌসী অন্তঃসারশূন্য নামমাত্র রাজাকে উপাধি ও ভাতা থেকে বঞ্চিত করেছেন। কর্ণাটক, তাঞ্জোরের উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়। তিনি নিজামের কাছ থেকে কুশাসনের অভিযোগে বেরার কেড়ে নেন। কোম্পানীর অনুমতি নিয়ে ডালহৌসী অযোধ্যা দখল করে নেন। ভারতের কোন অংশই আর ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রইল না। ভারতে ইংরেজ-অধিকৃত মানচিত্র সম্পূর্ণ হল এবং তা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বজায় থাকে।

(৩) সিপাহী-বিদ্রোহ (The Sepoy Mutiny)

রাজনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে ভারতীয়রা ইংরেজ শাসনের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। এই ক্ষোভই শেষ পর্যন্ত সিপাহী-বিদ্রোহে রূপ নেয়।

ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় রাজন্যবর্গ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়। ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ-নীতির ফলে রাজন্য-বর্গের মধ্যে ব্যাপক ত্রাসের সৃষ্টি হয়। দত্তকপুত্র গ্রহণের প্রথাকে অগ্রাহ্য করে সাতারা, নাগপুর, ঝাঁসি, সম্বলপুর অধিকার করা ও নানা অজুহাতে তাঞ্জোর, কর্ণাটক রাজপরিবারের ও পেশোয়া-পুত্রের ভাতা বন্ধ, কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা দখল ও নির্মমভাবে নাগপুর ও অযোধ্যার ধনলুণ্ঠন ইত্যাদি কারণে দেশীয় রাজ্যগুলিতে আতঙ্ক ও অসন্তোষ দেখা দিল। সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী বিদ্বেষ ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে লাগল।

এই মহাবিদ্রোহের পিছনে অর্থনৈতিক কারণও ছিল। ভারত ইংরেজদের শোষণের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। রাজত্ব চলে যাওয়ায় বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে ও জায়গিরে বহু কর্মচারী চাকরি ও জীবিকা হারিয়ে দুরবস্থায় পড়েন। সামরিক কর্মচারীরাও চাকরি হারিয়ে অসন্তুষ্ট শ্রেণীতে পরিণত হয়। ইংরেজদের রাজস্ব-নীতি দেশের দুর্দশাকে আরও শোচনীয়

করে তোলে। বিলাতী শিল্পদ্রব্য এদেশে আমদানীর ফলে দেশের কুটিরশিল্প ক্রমে অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যায় ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়।

ইংরেজদের মধ্যে বিজেতার মনোভাব বিদ্রোহের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজরা এদেশের মানুষকে ঘৃণা করত ও তাদের এড়িয়ে চলত। কর্নওয়ালিশ থেকে ডালহৌসী পর্যন্ত ইংরেজ শাসনে ভারতবাসী সম্পর্কে অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের এদেশের ধর্ম ও আচরণ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য আরো ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ভারতীয়দের খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কে প্রলুব্ধ করা এদেশের হিন্দু ও মুসলমান নাগরিকদের মনে আশঙ্কা সৃষ্টি করে।


রানী লক্ষ্মীবাঈ

কিন্তু এত বিক্ষোভ সত্ত্বেও সিপাহী-দের আনুগত্যের জন্য ইংরেজরা দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করছিল। ক্রমে সিপাহীরা ইংরাজ কর্তৃত্বের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় ভারতীয় সিপাহীদের বেতন ছিল কম ও তাদের উন্নতির সম্ভাবনা ছিল নিতান্ত অল্প। ভারতীর সিপাহীদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের অপমানকর আচরণও সিপাহীদের বিক্ষোভের অন্যতম কারণ।

এই রকম পরিস্থিতিতে 'এন্‌ফিল্ড' নামে এক নতুন রাইফেল চালু হলে অবস্থা জটিল হয়ে উঠে। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরতে হত। এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি লাগানো আছে, এই খবর রটে গেলে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ কলকাতার কাছে ব্যারাকপুরের ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে নামে এক সিপাহী এই কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করার ফলে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে।

এই বিদ্রোহ ক্রমে মীরাটে ছড়িয়ে পড়ে। মীরাট থেকে দিল্লী, ফিরোজ-পুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, শাহজাহানপুর, মোরাদাবাদ, এলাহাবাদ, ফতেবাদ,

এটাওয়া, রুড়কি, ফৈজাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে তাঁতিয়া তোপী ও নানাসাহেব, ফৈজবাদে মৌলভী আহম্মদউল্লা, বিহারে জমিদার কুমার সিং ও অমর সিং, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন এই বিদ্রোহের প্রতীক ছিলেন মুঘল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ। সর্বত্রই বিদ্রোহী নেতারা পরাজিত ও নিহত হলে বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

ব্যর্থতার কারণ : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এই বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ বিদ্রোহের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল। বিদ্রোহের প্রকৃত আয়োজন কোথাও হয়নি। প্রকৃত সংগঠন ছাড়াই ইংরেজ বাহিনীতে ভারতীয়দের এই বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটে। এই অভ্যুত্থানের গতিপথ কোথায় কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে, সে ধারণারও একান্ত অভাব ছিল। একযোগে একই সঙ্গে সর্বত্র এই বিদ্রোহ দেখা দেয়নি।

বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ছিল। একই আদর্শ নিয়ে সব নেতারা বিদ্রোহে যোগ দেননি। তাছাড়া, এই বিদ্রোহে সামগ্রিক নেতৃত্ব দেওয়ার মত ক্ষমতাও নেতাদের ছিল না।

সমস্ত দেশব্যাপী এই বিদ্রোহ হয়নি, হয়েছিল মাত্র উত্তর ও মধ্য ভারতে। পাঞ্জাবের শিখরা বিদ্রোহে যোগ না দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। নিতান্ত আঞ্চলিক হওয়াতে এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করা সম্ভব হয়।

অস্ত্র ও রণকৌশলে ইংরেজরা সিপাহীদের চাইতে অনেক উন্নত ছিল। ইংরেজ সেনাপতিদের দক্ষতাও ছিল প্রচুর। ফলে সিপাহীদের পক্ষে বেশী দিন যুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি।

প্রকৃতি : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এই বিদ্রোহকে কেবলমাত্র সিপাহী-বিদ্রোহ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে এই বিদ্রোহে ভারতের সর্বশ্রেণীর লোক যোগ দেয়নি ও এই বিদ্রোহ ভারতের সর্বত্র ঘটেওনি। কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ কেবলমাত্র সিপাহী-বিদ্রোহ বলা যায় না। সিপাহীরা আরম্ভ করলেও শেষ পর্যন্ত অযোধ্যা ও বিহারের জনসাধারণ এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। এই অঞ্চলে এই বিদ্রোহের পিছনে জনসমর্থন

ছিল। এই বিদ্রোহের পিছনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষও কাজ করে। কেউ কেউ এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা-যুদ্ধ বলেছেন। কিন্তু একে ঠিক স্বাধীনতা-যুদ্ধও বলা যায় না। স্বাধীনতা-আন্দোলন সর্বস্তরের মানুষের বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার ইচ্ছাকেও বলা হয়। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে সেরকম ব্যাপক চেতনা দেখা যায়নি। তবুও বলা যায়, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহী-বিদ্রোহ রূপে শুরু হয়ে ব্যাপক গণজাগরণের রূপ নেয়। একে "বিরাট বিপ্লব" বলা যায়।

(৪) **বৃটিশ শাসনের ফলাফল—রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ** (Results of British rule—Political and Economic discontent) : বৃটিশ শাসনের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ফলাফলও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বৃটিশ শাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে ভারতীয়দের স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতের মানুষ বুঝল যে, ভারতের অর্থনীতি যতদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাতে থাকবে, ততদিন ভারতের উন্নতির সম্ভাবনা নেই। ইংরেজরা মনে করত ভারতবাসীরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ শুরু হয়। বাক্-স্বাধীনতা, জনসমিতি গঠন প্রভৃতিতেও হস্তক্ষেপ শুরু হল বা সীমাবদ্ধ করা হল। বৃটিশরা সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ-প্রথা, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি বিভেদমূলক শক্তি সমর্থন করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভারতীয় শিক্ষিতরা বুঝতে পারলেন, যাকে তাঁরা বৃটিশ উদারতা বলে মনে করেছিলেন, তা আসলে উপনিবেশ বিস্তারের উপায় মাত্র। এই সময় থেকে তাঁরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তুললেন।

ইংরেজরা কৃষিক্ষেত্রে পুরানো ব্যবস্থা ভেঙ্গে জমিদারী ও রায়তওয়ারী প্রথা প্রচলিত করে। ফলে কৃষকরা হয়ে যায় ভাড়াটিয়া প্রজা। ইংরেজদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সুদখোর মহাজনদের আবির্ভাব হল। কৃষিকে আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত করার চেষ্টা হয়নি। একদিকে পুরানো হস্তশিল্পের ধ্বংস-সাধন করে ও অন্যদিকে আধুনিক শিল্পবিকাশের পথ বন্ধ করে সরকার শিল্প-বিপ্লবের পথ লাভ করতে দেয়নি। ভারত থেকে প্রচুর সম্পদ নির্গত হয়ে যেত। ভারতবাসীরা বুঝতে পারল ভারতের দারিদ্র্য ভৌগোলিক কারণে

নয়, প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবেও নয়। ভারতকে শোষণের ফলে উন্নতির সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভারত বৃটিশ পণ্যের বড় বাজারে পরিণত হল। ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করে বৃটেনের শিল্প উন্নত হয়ে উঠল। ভারতের হস্তশিল্প ধ্বংস হয়ে গেল, শিল্পেও কোন উন্নতি হল না।

প্রশ্নাবলী

১। বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লেখ।

২। পলাশীর যুদ্ধের কারণ কি?

৩। মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের কেন যুদ্ধ হয়েছিল? সর্বশেষ কোন্ যুদ্ধে মীরকাশিম পরাজিত হয়েছিলেন?

৪। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের বিবরণ দাও।

৫। হায়দার আলি ও টিপু স্থলতানের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

৬। ওয়েলেস্লীর "অধীনতামূলক মিত্রতা"-নীতি ব্যাখ্যা কর। তাঁর আমলে রাজ্যবিস্তার সম্পর্কে যা জান লেখ।

৭। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের বিবরণ দাও।

৮। প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের বিবরণ দাও।

৯। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের বর্ণনা দাও।

১০। লর্ড ডালহৌসীর "স্বত্ববিলোপ নীতি" আলোচনা কর। এই নীতির সাহায্যে তিনি কোন্ কোন্ রাজ্য দখল করেছিলেন?

১১। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহের কারণ কি?

১২। সিপাহী-বিদ্রোহের প্রকৃতি ও ব্যর্থতার কারণ আলোচনা কর।

১৩। সিপাহী-বিদ্রোহ পর্যন্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষের বিবরণ দাও।

১৪। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের বিবরণ দাও।

৮ অষ্টাদশ শতাব্দীর জগৎ—যুক্তিবাদের যুগ (World in the 18th Century —Age of Reasons)

(ক) আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ

কারণ : কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কারের পর নতুন মহাদেশের দক্ষিণে ও মধ্য অঞ্চলে স্পেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে ইংলণ্ড তেরটি উপনিবেশ স্থাপন করে। এই তেরটি উপনিবেশ প্রায় স্বায়ত্তশাসিত ছিল। ফলে একসময় উপনিবেশগুলির মধ্যে স্বাধীনতা-স্পৃহা দেখা দেয়।

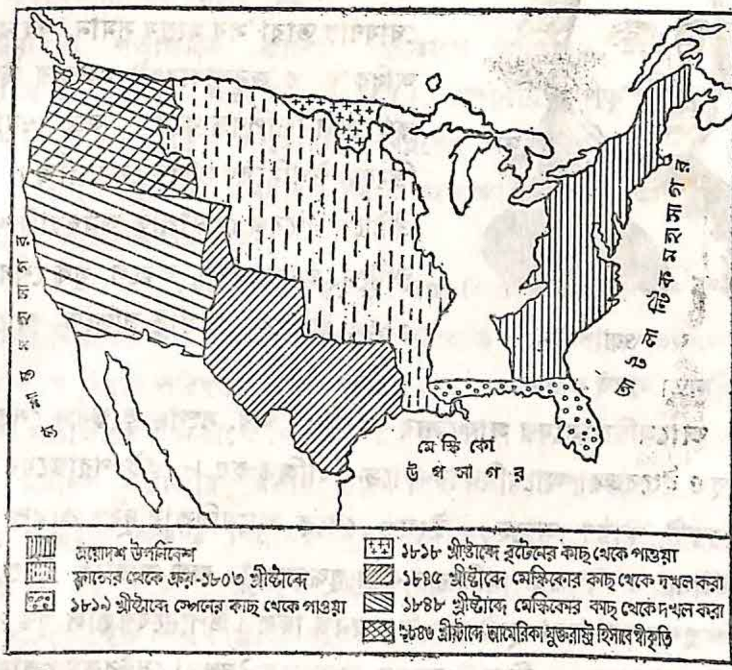
মাতৃদেশ থেকে অনেক দূরে থাকায় উপনিবেশগুলির মাতৃদেশ ইংলণ্ডের প্রতি আকর্ষণ অনেক কমে যায়। তাদের "ইংরেজ ভাব" কমে গিয়ে "আমেরিকান ভাব" দেখা দেয়।

ইংলণ্ড নিজের অর্থনৈতিক সুবিধার জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানা বাধার সৃষ্টি করত। এই বাধাগুলিই স্বাধীনতা-যুদ্ধের অন্যতম কারণ। ইংলণ্ডের প্রয়োজন এমন কোনও জিনিস তারা অন্যদেশে রপ্তানী করতে পারত না। নেভিগেশন আইন অনুযায়ী কেবলমাত্র ইংলণ্ডের জাহাজেই পণ্য রপ্তানী করতে হত। ইস্পাত, উল, টুপি প্রভৃতি কয়েকটি জিনিস উপনিবেশবাসীরা তৈরি করতে পারত না, ইংলণ্ড থেকে কিনতে হত। তামাক ও তুলা কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই রপ্তানী করতে বাধ্য ছিল। এই বিবিধ বাধার ফলে ঔপনিবেশিকদের ইংলণ্ডের প্রতি অসন্তোষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফরাসীরা পরাজিত হওয়ায় উপনিবেশগুলির ফরাসী-ভীতি দূর হয়।

সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ব্যয়ের একটা অংশ তোলার জন্য ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড গ্রেন্‌ভিল "স্ট্যাম্প আইন" নামে এক আইন পাস করলেন। আইনে বলা হল, প্রতিটি সরকারী দলিলে স্ট্যাম্প লাগাতে হবে। উপনিবেশগুলি এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করল। তারা জানাল যে বৃটিশ পার্লামেন্টে তাদের কোনও প্রতিনিধি নেই, সুতরাং

পার্লামেণ্ট তাদের উপর কোনও আইন আরোপ করতে পারে না (No taxation without representation)। এই প্রতিবাদে ইংরেজ সরকার স্ট্যাম্প আইন প্রত্যাহার করে "ঘোষণার আইন" পাস করলেন। রকিংহাম মন্ত্রিসভার রাজস্ব-মন্ত্রী টাউন্‌সেণ্ড উপনিবেশগুলিতে চা, কাগজ,



কাচ, সীসা, রঙ প্রভৃতির ওপর কর বসালেন। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উপনিবেশগুলিতে প্রচণ্ড বিক্ষোভের ঝড় উঠল। চারদিকে 'বয়কট' আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড নর্থ প্রধানমন্ত্রী হয়ে সব জিনিসের ওপর কর তুলে নিয়ে কেবলমাত্র চায়ের ওপর প্রতি পাউণ্ডে তিন পেনি কর বসালেন। কিন্তু উপনিবেশগুলি নিজেদের প্রতিনিধির সম্মতি ছাড়া কোনও কর দিতে অসম্মত হল। এই সময় বোস্টন বন্দরে চা-বোঝাই এক জাহাজ এলে কয়েকজন আমেরিকান রেড্ ইণ্ডিয়ানের ছদ্মবেশে জাহাজে উঠে ৩৪২টি চায়ের পেটি সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। একে "বোস্টন টি পার্টি" বলা হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জর্জিয়া বাদে ১২টি উপনিবেশের প্রতিনিধি ফিলাডেল্‌ফিয়া শহরে মিলিত হয়ে ইংলণ্ডরাজের কাছে তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি সুবিবেচনার জন্য আবেদন

জানাল। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লেক্সিংটনে এক ছোটখাট যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্জিয়া সমেত ১৩টি উপনিবেশের প্রতিনিধি ফিলাডেল্‌ফিয়া শহরে দ্বিতীয় সম্মেলনে মিলিত হয়ে ৪ঠা জুলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই স্বাধীনতা-ঘোষণায় তারা 'সব মানুষ সমান, সবার সমান অধিকার ও জনসাধারণই ক্ষমতার উৎস'—কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে। জর্জ ওয়াশিংটন ছিলেন উপনিবেশগুলির সেনাপতি। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি কর্নওয়ালিশ ইয়র্ক টাউনে আত্মসমর্পণ করলে যুদ্ধ শেষ হয়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-সন্ধিতে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে।



জর্জ ওয়াশিংটন

আমেরিকানদের সাফল্যের কারণ : অর্থ, সম্পদ ও সুদক্ষ সৈন্য থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা আমেরিকার কাছে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের বিশেষ কয়েকটি কারণ আছে। ইংলণ্ড থেকে আমেরিকার দূরত্ব কয়েক হাজার মাইল। এই দূরত্ব অতিক্রম করে যুদ্ধচালনার জন্য জাহাজে সৈন্য, রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানো খুবই অসুবিধাজনক ছিল। উপনিবেশগুলি যুদ্ধ করছিল স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু ইংলণ্ডের বেতনভুক সৈন্যরা সেইরকম কোন আদর্শ নিয়ে যুদ্ধ করেনি। ইংলণ্ডের শত্রু ফ্রান্স উপনিবেশগুলির পক্ষে যোগ দেওয়ায় এবং স্পেন ও হল্যাণ্ড সশস্ত্র নিরপেক্ষতা ঘোষণা করায় ইংলণ্ডের খুবই অসুবিধা হয়। সর্বোপরি জর্জ ওয়াশিংটনের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব উপনিবেশগুলির জয়লাভে সাহায্য করে।

ফলাফল : আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের ফলাফল হয়েছিল সুদূর-প্রসারী। এই যুদ্ধের ফলে আমেরিকায় গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার দলিলে জনগণের অধিকার সার্বভৌম বলে স্বীকার করায় পৃথিবীতে গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়।

এই বিপ্লবে শিক্ষা পেয়ে ইংলণ্ড তার উপনিবেশ-নীতি পরিবর্তন করে; এবং উপনিবেশগুলির উপর অত্যাচারের নীতি পরিবর্তন করে তাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে চেষ্টা করে।

আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের ফলে ফরাসী-বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। এই যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুই জাতীয় সভা ডাকতেই বিপ্লব শুরু হয়। ফরাসী সেনাপতি লাফায়েৎ আমেরিকার বিপ্লবীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। দেশে ফিরে তিনি ফরাসী-বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে, ইউরোপে ও অন্যত্র সমস্ত বিপ্লবই আমেরিকার বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় ঘটে। স্পেনীয় ও পর্তুগীজ অধিকৃত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকায় আমেরিকার বিপ্লবের অনুপ্রেরণায় বিপ্লব দেখা দেয়। বিশ্বের লাঞ্ছিত জনসাধারণের সামনে আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ এক নতুন পথের সন্ধান দেয়।

(খ) ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব

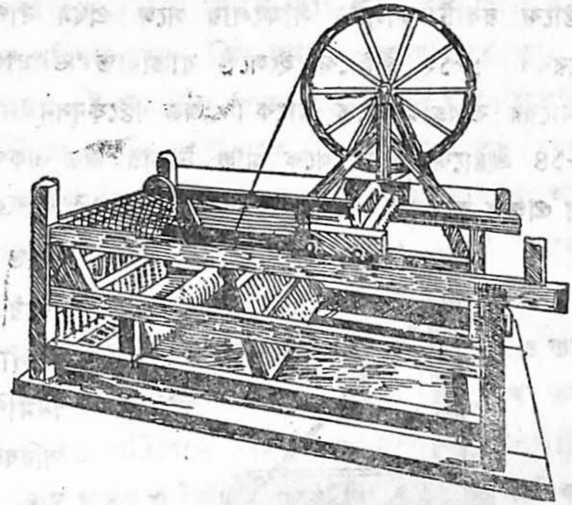
শিল্প-বিপ্লবের অর্থ: মানুষের শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল, তাকে সাধারণভাবে শিল্প-বিপ্লব বলে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, তারই ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়। শিল্প-বিপ্লব পৃথিবীর অন্যান্য বিপ্লবের মত আকস্মিক ভাবে ঘটেনি, ধীরে ধীরে হয়েছে। এই কারণে অনেকে একে বিপ্লব না বলে 'শিল্পে ক্রমবিকাশ' বলেছেন। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের প্রভাবে অর্থনীতি, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে এক যুগান্তর পরিবর্তন এসেছিল। পুরানো সবকিছুই ভেঙ্গেচুরে নতুনভাবে গড়ে ওঠে। তাই এই ব্যবস্থাকে শিল্প-বিপ্লব বলা হয়। ইংলণ্ড ছিল এই শিল্প-বিপ্লবের জন্মস্থান। পরবর্তী কালে এই বিপ্লব ইংলণ্ড থেকে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব: অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কৃষিক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ক্রমাগত জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে কৃষিনির্ভর মানুষ কৃষি-পদ্ধতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। পুরানো ব্যবস্থার উন্মুক্ত জমি কেটে তা একত্র ও সংহত করে বিভিন্ন লোকের মধ্যে নতুন করে বিলি করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। জমির উৎপাদন বাড়াতে জমিকে ঘেরা-দেওয়া ও সংহত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। বিক্ষিপ্ত জমি এমনভাবে সংহত করা হল যে, একজন এক

জায়গায় একত্রে জমি পায়। এর ফলে বড় বড় জমিদাররা ছোট কৃষকদের জমি দখল করে নিল। অনেক ছোট কৃষক পশুচারণের ভূমি না পেয়ে জমি বিক্রি করে দিয়ে বেকার শ্রমিকে পরিণত হল। এইভাবে বড় বড় সম্পন্ন কৃষকের আবির্ভাব হল। পতিত জমি আর পড়ে থাকল না। ইংলণ্ডের রাজস্ব-মন্ত্রী টাউন্‌সেণ্ড 'নর্‌ফোক্‌ ব্যবস্থা' নামে এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। জমিকে ফেলে না রেখে একই জমিতে পরিবর্তন করে নানা ফসল সারা বছর ধরে উৎপাদিত হতে থাকল। দুই ফসলের মাঝে মূলের আবাদ করলে জমির উর্বরতা বজায় থাকে, এই শিক্ষা কৃষকেরা পেল। অধিকন্তু গৃহপালিত পশু ঐ মূল খেয়ে শীতকালে বাঁচতে পারে। কৃষিকাজ করার জন্য নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হতে লাগল। ঘোড়ায়-টানা লাঙ্গল ব্যবহৃত হতে শুরু হল। বীজ ছড়িয়ে না দিয়ে যন্ত্র দিয়ে গর্ত করে বীজ রোপণের ব্যবস্থা হল। বীজবপন ও শস্য-ঝাড়াই-এর জন্য নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হল। এই সময়ে বেক্‌ওয়েল প্রমুখ বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় বিভিন্নজাতীয় গৃহপালিত পশুর সংমিশ্রণে উন্নতশ্রেণীর গোরু ও মহিষ উৎপাদিত হতে থাকল। এই উন্নতির ফলে একাধিক কৃষি-উৎপাদন বাড়তে থাকে, অন্যদিকে রপ্তানীও বৃদ্ধি পায়। তুলার উৎপাদন অত্যধিক বেড়ে যায়। তৎকালীন শিল্প-ব্যবস্থায় কাপড়ের উৎপাদন আর বাড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। সুতোর অভাবে তাঁতী অলস হয়ে বসে থাকত। সুতো যারা তৈরি করত, তারা সারাক্ষণ কাজ করেও চাহিদা মেটাতে পারত না। কাপড়ের উৎপাদন বজায় রাখার জন্য সুতো তৈরির ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আবশ্যক হল।

আবিষ্কারসমূহ : শিল্প-বিপ্লব প্রথমে দেখা দেয় ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পে। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ কে উন্নত প্রকারের মাকু আবিষ্কার করেন। এই মাকু তাঁতের এক দিক থেকে অন্যদিকে আপনিই ঘুরে যেত। হার্‌গ্রীভ্‌স্ নামে এক দরিদ্র শ্রমিক সুতো কাটার জন্য নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। তাঁর স্ত্রী জেনীর নামানুসারে এই যন্ত্রের নাম দেন "স্পিনিং জেনী"। প্রথমে আটটি টাকু থেকে আটগাছা সুতো অবিরত বের হত—পরে ষোলগাছা করে বের করার ব্যবস্থা হয়। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রিচার্ড আর্করাইট্ নামে এক নাপিত জলস্রোত দ্বারা চালিত "ওয়াটার-ফ্রেম" যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

এই যন্ত্রে তুলো পরিষ্কার করে সুতো কাটা ও গুটিয়ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর কিছুদিন পরে স্যামুয়েল ক্রম্প্‌টন হার্‌গ্রীভ্‌স্‌ ও আর্করাইটের যন্ত্রের কিছু অদবদল করে "মিউল" নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কাট্‌রাইট্‌ নামে এক পাদরি জলস্রোতের বেগে পরিচালিত স্বয়ংক্রিয় মাকু দ্বারা এক তাঁত নির্মাণ করেন। এর নাম দেওয়া হয় "পাওয়ার্‌ লুম্‌"। এই যন্ত্রগুলি সাধারণত নদীর স্রোত বা বাতাসের শক্তি দিয়ে চালানো হত। তাতে নানা অসুবিধে দেখা দিত; অনেক সময় প্রয়োজনীয় স্রোত বা বাতাস পাওয়া যেত না। জেমস্‌ ওয়াট্‌ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাষ্পের সাহায্যে সব যন্ত্রই সুন্দরভাবে চালানো হতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হেন্‌রী কোর্ট্‌ নামে এক ইংরেজ পাথুরে কয়লা ও পোড়াকয়লা দিয়ে ধাতব পদার্থ গলাবার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে যে লোহা পাওয়া গেল, তাতে নানা যন্ত্রপাতি তৈরি করা হয়। স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভি কয়লাখনির কাজের জন্য একরকম "নিরাপদ বাতি" উদ্ভাবন করেন; তাঁর ফলে খনির বিপদ কমে গিয়ে প্রচুর কয়লা তোলা সম্ভব হয়। এত সত্ত্বেও

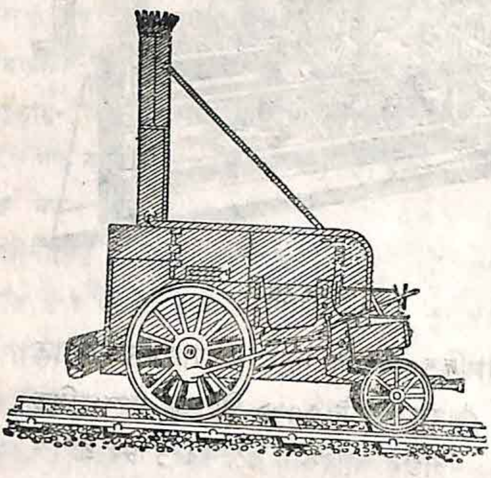


স্পিনিং জেনী



জেমস্‌ ওয়াট্‌

সব ঋতুতে চলার জন্য পথের অভাব ছিল। এরপর পরিবহণে বিপ্লব এল। টেল্‌ফোর্ড ও ম্যাক্‌ডাম নামে দু'জন ইঞ্জিনীয়ার আলকাতরা ও পাথরের টুকরো মিশিয়ে পাকা রাস্তা তৈরির উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ফাল্‌টন সাফল্যের সঙ্গে প্রথম বাষ্পীয় পোত আবিষ্কার করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যাতায়াত ও মাল-পরিবহণে নিয়মিত স্টীমারের ব্যবহার হতে থাকে। জর্জ স্টিফেন্‌সন্‌ নামে এক সুদক্ষ কর্মী ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে খনি থেকে মাল টানার জন্য একখানি গতিশীল বাষ্পীয় যন্ত্র প্রস্তুত করেন। এগারো বছরের মধ্যে ১৮২৫ খ্রীঃ এই আবিষ্কারই আরও উন্নত করে তিনি রেলপথ দিয়ে যাত্রীসহ চলার বাষ্পীয় শকট বা রেল-ইঞ্জিন নির্মাণ করেন। এইভাবে পরিবহণেও বিরাট পরিবর্তন সূচিত হল।



স্টিফেন্‌সন্‌ আবিষ্কৃত রেল-ইঞ্জিন

শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল :—শিল্প-বিপ্লবের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে গভীর পরিবর্তন ঘটে।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে সাধারণ মানুষের জীবনধারণের মান উন্নত হল। মানুষের জীবনযাপন-প্রণালী অনেক সহজ হয়ে গেল। যন্ত্রের সাহায্যে তৈরী নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যও কম হল। মানুষের রুচিরও পরিবর্তন হল। খাবার, কাপড়, কলের জল, বিদ্যুতের আলোর সুবিধা সমাজে সবাই ভোগ করতে থাকে। যাতায়াতের ক্ষেত্রে পরিবহণ-ব্যবস্থায় মোটরগাড়ী, স্টিমার, রেলগাড়, ইত্যাদি আবিষ্কারের ফলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া-আসা সকলের পক্ষেই সম্ভব ও সহজ হল।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে গ্রামাঞ্চলের কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। মধ্যযুগে কারিগররা নিজেদের বাড়ীতে বসে ছোট যন্ত্রের সাহায্যে যে জিনিস তৈরি করত, তা তার গ্রামেই বিক্রি হয়ে যেত। বাষ্প ও বিদ্যুৎচালিত বড়

বড় যন্ত্র বসাবার ক্ষমতা এইসব কারিগরের ছিল না। যন্ত্রে তৈরী জিনিস দেখতে সুন্দর ও মূল্যে ছিল অল্প। ফলে প্রতিযোগিতায় না পেরে কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে গেল ও কারিগররা কলকারখানার শ্রমিকে পরিণত হল।

কৃষিতে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে অনেক ছোট কৃষক জমি বিক্রি করতে বাধ্য হয় ও দিনমজুরে পরিণত হয়। কিছু কৃষক ক্ষেত-খামারে কাজ না পেয়ে বেকার হয়ে যায়। এই সময় ইংলণ্ডে বড় বড় শহরের পত্তন হয়েছিল; যেমন—লিভারপুল, লীডস্, বার্মিংহাম ইত্যাদি। কাজ না পেয়ে বেকার কারিগর ও কৃষকরা কারখানায় কাজ পাওয়ার জন্য শহরে আসতে আরম্ভ করে। শ্রমিকের চাহিদা খুব একটা বেশী ছিল না। এই সুযোগে মালিকরা শ্রমিকদের অল্প মজুরিতে নিয়োগ করে প্রচুর লাভবান হতে থাকে। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে শ্রমিকরা যা আয় করত, তাতে তাদের পেট ভরত না। কারখানার কাছের বস্তিতে নোংরা পরিবেশে তাদের থাকতে হত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার ফলে ও প্রচুর খাটুনির ফলে তাদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ত ও নৈতিক অবনতিও ঘটত। মালিকদের কথা না শুনলে উপবাসে মরতে হত। এইভাবেই সমাজে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণীর সৃষ্টি হল। দেশের প্রচুর সম্পদ কয়েকজন মালিকদের হাতে জমতে শুরু করল। ধনীরা আরও ধনী হতে থাকল। ক্রমে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত দেখা দিল।

শ্রমিকরা বুঝল মালিকদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে। প্রথম দিকে সরকার শ্রমিকদের আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করে। ক্রমে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে "শ্রমিকসংঘ" (Trade Union) তৈরি করে নিজেদের দাবিদাওয়া আদায় করার পথে অগ্রসর হয়। আরও কিছুদিন পরে সরকার আইন করে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করতে অগ্রসর হয়।

শিল্প-বিপ্লবের পূর্বে জমিদাররাই রাজনীতিতে প্রাধান্যলাভ করেছিলেন। শিল্প-বিপ্লবের ফলে জমিদারশ্রেণীর ক্ষমতা কমে যায়। নতুন মালিক বা মূলধনশ্রেণী রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। রাষ্ট্র পরিচালনাতেও এই শ্রেণীই প্রাধান্য লাভ করেছিল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নতুন নতুন শহরগুলিতে কোনও ভোটাধিকার ছিল না। এইসব শহরে মূলত শ্রমিকরাই বাস করত এইসব শহরে ভোটাধিকারের জন্য আন্দোলন শুরু হল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভোটাধিকারের জন্য তীব্র আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে সংস্কার প্রবর্তিত হল।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। এই সংঘাত থেকে জন্ম নেয় সমাজতন্ত্রবাদ। সমাজতন্ত্রের মূল কথা হল,—সমাজের সম্পদ সমভাবে বণ্টন করা। ধনী ও নির্ধনের মধ্যে অসাম্য দূর করাই ছিল সমাজতন্ত্রের আদর্শ। শ্রমিকশ্রেণী ক্রমশই এই মতবাদের দিকে আকৃষ্ট হল।

(গ) ফরাসী বিপ্লব

(i) **প্রাক্ বিপ্লব চিন্তাধারা ঃ** ফরাসীদেশে বিপ্লবের পূর্বেই ভাবজগতে বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। ফরাসী লেখক ও দার্শনিকদের রচনায় সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলি প্রকাশিত হয়ে যায়। এইসব দার্শনিকদের মধ্যে মণ্টেস্কু, ভল্‌তেয়ার ও রুশোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মণ্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫ খ্রীঃ) ঃ ফ্রান্সে যুক্তিবাদের প্রথম প্রবক্তা ছিলেন মণ্টেস্কু। তিনি "আইনের মর্ম" ও "পারসিক পত্রাবলী" নামে দুইটি পুস্তক রচনা করেন। তিনি ফ্রান্সের রাজার স্বৈরাচার ও দৈবস্বত্বের অধিকারের সমালোচনা করেন এবং বিচার-বিভাগ ও শাসন-বিভাগকে পৃথক করার পরামর্শ দেন।


ভল্‌তেয়ার

ফ্রান্সের বিখ্যাত চিন্তাবিদ্ ছিলেন **ভল্‌তেয়ার**। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ভাষা ছিল রসাল ও তীক্ষ্ণ। ক্যাথলিক গীর্জাকে তিনি বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত উৎপাত ও কুসংস্কারের আড়ত বলে অভিহিত করেন। তিনি প্রচলিত শাসনব্যবস্থা ও সমাজকেও আক্রমণ করেছিলেন। ভল্‌তেয়ার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না,—প্রজাহিতৈষী স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাস করতেন। তাঁর রচনায় ফ্রান্সের সাধারণ লোকের মানসিক প্রসার ঘটে।

ফরাসী দর্শনের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন জঁা জেকুইস রুশো (১৭১২-১৭৭৮ খ্রীঃ)। তিনি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন। তিনি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে-ছিলেন। রুশো বলেছেন, মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়েই জন্মায়, কিন্তু পরে লোভী ও স্বার্থপর লোকের জন্য মানুষ সমাজে স্বাধীন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। "মানুষ স্বাধীন সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু সর্বত্রই মানুষ পরাধীন"—এই সকল রুশোর বই "সামাজিক চুক্তি"-র বিষয়বস্তু। তিনি বললেন যে,রাজা ভগবান কর্তৃক প্রেরিত নন, প্রজারাই রাজাকে রাজ্যশাসনের অধিকার দিয়েছে। রাজা প্রজার প্রতি কর্তব্য না করলে তাকে বিতাড়িত করার অধিকারও প্রজাদের আছে।


রুশো

বিপ্লবের কারণ ও প্রসার : যে-কোনো দেশে নানাবিধ কারণে বিপ্লব ঘটে। বহুদিনের জমা কারণ বিপ্লবে ভেঙ্গে পড়ে। ফরাসী বিপ্লবের পেছনেও বহুদিনের অসন্তোষ জমা হয়েছিল।

ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশ রাজত্ব করত। বুরবোঁরা দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী এবং স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ফ্রান্সে একটি প্রতিনিধি-সভা ছিল, কিন্তু ১৭৫ বছর ধরে তার অধিবেশন ডাকা হয়নি। ফলে জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ জানানোর কোনও পথ ছিল না। চতুর্দশ লুই-এর পর ফ্রান্সে কোনও শক্তিশালী রাজা রাজত্ব করেননি। বিপ্লবের সময়ের রাজা যোড়শ লুই মানুষ হিসেবে ভাল হলেও তাঁর শাসন করার ক্ষমতা ছিল না। ফ্রান্সের সর্বত্র শাসন ও বিচার ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। বিচারের নামে দুর্নীতি


রাজা যোড়শ লুই

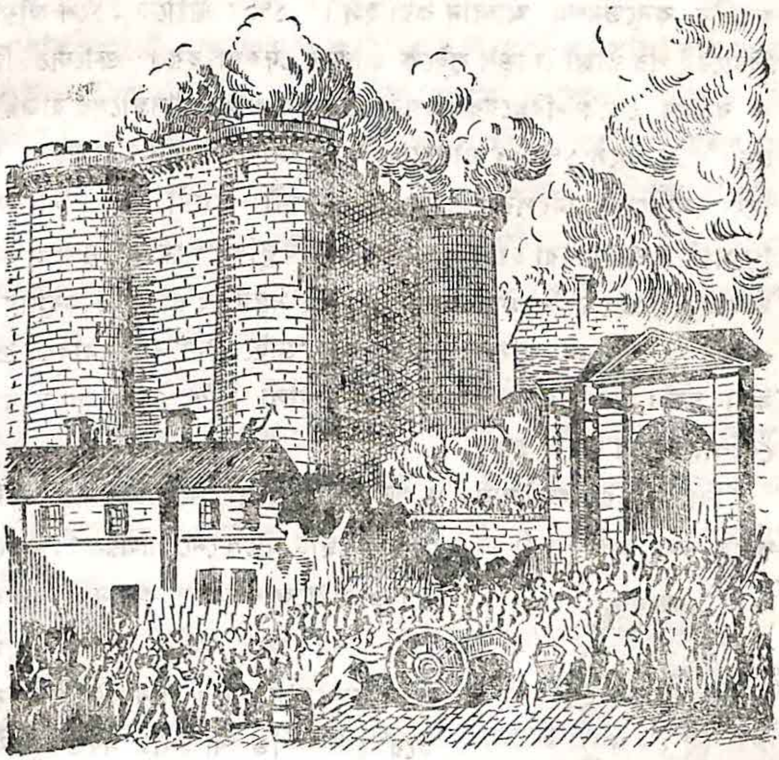
ও অবিচার হত। 'লেতার-ডি-কেশে' নামে পরোয়ানা জারী করে যে-কোনও লোককে বিনাবিচারে বন্দী করা যেত।

ফ্রান্সের সমাজ ছিল শ্রেণীবিভক্ত। প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন উচ্চশ্রেণীর যাজক, দ্বিতীয় শ্রেণীতে অভিজাত, আর বাকি সবাই তৃতীয় শ্রেণীতে। প্রথম দুই শ্রেণীর অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর যাজক ও অভিজাতরা ছিলেন সুবিধাভোগী। তাঁরা সরকারের সব শাসনতান্ত্রিক পদ ও সামরিক বাহিনীর পদগুলি অধিকার করতেন। ফ্রান্সের ৪০ শতাংশ জমির মালিক ছিলেন সুবিধাভোগীরা। করের বোঝা বহন করত তৃতীয় শ্রেণী। তাদের যোগ্যতা থাকলেও সামরিক কিংবা অসামরিক পদে নিযুক্ত হতে পারত না! এই সময় ফ্রান্সে এক বিত্তবান মধ্যবিত্তশ্রেণীর আবির্ভাব হয়। এঁরা সমাজের ব্যবধান ভেঙ্গে সমান অধিকার লাভের জন্য ব্যগ্র হলেন।

ফরাসী বিপ্লবের বিশিষ্ট কারণ ছিল ফ্রান্সের অর্থনৈতিক দুরবস্থা। অমিতব্যয়িতা, কর রেহাই, এবং দুর্নীতি ছিল ফরাসী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। কৃষকদের বেগার খাটতে হত। কর-ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। অভিজাতরা দেশের বেশির ভাগ জমির মালিক হয়েও কর দিতেন না। ফলে তৃতীয় শ্রেণীর লোকেদের শতকরা ৯৬ ভাগ কর বহন করতে হত। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় রাজকোষ শূন্য হয়ে যায়। রাজা ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিনিধি সভা আহ্বান করার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব শুরু হয়ে যায়।

বিপ্লবের প্রসার ঃ প্রতিনিধি-সভায় সব শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ছিল। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণী আলাদা আলাদা ঘরে অধিবেশন করত। ভোটও দিত পৃথক পৃথক কক্ষ অনুযায়ী। ১৭ই জুন, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা একত্রে অধিবেশন ও মাথাপিছু ভোটের দাবি জানালেন। রাজা ষোড়শ লুই জাতীয় সভার অধিবেশন বন্ধ করে দেন (২০শে জুন)। তৃতীয় শ্রেণীর সদস্যরা পাশের 'টেনিস কোর্টে' শপথ নিলেন যে, যত দিন না ফ্রান্সের নতুন সংবিধান তৈরি হচ্ছে, ততদিন প্রতিনিধি-সভার অধিবেশন চলবে। ২৭শে জুন, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তাদের দাবি মেনে সব শ্রেণীর প্রতিনিধিগণকে একত্রে বসে মাথাপিছু ভোটের সম্মতি দেন। প্রতিনিধি-সভা সংবিধান-সভায় রূপান্তরিত হয় ও কিছুদিনের মধ্যে একটি সংবিধান তৈরি করে।

সংবিধান-সভার কাজ চলাকালীন ফ্রান্সে সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেখা দেয়। প্যারিসের জনতা ১৪ই জুলাই, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাস্তিল কারাগার আক্রমণ করে। এর ফলে বাস্তিলের বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়।



বাস্তিলের পতন

অল্পদিনের মধ্যে ফরাসীরা বিপ্লব ও দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল। বিপ্লবের সময় বহু যাজক ও অভিজাত-সম্প্রদায় বিদেশে পালিয়ে গিয়ে সেইসব দেশকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছিলেন। এই সময় রাজা ও রানী ছদ্মবেশে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন।

ইতিমধ্যে সংবিধান-সভার স্থানে আইনসভা গঠিত হয়েছে। যাঁরা দেশ ত্যাগ করেছেন, আইনসভা তাঁদের দেশে ফেরার নির্দেশ দিল ;—না ফিরলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। রাজা এই আইন স্থগিত রাখলে জনসাধারণ ক্ষেপে গিয়ে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। অস্ট্রিয়ার সেনাপতি ফ্রান্সের রাজার ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও নৈরাজ্য দূর করার হুমকি দিলে

জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ক'রে রাজা ও রানীকে গ্রেপ্তার করে ও রাজতন্ত্র বিলোপ করতে আইনসভাকে বাধ্য করে।

ফ্রান্সকে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হল। আইনসভা বাতিল করে জাতীয় কন্‌ভেনশন্‌ আহ্বান করা হল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জানুয়ারি, বিচারের পর রাজা ষোড়শ লুইকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ফ্রান্সের ভিতরে ও বাইরে থেকে বিপ্লবের ওপর আক্রমণ আসায় "সন্ত্রাসের রাজত্ব" শুরু হয়। ১৪ মাসে ১৭,০০০ মানুষকে গিলোটিন-যন্ত্রে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই নিরপরাধ ছিলেন। রানী ম্যারী আঁতোনায়েতকেও গিলোটিনে হত্যা করা হয়। জনসাধারণ কিছুদিন পরে এই নৃশংস শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানালে এই সন্ত্রাসের রাজত্বের অবসান হয়। এরপর এক নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করে 'ডাইরেক্টরী' শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হল। ক্রমেই সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তার ফলে নেপোলিয়নের উত্থান হয়।

বিপ্লবের একজন সৈনিক ও সম্রাট হিসেবে নেপোলিয়ন: ইটালীর কাছে ভূমধ্যসাগরে কর্সিকা নামে এক ছোট দ্বীপে নেপোলিয়ন ১৫ই আগস্ট, ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করে তিনি ফ্রান্সে সামরিক বিদ্যালয়ে যোগ দেন। সামরিক শিক্ষা সমাপ্ত করে গোলন্দাজ বাহিনীর অধস্তন অফিসার হন। ইংরেজ সৈন্যবাহিনী তুঁলো বন্দর আক্রমণ করলে নেপোলিয়ন তুঁলো রক্ষা করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এক ক্ষিপ্ত জনতা জাতীয় প্রতিনিধি-সভা আক্রমণ করলে নেপোলিয়ন কামান দেগে এই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করেন। এই কাজের জন্য তাঁকে 'ব্রিগেডিয়ার' করা হয়। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে ফরাসী বাহিনী পরাজিত হচ্ছিল। ইটালীর যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হল। তিনি অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে 'ক্যাম্পো ফোর্মিও'-র সন্ধি করতে বাধ্য করেন। ইটালীতে যুদ্ধজয়ের পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইংলণ্ডকে পরাজিত করতে



নেপোলিয়ন

মিশরে উপস্থিত হলেন। পিরামিডের যুদ্ধে জয়লাভ করলেও নীলনদের যুদ্ধে ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেল্‌সনের হাতে পরাজিত হলেন। এই সময় খবর পেলেন ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় শক্তিজোট তৈরি হয়েছে। নেল্‌সনকে ফাঁকি দিয়ে তিনি ফ্রান্সে পৌঁছলেন।

তিনি ডাইরেক্টরীকে পদচ্যুত করে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কন্‌সাল' শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি নিজে হলেন প্রধান কন্‌সাল। এরপর তিনি ইটালীতে উপস্থিত হয়ে অস্ট্রিয়াকে পুনরায় পরাজিত করে লুনেভিলের সন্ধি করতে বাধ্য করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে 'এ্যামিয়েন্সের' সন্ধিতে যুদ্ধবিরতি হয়। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গণভোটের মাধ্যমে সারা জীবনের জন্য কন্‌সাল হন। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেনেটের প্রস্তাব অনুযায়ী নেপোলিয়ন 'সম্রাট' উপাধি গ্রহণ করেন।

ইতিমধ্যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তৃতীয় শক্তিজোট তৈরি হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ইংরেজ নৌ-সেনাপতি নেল্‌সনের হাতে ট্রাফাল্‌গারের যুদ্ধে পরাজিত হন। কিন্তু আলমের যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করেন। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার যুগ্মবাহিনীকে পরাজিত করে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে প্রেস্‌বার্গের সন্ধি করেন। এরপরে রাশিয়াকে পরাজিত করে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে টিল্‌জিটের সন্ধি করেন। টিল্‌জিটের সন্ধি নেপোলিয়নের গৌরবের চরম প্রকাশ।

ইংলণ্ডকে পরাজিত করার জন্য নেপোলিয়ন মহাদেশীয় অবরোধ-প্রথা ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় বলা হয় ইংলণ্ডের তৈরী কোনও জিনিস ইউরোপে ঢুকতে দেওয়া হবে না। কোনও দেশের জাহাজ ইংলণ্ডে যেতে পারবে না। ইংলণ্ড পাল্টা অবরোধ ঘোষণা করল। ফ্রান্সের উপযুক্ত নৌ-বাহিনী না থাকায় এই ব্যবস্থা সফল হল না।

পর্তুগাল মহাদেশীয় অবরোধব্যবস্থা মানতে রাজী না হলে নেপোলিয়ন স্পেনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে পর্তুগালকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। তিনি স্পেনের রাজা ফার্ডিনাণ্ডকে সরিয়ে তাঁর ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে সিংহাসনে বসালে স্পেন বিদ্রোহ করে। ধীরে ধীরে এই বিদ্রোহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ইংলণ্ড, স্পেন ও পর্তুগালকে সাহায্য করে। এইখানেই নেপোলিয়ানের পতন শুরু হয়। মহাদেশীয় অবরোধের ফলে রাশিয়ার অর্থনীতির ক্ষতি হয়। রাশিয়ার জার টিল্‌জিটের সন্ধি অগ্রাহ্য

করে ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন মস্কো অভিযান করে পরাজিত হন। ইংলণ্ড, রাশিয়া, সুইডেন প্রভৃতি দেশ নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে চতুর্থ শক্তিজোট তৈরি করল। জার্মানিতে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম শুরু হল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন লাইপ্‌জিগের যুদ্ধে পরাজিত হন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শক্তি জোটের আক্রমণে প্যারিসের পতন হয়। নেপোলিয়নকে এল্‌বা দ্বীপে নির্বাসিত করা হল।

এল্‌বা দ্বীপে দশমাস কাটিয়ে নেপোলিয়ন ইংরেজ নৌ-বাহিনীর নজর এড়িয়ে ফ্রান্সে ফিরে আসেন। শক্তিজোটের সেনাপতি ডিউক অব্ ওয়েলিং-টন ১৮১৫ খ্রীঃ ওয়াটার্লুর যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন। তাঁকে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। এইভাবে নেপোলিয়ন-যুগের অবসান হল ও বুরবোঁবংশের অষ্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

(iii) **ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল :** পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবকে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করা হয়। ফরাসী রাজারা মনে করতেন, তাঁরা ভগবানের প্রতিনিধি। ফরাসী বিপ্লবের ফলে রাজাদের স্বৈরশাসনের অবসান হয়। প্রজাদের ইচ্ছায় রাষ্ট্র চলে, এই ধারণা জয়লাভ করে। এর ফলে গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে উঠে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। নেপোলিয়নের পতনের পরও এই ভাবধারা বজায় থাকে। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আদর্শ ভবিষ্যৎ ইউরোপের ইতিহাসকে প্রভাবিত করে।

ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায় ও যাজকরা যে বিশেষ সুযোগ ও অধিকার পেত, তার অবসান হয়। সমাজে সকলের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফরাসী বিপ্লবের সময় সংবিধান-সভার ঘোষিত "মানুষের অধিকারের ঘোষণা" ভবিষ্যতে বহু জাতিকে প্রভাবিত করে।

নেপোলিয়ন বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে স্বৈরাচারী রাজাদের পরাজিত করে জাতীয় রাষ্ট্র তৈরি করলে ইউরোপে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রবল হয়। ইটালী, জার্মানি প্রভৃতি দেশে সাম্য ও ঐক্যের আন্দোলন শুরু হয়।

ফরাসী বিপ্লবের ঢেউয়ে পুরানো সবকিছু ভেঙ্গে নতুনের জন্ম হয়। ফরাসী বিপ্লবের গর্ভে নতুন ইউরোপের জন্ম হল।

প্রশ্নাবলী

১। ইংলণ্ড ও তার উত্তর আমেরিকাস্থ উপনিবেশগুলির মধ্যে যুদ্ধের কারণ কি? এই প্রসঙ্গে আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

২। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকার উপনিবেশগুলি কি কি কারণে সফল হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা-আন্দোলনের ফলাফল আলোচনা কর।

৩। শিল্প-বিপ্লব বলতে কি বোঝ। কৃষি-বিপ্লব ইংলণ্ডে কিভাবে দেখা দেয়?

৪। শিল্প-বিপ্লবের যুগে আবিষ্কারসমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। শিল্প-বিপ্লবের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ফলাফল আলোচনা কর।

৬। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে মণ্টেস্কু, ভল্‌তেয়ার ও রুশোর চিন্তাধারা আলোচনা কর।

৭। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি আলোচনা কর।

৮। ফরাসী বিপ্লবের প্রসার সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৯। নেপোলিয়ান কে ছিলেন? তিনি কিভাবে ফ্রান্সের সম্রাট হন? এবিষয়ে যা জান লেখ।

১০। ফরাসী বিপ্লবের স্থায়ী ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইউরোপের ইতিহাস
(Europe Since 1815)

৭

(ক) ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্বন্দ্ব

নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য বদ্ধপরিকর হল। ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বাণী মুছে ফেলে পুরানো স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দেয় ১৮৩০ খ্রীঃ ও ১৮৪৮ খ্রীঃ-এর বিপ্লব। সেইজন্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে 'সাফল্য থেকে আকাঙ্ক্ষার যুগ' বলা হয়।

নেপোলিয়নের পতনের পর ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য অস্ট্রিয়ার আমন্ত্রণে ভিয়েনায় এক সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলনে নেতৃত্ব করে অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ড। অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ঘোরতর রক্ষণশীল মেটারনিক এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। মুখে বড় বড় আদর্শবাদের কথা বললেও এই সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ ছিলেন সংস্কার-বিরোধী রক্ষণশীল। সম্মেলনে তিনটি নীতি গৃহীত হয়: (১) ন্যায্যাধিকার নীতির বলে বিপ্লবের পূর্বে যে রাজবংশ রাজত্ব করেছিল, সেই রাজবংশকে সেই দেশের সিংহাসনে বসানো হল ; (২) ক্ষতি-পূরণনীতি অনুযায়ী বিজয়ী রাশিয়া, প্রাশিয়া, ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়াকে তাদের সুবিধামত দেশে রাজ্যখণ্ড পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হল ও (৩) শক্তি-সাম্যনীতি অনুসারে ফ্রান্সের চারিদিকে শক্তিশালী রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়, যাতে ফ্রান্স ইউরোপের শান্তি বিঘ্নিত করতে না পারে।

ভিয়েনা-সম্মেলনের নেতারা বুঝেছিলেন যে, ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা তখনও সক্রিয় আছে। ন্যায্যাধিকার নীতিকে রক্ষা করা ও বিপ্লবের সম্ভাবনা দূর করার জন্য তাঁরা এক শক্তি-সমবায় গঠন করেন। রাশিয়ার

নেতৃত্বে পবিত্র চুক্তি ও অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ইংলণ্ডকে নিয়ে চতুঃশক্তি (১৮১৮ খ্রীঃ)-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চতুঃশক্তি-চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ভিয়েনা-চুক্তিকে রক্ষা করা ও ইউরোপে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এই চুক্তির চারটি অধিবেশন হয়। তার মধ্যে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ট্রপ্পোর বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বিপ্লবের দ্বারা ও প্রজাদের চাপে কোন শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা চলবে না। যদি এই ঘটনা কোনও দেশে ঘটে, তবে শক্তি-সমবায়ের যে-কোনও দেশ সেই দেশে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। লাইবাক্ বৈঠকের পর অস্ট্রিয়া নেপলস্-এর বিদ্রোহ দমন করে। কিন্তু ভেরোনার বৈঠকে ফ্রান্সকে স্পেনের বিদ্রোহদমনের ভার দিলে ইংলণ্ড এই চুক্তি থেকে সরে যায়। পরে নিজেদের স্বার্থের দ্বন্দ্বে এই সমবায় ভেঙ্গে পড়ে।

মেটারনিক : ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দকে 'মেটারনিকের যুগ' বলে। এই সময় ইউরোপের রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় মেটারনিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থায়। মেটারনিক দীর্ঘ চল্লিশ বছর অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য তিনি রক্ষণশীল ও পুরানো নীতি গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ, এবং সেই ব্যক্তিত্ব দিয়ে তিনি ইউরোপের রাজনীতিবিদ্‌দের উপর কর্তৃত্ব করেন। তাঁর নীতি ছিল "রাজত্ব করুন, পরিবর্তন করবেন না"। ভিয়েনা-সম্মেলনের নীতিগুলি তাঁর প্রেরণায় গৃহীত হয়েছিল। জার্মানির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও তাঁর চেষ্টায় দমিত হয়। ইটালীর বিদ্রোহ তাঁর হস্তক্ষেপে দমিত হয়েছিল। মেটারনিকের চেষ্টায় ট্রপ্পোর নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল।



মেটারনিক

শাসকদের দমননীতি ইউরোপে বিপ্লবী আন্দোলন দমন করতে পারেনি। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিপ্লব হয়। ফ্রান্সের রাজা ইংলণ্ডে পালিয়ে যান। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী শাসন করার প্রতিশ্রুতি

দিয়ে লুই ফিলিপ ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। হল্যাণ্ড থেকে পৃথক হওয়ার জন্য বেলজিয়ামে বিদ্রোহ হয়। ইটালী, জার্মানি ও পোল্যাণ্ডের নানা স্থানেও সংঘর্ষ বেধে যায়। যদিও বেশির ভাগ দেশে বিদ্রোহ দমন করা হয়, তবুও গ্রীস ও বেলজিয়াম স্বাধীনতা পায়।

কয়েক বছরের মধ্যেই ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় ইউরোপে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ইউরোপের সব দেশেই হয় ও শক্তিসংঘের রাজ্যগুলিকে আঘাত করে। প্রথমে ইটালীতে বিদ্রোহ হয় ও ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্রান্সে বিদ্রোহের ফলে রাজা লুই ফিলিপ পালিয়ে যান। ফ্রান্সকে 'প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয়। ফ্রান্সের পর জার্মানির বিভিন্ন শহরে বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রাশিয়া সমেত জার্মানির সব রাজ্যই নানা সংস্কার করতে বাধ্য হয়। অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনাতেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহের ফলে মেটারনিক-প্রবর্তিত ব্যবস্থা ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায় ও স্বয়ং মেটারনিক অস্ট্রিয়া থেকে পালিয়ে ইংলণ্ডে আশ্রয় নেন।

(খ) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিকাশ

ইটালী: বহু শতাব্দী ধরে ইটালী নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। নেপোলিয়ন সমগ্র ইটালী দখল করে 'ইটালী রাজ্য' নামে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নেপোলিয়ানের মাধ্যমে বিপ্লবী ভাবধারা ইটালীতে প্রসারিত হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা-সম্মেলন অস্ট্রিয়ার স্বার্থে ইটালীকে কয়েকটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে। প্রকৃতপক্ষে, ইটালী ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত হয়।

ইটালীতে ঐক্য-আন্দোলন শুরু করে কার্বোনারী নামে এক গুপ্তসংস্থা। এরা কাঠকয়লা পুড়িয়ে শপথ নিত বলে এদের 'কার্বোনারী বলা হত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কার্বোনারীদের চেষ্টায় ইটালীতে বিদ্রোহ হলে অস্ট্রিয়া তা দমন করে।

ইটালীর জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রাণপুরুষ হলেন যোসেফ ম্যাৎসিনি। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জেনোয়া শহরে এক চিকিৎসকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কার্বোনারী-দলে যোগ দিয়ে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কারাবরণ

করেন। কার্বোনারীদের কার্যধারায় বিরক্ত হয়ে তিনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'নব্য ইটালী' নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। তিনি বলতেন, স্বাধীনতার পর ইটালী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীতে দুই ধারার আন্দোলন শুরু হয়—(১) ঐক্য আন্দোলন; এবং (২) জনগণের অধিকারের আন্দোলন। পিড্‌মণ্টের রাজা চার্লস অ্যাল্‌বার্ট অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। ম্যাৎসিনি ও তাঁর সহকারী গ্যারিবল্ডী রোম দখল করে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার স্থাপন করেন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের আদর্শে ফরাসী সৈন্যবাহিনী রোমে পোপের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আন্দোলন বিফল হলেও ইটালীয়ানদের মানসিক ঐক্য সম্পূর্ণ হয়।



যোসেফ ম্যাৎসিনি

ম্যাৎসিনির আরাদ্ধ কাজ সম্পূর্ণ করেন কাউণ্ট কাভুর। পিড্‌মণ্টের এক অভিজাত পরিবারে কাভুর ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পিড্‌মণ্ট সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি বুঝেছিলেন ইটালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করতে বিদেশী সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শুরু হলে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধশেষে প্যারিস-সম্মেলনে তিনি ইটালীর দুর্দশার কথা তুলে ধরেন। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ইটালীর সমস্যার প্রতি সহানুভূতি দেখান ও কাভুরের সঙ্গে এক গোপন-চুক্তি করেন। এই



কাউণ্ট কাভুর

চুক্তিতে ফ্রান্স অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে কাভুরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। চুক্তির পর কাভুর যুদ্ধ-প্রস্তুতি আরম্ভ করলে অষ্ট্রিয়া কাভুরকে সৈন্যদল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য চরমপত্র দিল। কাভুর চরমপত্র অগ্রাহ্য করলে যুদ্ধ শুরু হয়। ফ্রান্স পিড্মণ্টের পক্ষে যোগ দেয় ও সম্মিলিত বাহিনী অষ্ট্রিয়াকে পরাজিত করে লম্বার্ডি দখল করে। তৃতীয় নেপোলিয়ন হঠাৎ যুদ্ধ অসম্পূর্ণ রেখে অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ভিল্লাফ্রাঙ্কার চুক্তি করলে পিড্মণ্ট লম্বার্ডি ও মিলান পায়। কাভুর এই সন্ধিতে বিরক্ত হয়ে পদত্যাগ করেন।

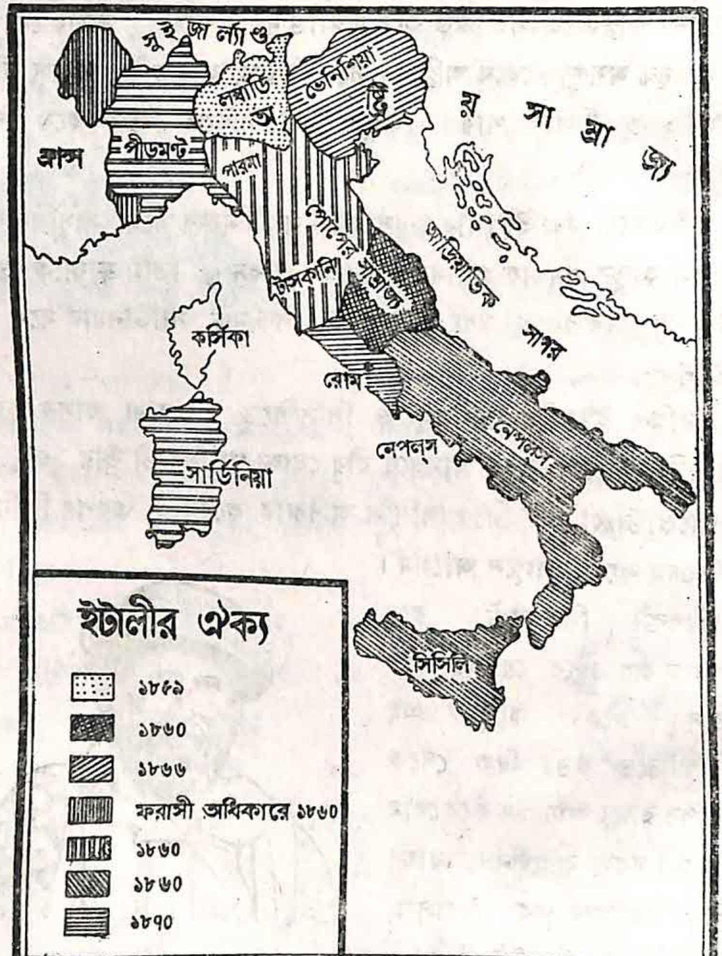
ইতিমধ্যে মধ্য ইটালীর জনসাধারণ সার্ডিনিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির প্রস্তাব করলে কাভুর পুনরায় প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্সকে স্যাভয় ও নীস্ দেওয়ার বদলে মধ্য ইটালীকে পিড্মণ্ট সার্ডিনিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করেন।

দক্ষিণ ইটালীর নেপল্স্ ও সিসিলিতে বুঁরবোরা শাসন করতেন। সিসিলির অধিবাসীদের আমন্ত্রণে বীর যোদ্ধা গ্যারিবল্ডী তাঁর এক হাজার 'লালকোর্তা বাহিনী' নিয়ে সিসিলি অধিকার করেন। এরপর তিনি সমুদ্র অতিক্রম করে নেপল্সে আসেন। গ্যারিবল্ডী পিড্মণ্টের হয়ে নেপল্স্ জয় করে রোমের দিকে অগ্রসর হলে কাভুর এই পরিস্থিতিতে উত্তর দিক থেকে পোপের রাজ্য আক্রমণ করে রোম বাদে সব দখল করলেন। রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল্কে নেপল্সে পাঠালেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে রাজা ইম্যানুয়েল্ নেপল্সে উপস্থিত হলে গ্যারিবল্ডী তাঁকে "ইটালীর রাজা" বলে বরণ করেন। কোনও পুরস্কার না নিয়ে গ্যারিবল্ডী তাঁর নিজের কৃষিক্ষেত্রে ফিরে যান।


গ্যারিবল্ডী

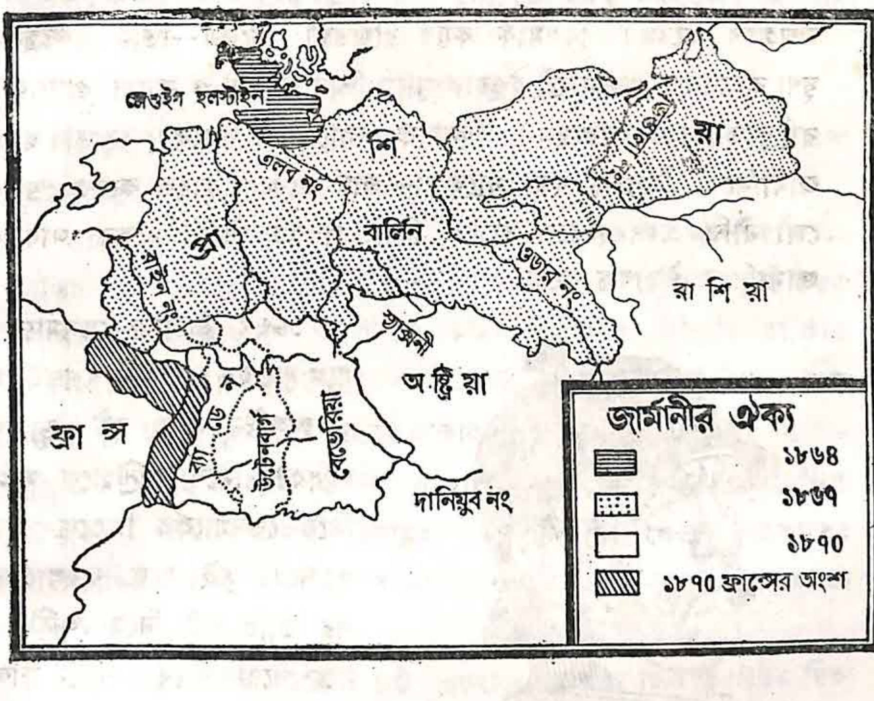
ভেনিস ও রোম তখনও ইটালীর সঙ্গে যুক্ত হয়নি। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে প্রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেয় ও যুদ্ধশেষে

ভেনিস লাভ করে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে ফ্রান্স রোম থেকে সৈন্য সরিয়ে নিলেই ইটালী রোম দখল করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইটালীর ঐক্য সম্পন্ন হয়। ইটালীতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।



জার্মানি : অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার্মানি তিনশ'র বেশী রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তখন থেকে জার্মানি এক ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছিল। নেপোলিয়ন জার্মানিকে ৩৯টি রাষ্ট্রে পরিণত করেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে জার্মানিতে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয়। ভিয়েনা-সম্মেলনে মেটারনিকের চক্রান্তে জার্মানিকে ৩৯টি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়।

জার্মানি বিভক্ত হলেও জাতীয়তাবাদ শিক্ষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবাহিত হতে থাকে। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে "জোল্‌ভারেন" নামে এক শুল্ক-সংঘ স্থাপিত হয়। যে রাষ্ট্র এই সংঘে যোগ দেবে, তাদের শুল্ক দিতে হত না। ক্রমে অস্ট্রিয়া বাদে অন্য সব রাষ্ট্র এই সংঘে যোগ দেয়। অর্থ নৈতিক ঐক্য রাজনৈতিক ঐক্যের পথ প্রস্তুত করে।



১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব জার্মানিতে প্রবলভাবে দেখা দেয়। এই বিপ্লব দুটি খাতে প্রবাহিত হয়েছিল—(১) জার্মানির ঐক্য আন্দোলন; (২) জনগণের অধিকারের জন্য শাসন-সংস্কার। জাতীয়তাবাদী নেতারা নির্বাচনের মাধ্যমে ফ্রাঙ্কফুর্টে পার্লামেণ্ট আহ্বান করেন। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট জার্মানিতে এক নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রাশিয়া-সম্রাট চতুর্থ ফ্রেডারিককে জার্মানির সম্রাটের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করা হলে, অস্ট্রিয়ার ভয়ে তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার বিরোধিতায় ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট ব্যর্থ হয়।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন প্রথম উইলিয়াম। তিনি প্রাশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে নতুনভাবে তৈরি করতে চাইলে প্রাশিয়ার পার্লামেণ্ট বাধা দেয়। ফলে প্রাশিয়ায় এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হল। এই অবস্থা অবসানের জন্য তিনি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে **অটোভন বিসমার্ক**কে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করেন।

বিসমার্ক ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাডেনবার্গের এক অভিজাত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিসমার্ক কট্টর রাজতন্ত্রী ছিলেন--তিনি গণতন্ত্রকে ঘৃণা করতেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে তিনি রাশিয়া ও ফ্রান্সে প্রাশিয়ার রাষ্ট্রদূতের কাজ করেছেন। বিসমার্ক পার্লামেণ্টকে বললেন, বক্তৃতার দ্বারা জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে না—জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করতে রক্ত ও লৌহনীতি গ্রহণ করতে হবে। তিনি পরপর তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন।


বিসমার্ক

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। তিনি শ্লেজউইগ ও হলেস্টিন নামে দুটি ডাচির অধিকার নিয়ে অস্ট্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর ডাচি দুটি নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বিরোধ বাধে। তিনি ফ্রান্স ও রাশিয়াকে নিরপেক্ষ করে ও ইটালীকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নামেন (১৮৬৬ খ্রীঃ)। সাত সপ্তাহের যুদ্ধে স্যাডোয়ায় অস্ট্রিয়া সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধের পর বিসমার্ক মেইন নদীর উত্তরের জার্মান রাজ্যগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে প্রাশিয়ার নেতৃত্বে উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘ গঠন করেন।

বিসমার্ক জানতেন এরপর যুদ্ধ হবে ফ্রান্সের সঙ্গে। দক্ষিণ জার্মানির রক্ষাকর্তা ছিল ফ্রান্স। স্যাডোয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ফ্রান্স নিজের

পরাজয় বলে মনে করে। ফ্রান্সের সম্রাট যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। স্পেনের সিংহাসনে প্রাশিয়ার রাজবংশের লিওপোল্ডকে বসানোর জন্য স্পেনের আমন্ত্রণ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এই প্রশ্নে প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ শুরু হয়। ফ্রান্স. সেডানের যুদ্ধে পরাজিত হল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারি ভার্সাই রাজপ্রাসাদে রাজা উইলিয়াম সমগ্র জার্মানির সম্রাট বলে ঘোষিত হন। এইভাবে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়।

(গ) আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে এক গৃহযুদ্ধ হয়। নানা কারণে এই গৃহযুদ্ধ হয়েছিল।

আমেরিকার উত্তরের রাজ্যগুলি দক্ষিণের রাজ্যগুলি অপেক্ষা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত ছিল। স্বাধীনতা-যুদ্ধে উত্তর অঞ্চলই নেতৃত্ব করেছিল ও পরপর ক'জন রাষ্ট্রপতি উত্তরের রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের কর্মচারীদের মধ্যেও বেশির ভাগ ছিল উত্তরের। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে উত্তরের প্রভাব ছিল বেশি। দক্ষিণের রাজ্যগুলি উত্তরের এই প্রাধান্য সহ্য করতে পারত না এ ছাড়া রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পার্থক্য ছিল। উত্তরের রাজ্যগুলি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্যবৃদ্ধির পক্ষে, অন্যদিকে দক্ষিণের অঞ্চল ছিল রাজ্যগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও দুটি অঞ্চলের পার্থক্য ছিল। উত্তর দিক ছিল শিল্পপ্রধান ও দক্ষিণ দিক ছিল কৃষিপ্রধান। উত্তরের তৈরী জিনিসের উপর দক্ষিণের মানুষকে নির্ভর করতে হত। এইসব জিনিসের উপর আমদানি-শুল্ক বসালে দক্ষিণে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই শুল্কের প্রশ্নে দক্ষিণ অঞ্চল এক পৃথক যুক্তরাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

আমেরিকার উত্তর অঞ্চল শিল্পপ্রধান হওয়ায় স্বাধীন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। দক্ষিণের রাজ্যগুলি কৃষিপ্রধান হওয়ায় ক্রীতদাস নিয়োগ লাভজনক ছিল। উত্তরের রাজ্যগুলিতে ক্রীতদাস-প্রথা বিলুপ্ত হলেও দক্ষিণে এই প্রথা চালু ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বস্ত্রশিল্পে উন্নত হলে

দক্ষিণের তুলোর চাষ লাভজনক হয়ে ওঠে। এইজন্যই দাক্ষণের রাজ্যগুলি ক্রীতদাস-প্রথা বজায় রাখার জন্য বদ্ধপরিকর হয়।

আব্রাহাম লিঙ্কন ছিলেন সবার সমান অধিকারে বিশ্বাসী। তিনি রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত হলে দক্ষিণের রাজ্যগুলির ভয় হল যে, তিনি ক্রীতদাস-প্রথা বিলোপ করবেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচন দক্ষিণের রাজ্যগুলির পছন্দ হল না। দক্ষিণের সাউথ ক্যারোলিনার নেতৃত্বে জর্জিয়া, মিসিসিপি, ফ্লোরিডা, আলবামা, লুইসিয়ানা, টেক্সাস —এই ছ'টি রাজ্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক পৃথক যুক্তরাজ্য গঠন করল ও পৃথক পতাকা গ্রহণ করল। দক্ষিণের রাজ্যগুলি ফোর্ট সামাটার আক্রমণ করলে রাষ্ট্রপতি লিঙ্কন যুদ্ধ ঘোষণা করেন। নর্থ ক্যারোলিনা, ভার্জিনিয়া, টেনেসি, আরাকানসাস্—এই চারটি রাজ্যও দক্ষিণের সঙ্গে যোগ দেয়। ১লা জানুয়ারি, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিঙ্কন দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে ক্রীতদাস-প্রথা বিলোপ করে ঘোষণা জারী করেন। এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের ক্রীতদাসরা আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণের রাজ্যগুলির পরাজয়ের পর এই যুদ্ধের অবসান হয়। তাঁর চেষ্টায় আমেরিকার নিগ্রোবাসীরা সমান অধিকার লাভ করেছিল। তাঁরই প্রয়াসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐক্য বজায় রেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হয়। লিঙ্কন ছিলেন গণতন্ত্রের পূজারী। তিনিই বলেছেন গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের জন্য ও জনগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থা (Government of the people, for the people and by the people)।

(ঘ) ইউরোপের শিল্পোন্নয়ন

শিল্প-বিপ্লবের প্রায় ৫০ বছরের মধ্যে ইংলণ্ড পৃথিবীর অন্যতম শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। ইংলণ্ড থেকে এই বিপ্লব ক্রমশ ইউরোপের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের লিয়ঁ শহরে এক বৃটিশ শিল্পপতি ধাতু-গলাবার ও যুদ্ধের অস্ত্র-নির্মাণের এক কারখানা স্থাপন করে। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে শিল্পোন্নতি ব্যাহত হয়। নেপোলিয়নের সময় ইংলণ্ডের প্রতিপত্তি নষ্ট করার জন্য শিল্পে উন্নতির চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আশানুরূপ

উন্নতি হল না—কারণ প্রয়োজনীয় কয়লা ও লোহার অভাব। নেপোলিয়নের পতনের পর ধীরে ধীরে কয়লা ও লোহার উৎপাদন বাড়ে ও শিল্পে উন্নতি দেখা দেয়। সম্রাট লুই ফিলিপ ও তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে রেলপথ ও বস্ত্রশিল্পে উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। ক্রমে ফ্রান্সে কলকারখানা ও শ্রমিকের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়।

বেলজিয়ামে শিল্প-বিপ্লব ঘটান এক বৃটিশ শিল্পপতি বস্ত্র-বয়ন কারখানা স্থাপন করে। বেলজিয়ামে প্রচুর কয়লা পাওয়া যেত। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত বেলজিয়ামে রেলপথ নির্মিত হয়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বেলজিয়ামে শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়।

প্রচুর লোহা ও কয়লা থাকা সত্ত্বেও জার্মানিতে শিল্প-বিপ্লব দেরিতে ঘটে। রাজনৈতিক অনৈক্য ও উদ্যোগের অভাব এর প্রধান কারণ। ইংলণ্ড থেকে যন্ত্রপাতি আমদানি করে প্রাশিয়ায় কিছু কলকারখানা গড়ে ওঠে। ক্রমে রেলপথের বিস্তার হয়। বহু নদীতে স্টীমার চলতে আরম্ভ করে। লোহা ও কয়লার উৎপাদন বেড়ে যায় ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হলে শিল্পের প্রকৃত প্রসার হয়। এই সময় এত দ্রুত শিল্পে উন্নতি হয় যে, জার্মানি ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে রাশিয়াতে সবশেষে শিল্প-বিপ্লব শুরু হয়। প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও মূলধন ও স্বাধীন শ্রমিকের অভাব ছিল। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে সার্ফ-প্রথা উচ্ছেদের পর শ্রমিকের অভাব মিটে যায়। ফলে রাশিয়াতে শিল্পে উন্নতি হতে থাকে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর এই উন্নতি আরও ত্বরান্বিত হয়। ক্রমে ইউরোপের অন্যান্য দেশেও এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ে।

শিল্প-বিপ্লবের ফল ও শ্রমিকশ্রেণী : শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রচুর জমিহীন, যন্ত্রহীন ও মালিকের ওপর নির্ভরশীল শ্রমিকের উদ্ভব হয়েছিল। কাজের পরিমাণের চেয়ে শ্রমিকের সংখ্যা বেশী থাকায় শ্রমিকেরা যে-কোনো মজুরিতে কাজ নিতে বাধ্য হত। অল্প পারিশ্রমিকে পাওয়া যেত বলে বহুসংখ্যক শিশু ও মহিলাকে কাজে নেওয়া হত। কাজের সময়ের কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ও সময় ছিল না—দিনে বারো বা চৌদ্দ ঘণ্টাও পরিশ্রম করতে হত। কাজের পরিবেশও ছিল নিরাপত্তাহীন ও অস্বাস্থ্যকর।

শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইউরোপে বহু নতুন নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। লিভারপুল, লীডস্, শেফিল্ড, ম্যানচেস্টার, বার্মিংহাম নতুন ভাবে গড়ে ওঠে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত শহর বিপুল আকার ধারণ করে। কিন্তু, শ্রমিকদের বাসস্থানের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না;—কারখানার পাশে অস্বাস্থ্যকর বস্তিতে বাস করত।

প্রথম দিকে শ্রমিকরা এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ায় পথ খুঁজে পায়নি। কিন্তু মানবতাবাদী সংস্কারকের চেষ্টায় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাক্টরী আইনে শিশুদের দিনে ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম সীমাবদ্ধ করা হল। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯ বছরের নীচে শিশুদের কাজে নেওয়া নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তী কালে খনির নীচে শিশু ও মহিলাদের কাজ করা নিষিদ্ধ হয়।

ক্রমে শ্রমিকরা শ্রমিক-সংঘ (Trade Union) তৈরি করে তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে থাকে। ইংলণ্ডে শ্রমিক-সংঘ তৈরি হলে মালিকরা পার্লামেণ্টে আইন করে তা নিষিদ্ধ করে। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমিক-সংঘের বিরুদ্ধে আইন বাতিল হলে বহু শ্রমিক-সংঘ তৈরি হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে জার্মানি ও ফ্রান্সের শ্রমিকরা শ্রমিক-সংঘ গঠনের অধিকার পায়।

শিল্পপতিরা সহসা প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে ওঠেন ও তাঁদের কার্যকলাপে যাতে কোন দিক থেকে বাধা না আসে, তার জন্য অবাধ শিল্প-বাণিজ্য-নীতি প্রচার করতে থাকেন। মূলধনী ব্যবস্থা ও অবাধ নীতিকে সব থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা জানায় সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রীরা রাষ্ট্রের সম্পদ সমভাবে বণ্টনের কথা বলতেন। ইংলণ্ডের রবার্ট ওয়েন কাজের সময় কমিয়ে, শিশু ও মহিলাদের কাজে না নিয়ে, স্বাস্থ্যের পরিবেশ তৈরি করে, মূলধনী ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করেন। ফরাসী সমাজতান্ত্রিক সেণ্ট সাইমন, ফুরিয়ার, প্রুঁধো ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে আক্রমণ করেছেন। তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে চুরি বলে অভিহিত করে তার বিলুপ্তি দাবি করেছেন।

বৈজ্ঞানিক ভাবে সমাজতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন **কার্ল মার্কস** ও **ফ্রেডারিক এ্যাঙ্গেলস্**। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এ্যাঙ্গেলস্ রচিত ও ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো"-তে এই ব্যাখ্যা পাওয়া

যায়। তিনি মূলধনী ব্যবস্থাকে দাস-প্রথা, সামন্ততন্ত্র ইত্যাদি অন্যান্য ব্যবস্থার মত একটি ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, অন্যান্য ব্যবস্থার মত এই ব্যবস্থারও অবসান হবে। তাঁর সময়ে মূলধনী ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করে তিনি বলেছেন যে, এই ব্যবস্থার বিপরীত গুণগুলিই এই ব্যবস্থাকে পরে ধ্বংস করবে। তাঁর আবেদন ছিল মূলত শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি। তিনি বিশ্বাস করতেন, শ্রমিকরাই মূলধন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি শ্রমিকশ্রেণীর জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি করেন। 'দাস ক্যাপিটাল' বইয়ে তিনি তাঁর মতকে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।


কার্ল মার্কস্

প্রশ্নাবলী

১। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি ভিয়েনাতে সম্মিলিত হয় কেন? ভিয়েনা-সম্মেলন সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। ১৮১৫ খ্রী: থেকে ১৮৫০ খ্রী: পর্যন্ত সময়কে 'মেটারনিকের যুগ' বলা হয় কেন?

৩। ম্যাৎসিনি কে? ইটালীর ঐক্য-আন্দোলনে ম্যাৎসিনির কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। কাভুর কে ছিলেন? ইটালীর ঐক্য-আন্দোলনে কাভুরের ভূমিকা আলোচনা কর।

৫। জার্মানীর ঐক্য-আন্দোলনের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ। বিসমার্ক কে ছিলেন? জার্মানীর ঐক্য-আন্দোলনে বিসমার্কের অবদান আলোচনা কর।

৬। কি কি কারণে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ হয় আলোচনা কর।

৭। আব্রাহাম লিঙ্কন কত খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট-পদে নির্বাচিত হন? আমেরিকার স্বাধীনতা-আন্দোলনে তাঁর অবদান আলোচনা কর।

৮। শিল্প-বিপ্লবের যুগে ইউরোপের শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক আলোচনা কর।

৯। কার্ল মার্কস কে ছিলেন? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১০। সমাজতন্ত্রবাদ কি? ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভবের ইতিহাস বর্ণনা কর।

১১। ইউরোপে শিল্প-বিপ্লবের অগ্রগতি বর্ণনা কর। এই বিপ্লবের ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর।

———

১০

চীন ও জাপান
(China and Japan)

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনের ঘটনা-প্রবাহ

ভারতবর্ষের পরেই পাশ্চাত্য দেশসমূহের দৃষ্টি পড়ে চীনের দিকে। বহুকাল পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে চীনের কোনও সম্পর্ক ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কো পোলোর ভ্রমণবিবরণ পড়ে ইউরোপীয়রা চীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। চীনের মাঞ্চুবংশীয় সম্রাট চীনের ভিতরে বিদেশী জাতির প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। কেবলমাত্র ক্যান্টন বন্দরটি বিদেশী ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইংলণ্ড চীনে প্রবেশের জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখায়। ইংরেজরা ভারত থেকে আফিম নিয়ে চীনে বিক্রি করত। চীন-সরকার আফিম খাওয়ার কু-অভ্যাস থেকে চীনাদের রক্ষার জন্য চীনদেশে আফিমের ব্যবসা বন্ধ করে দেন। কিন্তু ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বেআইনী ভাবে এই ব্যবসা চালিয়ে যায়। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চীন-সরকার 'লীন' নামে এক কর্মচারীকে এই ব্যবসা দমনের ভার দিলে, লীন ২০ হাজার বাক্স বেআইনী আফিম ধরে পুড়িয়ে ফেলেন। এর ফলে ইংরেজ ও চীনাদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়। ক্যান্টন নদীর মোহনায় বৃটিশ জাহাজ চীনা জাহাজের ওপর গুলিবর্ষণ করলে 'প্রথম অহিফেনের যুদ্ধ' শুরু হয় (১৮৩৯-৪২ খ্রীঃ)। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চীন নান্‌কিং-এর সন্ধিতে হংকং বন্দরটি ইংরেজদের ছেড়ে দেয় ও আরও চারটি বন্দর উন্মুক্ত করতে বাধ্য হয়।

প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধের পর চীনের সামরিক দুর্বলতার সুযোগে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ নানকিং সন্ধিতে উন্মুক্ত পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করার অধিকার আদায় করল।

কয়েক বছর পরে চীন সরকার একজন ফরাসী ধর্মযাজককে বিরূপ আচরণের জন্য প্রাণদণ্ড দিলে ফ্রান্স চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

চীন সরকার চোরাইচালান-বোঝাই ব্রিটিশ পতাকাবাহী একটি চীনা জাহাজ আটক করলে ইংরেজরাও যুদ্ধ ঘোষণা করে। চীন পুনরায় পরাজিত হয়ে টিয়েন্‌সিনের সন্ধি (১৮৫৮ খ্রীঃ) করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধিতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করে ও আরও এগারোটি বন্দর উন্মুক্ত হয়। স্থির হল যদি কোনও বিদেশী চীনে অপরাধ করে, তবে তার বিচার হবে তার দেশীয় আদালতে, চীনের কোনও আদালতে নয়। এই অধিকারকে অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার বলে। বিদেশী রাষ্ট্রগুলি এই অধিকার লাভ করল।

দক্ষিণ দিকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি প্রবেশ করলে উত্তর দিকে প্রতিবেশী রাশিয়া অগ্রসর হল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনের সঙ্গে চুক্তি করে রাশিয়া চীনের মোঙ্গলিয়া থেকে আমূর নদী পর্যন্ত ভূ-ভাগ দখল করে নেয়। ব্লাডিভোস্টক বন্দর থেকে সরাসরি রাশিয়ার সেণ্ট পিটার্সবার্গ পর্যন্ত রেলপথ স্থাপিত হয়। জাপান শক্তিশালী হয়ে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরমোজা আক্রমণ করে লিন্‌কিন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। জাপান কোরিয়াতে হস্তক্ষেপ করলে ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধ হয়। চীন পরাজিত হয়ে সিমনোসেকির সন্ধিতে পোর্টআর্থার সহ লিয়াওটুং উপদ্বীপ, ফরমোজা দ্বীপ জাপানকে দিতে বাধ্য হয়। এরপর ইউরোপীয় দেশগুলি চীনকে টুকরো টুকরো করে নিতে শুরু করে। সিমনোসেকির সন্ধির পর রাশিয়া, জার্মানি ও ফ্রান্স হস্তক্ষেপ করে জাপানকে লিয়াওটুং ও পোর্টআর্থার ত্যাগ করতে বাধ্য করে। রাশিয়া চীনের কাছ থেকে মাঞ্চুরিয়ায় পূর্ব-চীন রেলপথ স্থাপনের অধিকার পায়। চীন রাশিয়ার সঙ্গে ১৫ বছরের পরস্পরের রক্ষার চুক্তি করে। ফলে, রাশিয়া যুদ্ধের প্রয়োজনে পোর্টআর্থার ও লিয়াওটুং বন্দর ব্যবহারের অধিকার পায়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সাণ্টুং প্রদেশে দুজন জার্মান ধর্মযাজক নিহত হলে জার্মান কিয়াওচাউ-এ রণতরী পাঠায়। চীন জার্মানিকে কিয়াওচাউ বন্দর ৯৯ বছর ব্যবহারের অধিকার দেয়। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া পোর্টআর্থার ও ডারিয়েন বন্দর ২৫ বছরের জন্যদখল করে। ঐ একই বছর ফ্রান্স কোয়াংচাউআন লাভ করল। ইংলণ্ডের চাপে চীন ওয়েহাইওয়ে বন্দর ও হংকং-এর বিপরীত দিকে মূল ভূখণ্ডের কিছু

অঞ্চল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে চীন বিদেশীদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে ভাগ হয়ে যায়। চীনের বাজারের প্রতি আমেরিকার লক্ষ্য ছিল। নিজের দেশের স্বার্থের কথা চিন্তা করে আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিব হে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে "উন্মুক্ত দ্বার" নীতি ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে,—চীনে কোনও শক্তি চুক্তিযুক্ত বন্দরগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। প্রতিটি দেশ প্রতিটি বন্দর ব্যবহার করতে পারবে। চীনের বাণিজ্য-শুল্ক তুলবেন চীন সরকার প্রভাবিত এলাকার বন্দরে কোনও দেশ অন্য দেশকে বন্দর ও রেলপথের জন্য বেশী কর দিতে বাধ্য করবে না। রাশিয়া বাদে অন্যান্য বিদেশী দেশগুলি এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে চীন সাময়িক ভাবে অবলুপ্তি থেকে রেহাই পায়।

(খ) চীনের প্রতিক্রিয়া

তাইপিং বিদ্রোহ: চীনে বিদেশীদের আগমনে ও বসতি স্থাপনে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। চীনের অধিবাসীরা পাশ্চাত্য রীতিনীতি, ধর্মকর্ম, সভ্যতা-সংস্কৃতি ভালো চোখে দেখত না। এর জন্যই ১৮৫০ খ্রীঃ চীনে 'তাইপিং বিদ্রোহ' দেখা দিল। তাইপিং কথার অর্থ 'পবিত্র রাজ্য'। হুং-সিও-চুয়ান নামে এক চীনা পণ্ডিত এই বিপ্লবের প্রচারক। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি, ইয়াংসি নদীতে বন্যা, দারিদ্র্য, দূর্নীতিপূর্ণ শাসন ও প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধে চীনের পরাজয়—এই বিপ্লবের ক্ষেত্র তৈরি করে। বিদেশীরা চীনে রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা করছে, সুতরাং মাঞ্চুদের সরিয়ে তারা নতুন রাষ্ট্র-গঠনের কথা চিন্তা করেছিল। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নিয়ে তাইপিং সেনাদল গঠিত হয়। ১৬টি প্রদেশে এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। অধিকৃত অঞ্চলে তাইপিং শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঞ্চু সরকার বিদেশীদের সাহায্যে কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করে। এই বিদ্রোহে চীনের জাতীয় সম্পত্তির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়।

শত দিনের সংস্কার (১৮৯৮ খ্রীঃ): বিশাল চীন ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ছোট প্রতিবেশী জাপানের কাছে পরাজিত হয়। চীনের সবাই বুঝলেন যে, সমাজ ও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন না করলে চীনকে শক্তিশালী করা যাবে না। এই সময় কাং-ইউ-ওয়ে নামে এক দেশপ্রেমিক ও চিন্তাবিদ্ সম্রাটের কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিতে আধুনিক সংস্কারের দাবি জানালেন।

চীন-সম্রাট কোয়াংসু একশ' দিন ধরে নানা আদেশনামায় কতকগুলি সংস্কার কার্যকর করার চেষ্টা করেন। পুরানো পরিষদগুলি ভেঙ্গে আধুনিক মন্ত্রি-সভায় বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিযুক্ত হয়। সম্রাট ও জনগণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য পার্লামেণ্ট বা প্রতিনিধি-সভা আহ্বানের কথা বলা হল। স্থানীয় সমিতির হাতে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হল। পুরানো পরীক্ষা-ব্যবস্থা বাতিল করা হল ও আধুনিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হল। সেনাবাহিনীকে আধুনিকভাবে সুসজ্জিত করা হল। এইসব সংস্কারের ফলে প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়। সম্রাজ্ঞী জুসির এইসব সংস্কার পছন্দ হল না। প্রাচীনপন্থীরা জুসির সাহায্যে কোয়াংসুকে বন্দী করে। সমস্ত সংস্কার সম্রাজ্ঞীর আদেশে বাতিল হয়ে যায়। এই সংস্কারগুলি এক শ' দিন ধরে চলেছিল (১১ই জুন—২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ খ্রীঃ) বলে একে 'শত দিনের সংস্কার' বলে।

বক্সার বিদ্রোহ ঃ চীন-জাপান যুদ্ধে চীনের শোচনীয় পরাজয়, বিদেশী শক্তিগুলির চীনকে খণ্ড খণ্ড করে নেওয়া ও পাশ্চাত্য প্রভাবে চীনের সমাজ ও সভ্যতা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হলে চীনে 'বক্সার বিদ্রোহ' দেখা দেয় (১৮৯৯ খ্রীঃ)। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে দলে দলে চীনারা খ্রীষ্টান ধর্মগ্রহণ করতে শুরু করে। ইয়াংসি নদীর বন্যায় লক্ষ লক্ষ চীনা গৃহ-হারা হয়ে পড়ে ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে চীনারা এর জন্য বিদেশীদের দায়ী করে। চীনের বাজার সস্তা বিদেশী জিনিসে ছেয়ে গেলে চীনের তাঁতী ও কারিগরদের জিনিস বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। জীবনধারণের পথ না পেয়ে এইসব লোকও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চীনে হো-চুয়ান বা মুষ্টিযোদ্ধাদের এক গুপ্ত-সমিতি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আইন ও শৃঙ্খলার সঙ্গে এরা মুষ্টিযুদ্ধ করত বলে বিদেশী লেখকরা এদের 'বক্সার' আখ্যা দেয়। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এদের দাবি ছিল—"চিং বা মাঞ্চুদের উচ্ছেদ কর ও মিং বা বিদেশীদের বিতাড়িত কর।" সম্রাজ্ঞী জুসি বক্সারদের সমর্থন করেন ও তাদের বিদেশীদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেন। উত্তর চীনে মাঞ্চু সরকার বক্সারদের সঙ্গে বিদেশীদের বিরোধিতা করে; কিন্তু দক্ষিণ চীনে বিদেশীদের সমর্থন করে। বক্সাররা বহু খ্রীষ্টানকে হত্যা করে। বহু খ্রীষ্টান মিশনারীও এদের হাতে নিহত হয়।

তারা পিকিং দখল করে বিদেশী দূতবাসগুলিকে অবরোধ করে। অবশেষে আটটি ইউরোপীয় দেশের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী পিকিং-এ প্রবেশ ক'রে বক্সারদের দমন করে।

১৯০২-১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার: 'বক্সার বিদ্রোহ' ব্যর্থ হলে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আর সন্দেহ রইল না। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশীদের হাতে মাঞ্চু সরকারের অপমানে সম্রাজ্ঞী জুসি বুঝলেন যে, আমূল সংস্কার না করলে মাঞ্চুবংশকে টিকিয়ে রাখা যাবে না। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্য-বাহিনীকে আধুনিক ভাবে গড়ে তোলার নির্দেশ জারী করা হয়। শিক্ষা-বিভাগেও সংস্কার করা হল। চীনাদের বিদেশে গিয়ে আধুনিক শিক্ষা-গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষামন্ত্রক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে পুরানো সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-ব্যবস্থা বাতিল করে আধুনিক পরীক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। লিয়াং-লি-চাও নামে এক পণ্ডিতের নেতৃত্বে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার আন্দোলন শুরু হল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে এক সামরিক সংবিধান গ্রহণ করা হল। কিন্তু ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী জুসি ও সম্রাট কোয়াংসু মারা গেলে চীনে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হল।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লব ও সান্-ইয়াৎ-সেন: ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী জুসি ও সম্রাট কোয়াংসুর মৃত্যুতে সংস্কারের আশা নির্মূল হয়ে যায়। জাপান চীনা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-ঘাঁটিতে পরিণত হয়। ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন এইসব জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব দেন। দেশপ্রেমই ডাঃ সান্‌কে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাঞ্চু সরকারকে উচ্ছেদের জন্য বারবার বিদ্রোহ করেন। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি চীন থেকে পালিয়ে জাপানে গিয়ে আশ্রয় নেন। তিনি সান্-মিন্-চু-আই নামে তিনটি নীতি ঘোষণা করেন। (১) জনগনের জীবিকার ব্যবস্থা করা; (২) জনগণের জাতীয়তাবাদ ও (৩) গণতন্ত্র। জাপানে বসবাসকারী জাতীয়তাবাদী



সান্-ইয়াৎ-সেন

চীনাদের নিয়ে তিনি টুং-মেং-হুই বা সম্মিলিত সংঘ নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। মাঞ্চু সরকার চীনের রেলপথ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনার চেষ্টা করলে প্রাদেশিক সভাগুলি বাধা দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশগুলিতে অত্যাচার শুরু করলে সে-চুয়ান প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে টুং-মেং-হুই দল ডাঃ সানের নির্দেশে সরকারী সেনাদলের একাংশকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। উচ্চাং-এর সেনাদল ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে এই বিদ্রোহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। টুং-মেং-হুই দল নান্‌কিং দখল করে সেখানে বিকল্প সরকার স্থাপন করল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনের নাবালক সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করলে বিপ্লব জয়যুক্ত হয়। সমগ্র চীনে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হয় ও সান্‌-ইয়াৎ-সেন প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু মাঞ্চু সরকারের সেনাপতি ইউ-য়ান্‌-সিকাই উত্তর চীনে এক পৃথক রাজ্য স্থাপন করলেন। দেশের ঐক্যের জন্য দু'দলের মধ্যে আপস হল। ডাঃ সান্‌ রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করলে ইউ-য়ান্‌-সিকাই রাষ্ট্রপতি হলেন।

(গ) জাপান

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃহৎ শক্তি হিসেবে জাপানের অভ্যুদয়ঃ এশিয়ার সুদূর পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগরের ছ'টি বড় দ্বীপ ও প্রায় চার হাজার ক্ষুদ্র দ্বীপাঞ্চল নিয়ে জাপান গঠিত। অধিবাসীরা জাপানকে "নিপ্পন" বা সূর্যোদয়ের দেশ বলত। চীনের মত জাপানেরও এক সম্রাট ছিলেন—তাঁকে "মিকাডো" (সূর্যের সন্তান) বলা হত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সম্রাট নামেমাত্র শাসন করতেন। 'শোগুণ' নামে উচ্চপদস্থ কর্মচারী বংশানুক্রমিক ভাবে দেশের শাসন পরিচালনা করতেন।

জাপান পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জাপান বিদেশীদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেনি। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার কমোডর পেরী মার্কিন নৌবহর নিয়ে জাপানে হানা দেন। আর তখন থেকেই বিদেশীদের সঙ্গে জাপানের সংযোগ স্থাপিত হল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিতে কমোডর পেরী দু'টি বন্দরে ব্যবসা করার অধিকার পেলেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ বাণিজ্যের জন্য জাপানের সঙ্গে চুক্তি করতে শুরু করল। বিদেশী জাতিরা জাপানে নানা

চুক্তির মাধ্যমে অতিরাষ্ট্রিক অধিকার আদায় করল। যখন বিদেশীরা এইভাবে জাপানকে নানা সন্ধিতে আবদ্ধ করে ফেলল, তখন থেকেই জাপানীরা শোগুণের শাসনব্যবস্থার বিরোধী হয়ে উঠল। জাপানের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বিদেশীদের রীতি অনুধাবন করে জাপানেও তা প্রচলিত করতে উদ্যোগী হলেন। দেশের দাইমো বা সামন্তরা বুঝলেন শোগুণকে সরিয়ে মিকাডোকে শাসন পরিচালনার ভার দিলেই জাপানে বিদেশী প্রভাব কমবে ও দেশের উন্নতি হবে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশের দাইমোরা এক রক্তপাতহীন বিপ্লবের মাধ্যমে শোগুণকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করল ও প্রগতিশীল মিকাডো মাৎসুহিতোর হাতে ক্ষমতা অর্পণ করল। এই ঘটনাকে 'মেইজি ক্ষমতা'র পুঃনপ্রতিষ্ঠা বলা হয়।

জাপানের পাশ্চাত্ত্যীকরণ ঃ ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর জাপানের জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন শুরু হল। কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সমাজ—সর্বক্ষেত্রে জাপান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অনুকরণে এক বিরাট উন্নয়নের পথে অগ্রসর হল। সামন্ততন্ত্র বিলোপ পেল। যে অভিজাতরা রক্তপাতহীন বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরাই স্বেচ্ছায় সব অধিকার ত্যাগ করলেন। তাঁদের দেখে অন্যান্য সামন্তরা জমিদারি ত্যাগ করে সাধারণ শ্রেণীতে পরিণত হলেন। সামুরাইরাও তাঁদের অধিকার ত্যাগ করলেন। এইভাবে জাপানে সামন্তব্যবস্থা বিলুপ্ত হল। সম্রাট ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এক সরকারী ঘোষণা জারী করে সামন্ত-প্রথার অবসান ঘটান। সামন্ত-ব্যবস্থার স্থান নেয় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা। এরপর আরম্ভ হয় জাপানকে পাশ্চাত্ত্যীকরণ। জাপান পাশ্চাত্ত্যদেশগুলির অনুকরণে শিক্ষা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলে। এমনভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোল যে, অল্পদিনের মধ্যেই জাপান পৃথিবীর শ্রদ্ধার আসন লাভ করল। এত দ্রুত পরিবর্তন বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এক নতুন সংবিধান গ্রহণ করা হয়। প্রাশিয়ার অনুকরণে এই সংবিধান রচিত হল। নতুন সংবিধান অনুযায়ী সম্রাট সব ক্ষমতার অধিকারী হলেন। অভিজাত ও জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত "ডায়েট" বা প্রতিনিধি-সভা সম্রাটকে শাসনকার্যে সাহায্য করবে। মন্ত্রীরা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন ও সম্রাটের প্রতিই তাঁরা দায়িত্বশীল থাকবেন। ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার অনুসরণে নতুন আইনবিধি

তৈরি হল। জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ করে নারী ও পুরুষের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। ইংরেজী ভাষা আবশ্যক করা হয়। ইউরোপের অনুকরণে নতুন ক্যালেণ্ডার বা বর্ষপঞ্জী গ্রহণ করা হয়। সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। প্রাশিয়ার অনুকরণে স্থল-সেনাবাহিনী ও ইংলণ্ডের অনুকরণে নৌবাহিনী গঠন করা হল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন করে জাপানকে আধুনিক করে তোলা হয়। দেশের সর্বত্র রেলপথ, ডাক ও তার ব্যবস্থা, জাহাজ-নির্মাণ কারখানা ও বন্দর স্থাপন করা হয়। জাপান তার নিজের অস্তিত্বকে বজায় রেখেই সমস্ত সংস্কার করে। এই সংস্কারগুলির ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই জাপান প্রাচ্যে এক শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হয়।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদঃ মাত্র ২৫ বছরের মধ্যে জাপান এক শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে ওঠে। শক্তিশালী হয়েই জাপান পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে অসমচুক্তিগুলি পরিবর্তন করতে উৎসুক হয়। বিদেশী শক্তিগুলি জাপানের আবেদনে কর্ণপাত না করলে জাপান বুঝল যুদ্ধ করে তার শক্তি না দেখালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার স্থান নেই। অর্থনৈতিক কারণেও জাপানকে সাম্যবাদ-নীতি গ্রহণ করতে হয়। কাঁচামাল সংগ্রহ ও বাড়তি জনসংখ্যার জন্য স্থান জোগাড় করার জন্য জাপানের উপনিবেশ বিস্তারের প্রয়োজন হয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কিউরাইল দ্বীপ নিজের দখলে নিয়ে আসে। কাঁচামাল সংগ্রহ ও বাড়তি জনসংখ্যার বসতির জন্য জাপান কোরিয়ার দিকে দৃষ্টি দেয়। কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থানও জাপানকে কোরিয়ার দিকে আকর্ষণ করে। কোরিয়া ছিল চীন, জাপান ও রাশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত। কোনও বড় শক্তি কোরিয়া দখল করলে জাপানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কোরিয়ায় চীনের প্রভাব খুব একটা না থাকলেও চীন কোরিয়াকে করদ-রাজ্য মনে করত। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়ার সঙ্গে এক বাণিজ্য-চুক্তি করে। এই চুক্তিতে চীন খুব বিরক্ত হয় ও এই সময় থেকেই চীন ও জাপানের মধ্যে কোরিয়া নিয়ে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল। চীন ও জাপানের মধ্যে 'লী-ইতো' চুক্তিতে স্থির হয় যে, চীন ও জাপান পরস্পরের অনুমতি ভিন্ন কোরিয়াতে সৈন্য পাঠাবে না। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়াতে এক বিপ্লব ঘটলে চীন

জাপানের বিনা অনুমতিতে সৈন্য পাঠালে চীন-জাপান যুদ্ধের সূচনা হয়। চীন-জাপান যুদ্ধে চীন সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে 'সিনোম-সেকি'র সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধিতে চীন (১) কোরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে, (২) লিয়াওটুং উপদ্বীপ, ফরমোজা দ্বীপ ও পেস্‌কাডোরেস দ্বীপ জাপানকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়; (৩) চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য চারটি বন্দর জাপানীদের কাছে উন্মুক্ত করতে হয়; (৪) প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। বিশাল চীনের পরাজয়ে পশ্চিমী শক্তিরা সজাগ হয় ও জাপান তার অসমচুক্তিগুলি নাকচ করতে সক্ষম হয়।

জাপানকে শক্তিশালী হতে হলে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য ছিল। রাশিয়া জাপানকে সিমোনসেকির সন্ধির ফল ভোগ করতে দেয়নি। রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানির চাপে জাপানকে লিয়াওটুং উপদ্বীপ ও পোর্ট-আর্থার বন্দর ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে রাশিয়া এই দুই স্থান অধিকার করে নেয়। রাশিয়া চীনের মাঞ্চুরিয়ায় প্রভাব বিস্তার করলে জাপান শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে জাপান ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সঙ্গে এক চুক্তি করে। এই সন্ধিতে স্থির হয় যে, যদি একাধিক রাষ্ট্র জাপান বা ইংলণ্ডকে আক্রমণ করে, তবে একে অন্যকে সাহায্য করবে। ইতিমধ্যে রাশিয়া কাঠুরিয়ার ছদ্মবেশে মাঞ্চুরিয়াতে সৈন্য পাঠালে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে শক্তিশালী পশ্চিমী রাষ্ট্র রাশিয়া ক্ষুদ্র জাপানের হাতে পরাজিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'পোর্টস্‌-মাউথের সন্ধিতে' রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসান হয়। জাপান লিয়াওটুং উপদ্বীপ, শাখালিন দ্বীপ ও পোর্টআর্থার বন্দর লাভ করল। এই যুদ্ধের পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কোরিয়া দখল করে নেয়।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাপান তার সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার সুযোগ পায়। ইংলণ্ডের বন্ধু হিসেবে জাপান ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও চীনে জার্মান-অধিকৃত কিয়াওচাউ ও সাণ্টুং প্রদেশ দখল করে নেয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের কাছে "একুশ দফা" দাবি জানিয়ে এক চরমপত্র প্রেরণ করে। দাবিগুলির মধ্যে প্রধান দাবি ছিল চীন জাপানের অনুমতি ভিন্ন তার রাজ্যের কোনও অংশ বিদেশীদের কাছে ছেড়ে দেবে না। চীন সাধারণ-

তন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ইউ-য়ান-সিকাই নিজস্বার্থে জাপানের অধিকাংশ দাবি মেনে নেন।

প্রশ্নাবলী

১। কত খ্রীষ্টাব্দে কার সঙ্গে চীনে আফিমের যুদ্ধ হয়? এই যুদ্ধের ফল কি হয়? কোন্ সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়?

২। চীন-জাপান যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়? কোন্ সন্ধি দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়? এই যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর।

৩ চীন কিভাবে বিদেশীদের প্রভাবাধীন অঞ্চলে বিভক্ত হয় - বর্ণনা কর।

৪। চীনে তাইপিং বিদ্রোহ কেন হয়? 'তাইপিং' কথার অর্থ কি? এই বিপ্লবের প্রচারকের নাম কি?

৫। চীনে এক শ' দিনের সংস্কার কে প্রবর্তন করেন? শেষ পর্যন্ত এই সংস্কারসমূহ কতখানি কার্যকর হয়?

৬। চীনে বক্সার বিদ্রোহ দেখা দেয় কেন? কিভাবে এই যুদ্ধের অবসান হয়? এই বিদ্রোহের পর চীনে কি কি সংস্কার প্রবর্তন করা হয়?

৭। সান্-ইয়াৎ-সেন কে ছিলেন? তাঁর নেতৃত্বে চীনা জনসাধারণের বিদ্রোহ কিভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়?

৮। শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে জাপানের উত্থান সম্বন্ধে যা জান লিখ।

৯। জাপানের পাশ্চাত্তীকরণের বিবরণ দাও।

১০। জাপানের সাম্রাজ্যবাদ-নীতি গ্রহণ করতে হয় কেন? এই নীতি কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হয়?

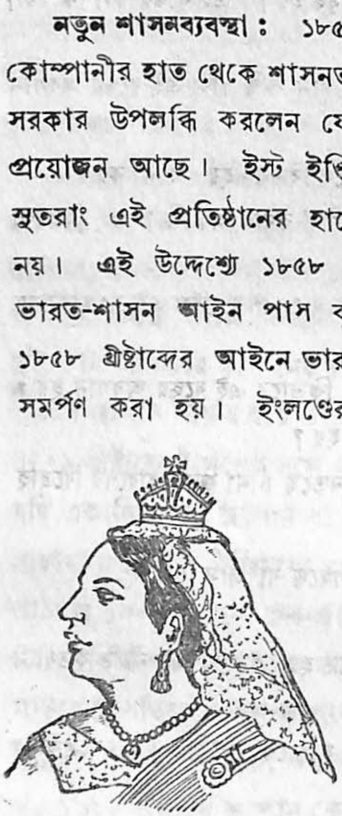
১১। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ কি? এই যুদ্ধে কে পরাজিত হয় এবং কেন? কোন্ সন্ধির দ্বারা ঐ যুদ্ধের অবসান হয়?

১২। রুশ-জাপান যুদ্ধ হয় কেন? এই যুদ্ধে কে জয়লাভ করে? কোন্ সন্ধির দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান হয়?

১১

বৃটিশরাজের অধীনে ভারতবর্ষ, ১৮৫৮-১৯১৪ খ্রীঃ
(India under The Crown, 1858-1914)

নতুন শাসনব্যবস্থা : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার কোম্পানীর হাত থেকে শাসনভার সরাসরি নিজেদের হাতে নেন। বৃটিশ সরকার উপলব্ধি করলেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসনের পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানের হাতে আর ভারতের শাসনভার রাখা যুক্তিযুক্ত নয়। এই উদ্দেশ্যে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগস্ট ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ভারত-শাসন আইন পাস করে কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটায়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আইনে ভারতের শাসনভার মহারানী ভিক্টোরিয়ার হাতে সমর্পণ করা হয়। ইংলণ্ডের রাজা বা রানীর পক্ষ থেকে ভারত-সচিব নামে ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার একজন মন্ত্রীর হাতে ভারত-শাসনের দায়িত্ব দেওয়া হল। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ১৫ জন সদস্যের একটি কাউন্সিল বা পরামর্শ-দাতা-সভা গঠিত হল। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যান্য জরুরী বিষয়ে ভারত-সচিব কাউন্সিলের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারবেন। ভারত-সচিব ও পরামর্শ-দাতা-সভার ব্যয়ভার ভারতের রাজস্ব থেকে করা হবে। ভারতের গভর্নর জেনারেলকে ভাইস্রয় বা রাজপ্রতিনিধি বলা হল। তিনি ভারত-সচিবের নির্দেশে কাজ করবেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, দেশীয় রাজারা এরপর 'দত্তক' গ্রহণ করতে পারবেন ও তাঁদের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিগুলি বৃটিশ সরকার যথাযথ মান্য করে চলবেন। একই সঙ্গে ঘোষণা করা হল যে, বৃটিশ সরকার ভারতে রাজ্য-



মহারানী ভিক্টোরিয়া

বিস্তার-নীতি ত্যাগ করবেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া আশ্বাস দিলেন যে, বৃটিশ সরকার প্রজাকল্যাণ, ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষ নীতি মেনে চলবেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে বৈষম্য দূর করবেন। ভারতীয়দের যোগ্যতা অনুসারে উচ্চপদে নিয়োগের আশ্বাসও দেওয়া হল। এই সঙ্গে আরো ঘোষণা করলেন যে, ভারতীয়দের গোলন্দাজ-বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে না ও ভারতীয় সিপাহীকে সর্বদাই ইংরেজ কর্মচারীর অধীনে থাকতে হবে।

ইংরেজ শক্তির সাম্রাজ্যবিস্তার: ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর মহারানীর ঘোষণা অনুযায়ী ভারতের ভিতরে রাজ্যবিস্তারে ইংরেজরা আগ্রহী হল না। ভারতের অভ্যন্তরে রাজ্যবিস্তার বন্ধ থাকলেও পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত রাজ্যগুলির দ্বারা ইংরেজদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা ছিল। মধ্য এশিয়ায় রাশিয়ার অগ্রগতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে।

লর্ড ক্যানিংয়ের পর লর্ড এল্‌গিন ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হন। পরবর্তী ভাইস্‌রয় লরেন্সের সময় ভুটানের সঙ্গে বিরোধ দেখা দেয়। বৃটিশ দূত এ্যাস্‌লি ইডেনকে অপমান করায় ভুটানে সামরিক অভিযান পাঠান হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভুটানরাজ ইংরেজদের কাছে ডুয়ার্স ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আফগান আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হলে তাঁর ১৬টি পুত্রের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড লরেন্স শের আলীকে স্বীকৃতি দিলেন। কিন্তু তিনি অন্তর্বিরোধে শের আলীকে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন। লরেন্সের নীতি ছিল হস্তক্ষেপ না করা। পরবর্তী ভাইস্‌রয়দ্বয় লর্ড মেয়ো ও লর্ড নর্থব্রুকও একই নীতি গ্রহণ করলেন।

লর্ড ডিস্‌রেলী ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হলে হস্তক্ষেপ না-করার নীতির পরিবর্তন হল। লর্ড লিটন ভাইস্‌রয় হয়ে ভারতে এলেন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। লর্ড লিটনের সময়ে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ শুরু হয়। রুশ প্রতিনিধি কাবুলে আসায় সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যুদ্ধ শুরু হল। এইবারও বৃটিশ রেসিডেন্ট আফগানদের হাতে নিহত হলে বৃটিশ সরকার লিটনকে ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী ভাইস্‌রয় লর্ড রিপন এসে যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে শের

আলীর ভ্রাতুষ্পুত্র আব্‌দার রহমানকে আমীর বলে স্বীকৃতি দেন। ইংরেজদের সঙ্গে আফগানিস্থানের বন্ধুত্বমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। লর্ড ডাফরিনের আমলে ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যায়। লর্ড ল্যান্সডাউনের আমলে আফগানিস্থান ও



ভারতের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত হয়। মার্টিমোর ডুরাণ্ডের নেতৃত্বে এই সীমানা চিহ্নিত হয় বলে একে 'ডুরাণ্ড লাইন' বলে।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীঃ) ভাইস্‌রয় হয়ে আসেন। লর্ড কার্জনের আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে এক নতুন প্রদেশ গঠিত হল। এই সময় আফগানিস্থানের নতুন আমীর হাবিবুল্লার সঙ্গে প্রথমে সম্পর্ক তিক্ত হলেও পরে সম্পর্কের

উন্নতি হয়। লর্ড কার্জনের সময়ে তিব্বতে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি পেলে তিনি 'হাজ্‌বেণ্ড' নামে দূতকে তিব্বতে পাঠান। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজদের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই সন্ধিতে তিব্বত অবাধ বাণিজ্য ও বৃটিশ অনুমতি ছাড়া অন্য দেশকে কোন অধিকার দেবে না,—এত শর্ত স্থির হয়। এইভাবে ভারত ও পার্শ্ববর্তী দেশে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হল।

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার : ইংরেজদের ভারতে আগমনের ফলে এক প্রগতিশীল মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময়ে ভারতে ও বিশেষ করে বাংলাদেশে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। এই নবজাগরণের পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁকে আধুনিক ভারতের জনক বলা হয়। তিনি ছিলেন যুক্তির পূজারী। হিন্দু, মুসলিম ও খ্রীষ্ট ধর্মের ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি বিচার করেন। হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতা, ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের অত্যাচার ও সামাজিক প্রথা তাঁকে কষ্ট দিত। প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি বেদ ও উপনিষদের উপর ভিত্তি করে নিজের ধর্মমত আলোচনার জন্য আত্মীয়-সভা স্থাপন করেন (১৮১৫ খ্রীঃ)। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহন প্রাচ্য বিদ্যায় পারদর্শী হয়েও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। সরকারী সাহায্যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি লর্ড আমহার্স্টকে এক পত্রে রসায়ন, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র শেখাবার জন্য আধুনিক ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। রামমোহনের চেষ্টায় লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে সতীদাহ-নিবারণ আইন কার্যকর হয়। হিন্দু বিধবারা যাতে সম্পত্তির অধিকার পায় ও সমাজে যাতে মেয়েদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়, সেদিকেও তিনি দৃষ্টি দেন। রামমোহনের অসম্পূর্ণ কাজ করার দায়িত্ব নেয় ব্রাহ্মসমাজ। জাতিভেদ-প্রথা দূর করা, ও মেয়েদের—বিশেষ করে বিধবাদের অবস্থার উন্নতিবিধানের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজের দান অপরিসীম।



রাজা রামমোহন রায়

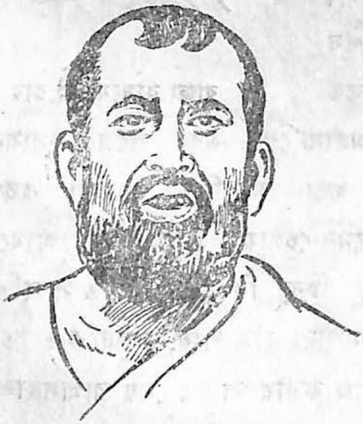
প্রার্থনা-সমাজ : ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব বাংলার সীমা অতিক্রম করে অন্যান্য স্থানেও প্রসারিত হল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে মহাদেব গোবিন্দ রানাডের নেতৃত্বে প্রার্থনা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা-সমাজ হিন্দুধর্মের মধ্যে থেকেই সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়েছিল। জাতিভেদ-প্রথা দূর করা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা-বিবাহ ও সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর উন্নতি করাই ছিল প্রার্থনা-সমাজের কর্মসূচী। রানাডের প্রেরণায় "দাক্ষিণাত্য শিক্ষা-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়।

আর্য-সমাজ : আর্য-সমাজ আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন **দয়ানন্দ সরস্বতী**। তিনি হিন্দুধর্মের কুসংস্কারকে মুক্ত করে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, বাল্য-বিবাহ ও জাতিভেদ অবান্তর ও বর্জনীয়। স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ ও সমুদ্রযাত্রা তিনি সমর্থন করেন। তিনি এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। অহিন্দুরা যাতে হিন্দু-ধর্ম গ্রহণ করতে পারে, সেইজন্য তিনি "শুদ্ধি" অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন।



স্বামী দয়ানন্দ

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ : রামকৃষ্ণদেবের কোনও প্রথা অনুযায়ী



রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব



স্বামী বিবেকানন্দ

শিক্ষা না থাকলেও তিনি সহজ ও সরল ভাষায় বেদান্তের মর্মকে ব্যাখ্যা

করেন। তিনি বলতেন ঈশ্বর এক ও অভিন্ন। তিনি জীবসেবা ও মানবসেবাকে ঈশ্বরের সেবা বলে মনে করতেন। রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তাঁর প্রধান শিষ্য বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো শহরে বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম-মহাসম্মেলনে যোগ দিয়ে ভারতীয় হিন্দুধর্মের কথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। বিবেকানন্দ অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের তীব্র নিন্দা করেন।

থিওসফিক্যাল সোসাইটি : ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানি বেসান্ত এই সোসাইটির নেতৃত্ব নেন। এই আন্দোলন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করলেও শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্মরণীয়। তিনি বেনারসে কেন্দ্রীয় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর চেষ্টায় ভারতীয়দের মধ্যে সচেতনতাবোধ জাগ্রত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : সমাজ-সংস্কারক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম চিরস্মরণীয়। তিনি রক্ষণশীল সমাজের সব বাধা অগ্রাহ্য করে বিধবা-বিবাহের পক্ষে জনমত গঠন করেন। তাঁর প্রভাবে ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা-বিবাহ আইন পাস করেন।

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের বিকাশ : ইংরেজরা ভারতে আসার পর পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। অন্ধ কুসংস্কারের স্থান নেয় যুক্তিনিষ্ঠ বিচার ও চেতনাবোধ। রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের অবদানে বাংলা তথা সারা ভারতে নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ কর্মচারীদের অন্যায়, অবিচার, অবজ্ঞা ও বৈষম্য ভারতীয়দের মধ্যে প্রতিবাদের সাহস ও মনোভাব সৃষ্টি করে। আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, ইটালীর ঐক্য-আন্দোলন ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ, যুক্তিবাদ ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় শিক্ষিত করে তোলে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ভারতের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ হয়। রাজা রামমোহন রায় রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এরপর ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি। এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করা। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয় বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে দুই সমিতি

মিলিত হয়ে বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন নাম নেয়। প্রায় একই সময়ে মাদ্রাজ নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন ও বম্বে-অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতিগুলির লক্ষ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, শাসনকার্যে অধিক পরিমাণে ভারতীয়দের নিয়োগ, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ব্যর্থতার পর বোঝা গেল যে, জমিদারদের হাতে পরিচালিত প্রতিরোধ সফল হওয়া সম্ভব নয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর বৃটিশ শাসন আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সরকারের বহু ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে "দেশীয় সংবাদপত্র আইন" ও ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে "অস্ত্র আইন" পাস করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হল ও অস্ত্র রাখা নিষিদ্ধ করা হল। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার বয়স কমিয়ে দেওয়া হলে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। এইসব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্ব-ভারতীয় আন্দোলন শুরু হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ "ভারত-সভা" নামে এক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ কলকাতায় এক "সর্বভারতীয় সম্মেলন" আহ্বান করেন। এই সম্মেলন অনেক দিক দিয়ে জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি রচনা করে।


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস : রাজনীতি-সচেতন ভারতীয়রা এই সময় এক সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব অনুভব করছিলেন। এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের কাছে এক খোলাচিঠিতে রাজনৈতিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য এক স্থায়ী সংস্থা গঠনের কথা উল্লেখ করেন। তখনকার গর্ভনর জেনারেল লর্ড ডাফরিনও শাসনকাজের সুবিধার জন্য মতামত প্রকাশের একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। হিউমের প্রস্তাব তাঁর কাছে উৎসাহ পায়। হিউম 'জাতীয় ইউনিয়ন' নামে এক সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির আহ্বানে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে এক সম্মেলন বসে। বিখ্যাত বাঙ্গালী আইনজীবী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত

থেকে ৭২ জন প্রতিনিধি এতে যোগ দেয়। কলকাতায় এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত "জাতীয় সম্মেলনের" দ্বিতীয় অধিবেশন চলায় অনেকে এই সভায় যোগ দিতে পারেননি। বোম্বাই সম্মেলনে প্রতিষ্ঠানের নাম "ভারতের জাতীয় কংগ্রেস" গ্রহণ করা হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের বিভিন্ন নেতাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, জাতীয় ঐক্য ও সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করেন। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায়। হিউমের অনুরোধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জাতীয় সম্মেলনের সমস্ত সদস্য সহ কংগ্রেসে যোগ দেন।



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯০৫ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চরমপন্থী আন্দোলন ঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর থেকে কংগ্রেস সরকারের প্রতি আবেদন ও নিবেদন নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। সরকারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ তাঁরা এড়িয়ে চলতেন। সরকারী নীতির সমালোচনা করা ও সংস্কার দাবি করাই ছিল তাঁদের মূল নীতি। কংগ্রেসের নবীন সদস্যরা এই মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, আবেদন-নিবেদনের দ্বারা দাবি আদায় করা সম্ভব নয় ; —কঠোর নীতি ও কর্মপন্থার প্রয়োজন। এইভাবে কংগ্রেসের ভিতরে চরম-পন্থীদের সৃষ্টি হয়। যাঁরা আবেদন ও নিবেদনের পক্ষে ছিলেন, তাঁদের বলা হয় নরমপন্থী। চরমপন্থীদের মধ্যে বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপৎ রায় ছিলেন প্রধান।

এই সময় লর্ড কার্জন নতুন ভাইসরয় হয়ে আসেন। তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ' করে সবচেয়ে অপ্রিয় কাজ করেন। শাসনকাজের সুবিধার অজুহাতে তিনি বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন। হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য নষ্ট

করা ও জাতীয়তাবাদকে খর্ব করাই বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বঙ্গভঙ্গ সারা দেশে ঘৃণার সৃষ্টি করে। উত্তাল আন্দোলনে 'স্বদেশী' ও 'বয়কট নীতি' গ্রহণ করা হয়। 'স্বদেশী' অর্থে দেশে অর্থাৎ ভারতে তৈরী জিনিস ব্যবহার করা ও 'বয়কট্' অর্থে বৃটিশ জিনিস বর্জন করা। দেশব্যাপী প্রতিবাদের মধ্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। চরমপন্থীদের চেষ্টায় 'স্বরাজ', 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধল। নরমপন্থীরা কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত 'বয়কট, ও 'স্বদেশী' প্রস্তাব পরিবর্তন করে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের দাবি জানালেন। চারদিকে হৈ-হট্টগোলে অধিবেশন বন্ধ হয়ে গেল। কংগ্রেসের নেতৃত্ব নরমপন্থীদের হাতেই থেকে গেল। তারপর বৃটিশ সরকার দমন-নীতি চালিয়ে গেলেন। তিলককে বন্দী করে ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে পাঠানো হল।


বালগঙ্গাধর তিলক

সরকার চরমপন্থীদের দমনের চেষ্টা করলে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের সূত্রপাত হয়। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে বাংলার "অনুশীলন-সমিতির" নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের মূল নেতৃত্ব দেন অরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। তাঁর দল 'যুগান্তর' বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করত বলে দলের নাম হয় 'যুগান্তর'। কলকাতার মুরারি-পুকুরে বোমা ও অস্ত্র তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকির ওপর অত্যাচারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হল। তাঁরা ভুল করে মজফ্ফরপুরে ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যার গাড়ীতে বোমা ফেলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন ও প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বারীন্দ্র, অরবিন্দ ঘোষ এবং কানাইলাল দত্ত ধরা পড়েন। এর ফলে আলিপুর বোমার মামলা শুরু হয়।

চিত্তরঞ্জন দাসের চেষ্টায় অরবিন্দ মুক্তি পান, কিন্তু বারীন্দ্র ও অন্যান্যদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

বাংলার অনুকরণে পাঞ্জাবেও বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয়। উগ্রপন্থী নেতা লালা লাজপৎ রায় পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের উৎসাহিত করেন। ১৯১৪ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কিছু অর্থ লুট করেন ও সরকারী কর্মচারীদের হত্যা করেন। এই সময় বিপ্লবী রাসবিহারী বসু পাঞ্জাবে এসে লাহোর, আম্বালা, রাওয়ালপিণ্ডি প্রভৃতি সেনানিবাসে বিদ্রোহের কথা প্রচার করেন। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয় ও রাসবিহারী জাপানে পালিয়ে যান।



ক্ষুদিরাম

বৃটিশদের উচ্ছেদের জন্য যিনি মহারাষ্ট্রে সর্বপ্রথম বিপ্লবী-সংঘ স্থাপন করেছিলেন, তাঁর নাম বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্‌কে। বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নেতৃত্বে "চিত্রমেলা" ও "অভিনব ভারত" নামে দুটি বিপ্লবী সমিতি স্থাপিত হয়। মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ বিদ্যালয়ে অভিনব ভারতের শাখা স্থাপিত হয়।

প্রশ্নাবলী

১। ভারতে কোম্পানী শাসনের অবসান হয় কখন? "ভারত শাসন আইন" কত খ্রীষ্টাব্দে পাস করা হয়? এই আইন সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

২। দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। ভারতে ইংরাজদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৪। আধুনিক ভারতের জনক কাকে বলা হয় এবং কেন? আলোচনা কর।

৫। ব্রাহ্ম-সমাজ কত খ্রীষ্টাব্দে কে প্রতিষ্ঠা করেন? ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এই সমাজের অবদান আলোচনা কর।

৬। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা কর।

৮। ১৯০৫ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের চরমপন্থী আন্দোলন সম্বন্ধে বর্ণনা কর।

৯। বঙ্গভঙ্গ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়? এর ফল কি হয়েছিল?

১২

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ
(First World War)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণঃ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্বার্থপরতাও বেড়ে যায়। দেখা দেয় এক স্বার্থপর সংগ্রামশীল মনোভাব। নিজের জাতি অপর জাতি হতে বড় ও অপর জাতির ওপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা ইউরোপীয় দেশগুলিকে পেয়ে বসেছিল। এই স্বার্থসংঘাতের ফলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামরিক ও আর্থিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তারই ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

বিসমার্ক যুদ্ধের মাধ্যমে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন। ইটলীর ঐক্যও যুদ্ধের মাধ্যমে হয়। এই ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, সামরিক বলে বলীয়ান হলে আধুনিক জগতে অনেক কিছু করা সম্ভব। অনেক রাষ্ট্রই এই "জঙ্গীবাদ" নীতি গ্রহণ করল। ফলে শুরু হল অস্ত্র-প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাই পরবর্তী কালে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয়।

জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের পৃথিবীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের চেষ্টায় বিশ্বযুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়। তাঁর সামুদ্রিক ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগঠনের স্বপ্ন ইংলণ্ডের স্বার্থের বিরোধী ছিল। তিনি বিরাট নৌ-বাহিনী তৈরি করলে ইংলণ্ড শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তুরস্কের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তিনি বার্লিন থেকে বাগ্‌দাদ পর্যন্ত রেলপথ তৈরির প্রস্তাব করলে ইংলণ্ড তার প্রাচ্য সাম্রাজ্য সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে উঠল এবং ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করল।

সেডানের যুদ্ধে পরাজয়ের পর ফ্রান্স আলসাস্ ও লোরেন হারাবার গ্লানি ভুলতে পারেনি। ফলে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ফরাসী-জার্মান সম্পর্ক খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। ফ্রান্স সেডানের যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তৎপর হলে ইউরোপে উত্তেজনা বজায় থাকে। ফরাসী ও জার্মানদের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।

বলকান অঞ্চলে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার নিকটবর্তী বসনিয়া ও হরাজিগভনিয়া ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে দখল করলে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। রাশিয়া ছিল সার্বিয়ার সমর্থক। জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করলে আশু যুদ্ধ বন্ধ হয়; কিন্তু উত্তেজনা বজায় থাকে ও বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ইটালী ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ডালমেশিয়া উপকূল নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও বিশ্বরাজনীতিকে বিষাক্ত করে তুলেছিল।

বিসমার্ক ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইটালীকে নিয়ে ত্রি-শক্তি চুক্তি করেন। যতদিন তিনি ক্ষমতায় ছিলেন, ততদিন কোনও পাল্টা জোট গঠিত হতে দেননি। তাঁর পতনের পর ধীরে ধীরে পাল্টা জোট গঠিত হয় ও ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে ত্রি-শক্তি-মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এইভাবে ইউরোপ দুটি জোটে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শুরু হয়।

ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশ যখন এইরকম পারস্পরিক বিদ্বেষে ও সন্দেহে অন্ধকার, সেই সময় এমন এক ঘটনা ঘটল, যার ফলে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড ও তাঁর স্ত্রী সোফিয়া বসনিয়া প্রদেশে বেড়াতে আসেন। ২৮শে জুন বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভো শহরে সার্বিয়ার এক তরুণের হাতে যুবরাজ-দম্পতি নিহত হন। অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার সরকারের কাছে ৪৮ ঘণ্টা মেয়াদের অপমানজনক চরমপত্র পাঠায়। রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নিয়ে অস্ট্রিয়ার চরমপত্রে ভীত না হতে উপদেশ দিল। অস্ট্রিয়া তার চরমপত্রের সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে ২৮শে জুলাই, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষ নিলে জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। প্রতিশ্রুতিমত ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষ নিল। বেলজিয়ামের নিরাপত্তা ভেঙ্গে জার্মানবাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করলে ইংলণ্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইভাবে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল। পরে বিভিন্ন সময়ে তুরস্ক ও বুলগেরিয়া জার্মানি বা কেন্দ্রীয় পক্ষে এবং ইটালী, পর্তুগাল, রুমানিয়া, গ্রীস, জাপান, চীন ও আমেরিকা মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে এক নতুন অভিজ্ঞতা। এর আগে আর কোনও যুদ্ধে এত লোক

যোগ দেয়নি বা কোনও যুদ্ধ জাতীয় জীবনকে এত প্রভাবিত করেনি। বৃদ্ধ, শিশু, নারী, সামরিক ও বেসামরিক মানুষ মাত্রেই এই যুদ্ধের ফল ভোগ করেছে। এই যুদ্ধ জল, স্থল ও আকাশ সর্বত্রই বিস্তার লাভ করেছিল। জলের নীচে সাব্‌মেরিন ও আকাশে বোমারু বিমান এর আগে কোনও যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়নি। ট্যাঙ্ক, বিষাক্ত গ্যাস এই যুদ্ধেই প্রথম ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চ বা সরু নালা কেটে দিনের পর দিন যুদ্ধ চলেছে। এই যুদ্ধের বিভৎসতায় মানুষ পশুতে পরিণত হয়। ৫৩ থেকে ৭০ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। নিহত ও মৃতের সংখ্যা প্রায় ৯ লক্ষ, অর্থাৎ $\frac{১}{৭}$ অংশ যারা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। বহু লোক অক্ষম হয়ে পড়ে। বোমারু বিমানের আঘাতে, মহামারীতে ও দুর্ভিক্ষে আরও অনেক বেসামরিক লোক মারা যায়। এই যুদ্ধের জন্য বহুদেশের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে। এর ফলেই এই যুদ্ধ অভিশপ্ত হয়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধই পৃথিবীর প্রথম সর্বাত্মক যুদ্ধ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ঃ সুদূর-প্রসারী ফলাফলের কথা চিন্তা করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বিপ্লব বলা যেতে পারে। যুদ্ধের বিশালতা, যোগদানকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা, মারণাস্ত্রের ব্যবহার, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলাফল বিচার করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে 'পরিবর্তনকারী বিপ্লব' বলা যায়।

যুদ্ধ ও শান্তি-চুক্তির ফলে পৃথিবীর বিশেষ করে ইউরোপের রাজনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনটি রাজবংশের অবসান হয়—রাশিয়ায় রোমানফ্‌ বংশ, জার্মানির জোহেন্‌জালার্ন বংশ, অস্ট্রিয়ার হাঙ্গেরীর হ্যাপস্‌বুর্গ বংশ। যুদ্ধের পরই তুরস্কে অটোমান তুর্কীদের শাসনের অবসান হয়। অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে উত্থিত হল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে বিভক্ত পোল্যাণ্ড বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাতীয়তাবাদ সাফল্য লাভ করে। বহু ভাষাভাষী ও জাতিগোষ্ঠী-মিলিত সাম্রাজ্যের অবসান হয়। একজাতীয় ভিত্তিতে নতুন নতুন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়। পূর্বের রাশিয়া সাম্রাজ্য থেকে

ফিন্‌ল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, বাটাভিয়া ও লুথিয়ানিয়া নামে চারটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া সৃষ্টি হয়।

জাতীয়তাবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রও প্রসার লাভ করে। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়। রাশিয়াতে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হল। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ফলে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করে।

এই যুদ্ধের পর ইউরোপের আধিপত্য কমে যায়। অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে আমেরিকা ইউরোপ থেকে এগিয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে আমেরিকা বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নও অল্প কিছুদিনের মধ্যে বৃহৎ বিশ্বশক্তিতে পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় স্বাধীনতা-আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে "সব যুদ্ধের অবসানের যুদ্ধ' বলা হত। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে শান্তি-চুক্তি এই বিশ্বাসকে মর্যাদা দেয়নি। পরাজিত শক্তির ওপর কঠোর ও অপমানজনক শর্ত আরোপ করার ফলে ভবিষ্যৎ সংঘর্ষের পথ প্রস্তুত করা হয়।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব :

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বৃটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারত এই বিশ্ব-ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। ভারতের মতামত নিয়ে বৃটিশরা এই যুদ্ধে যোগ দেয়নি ও সাম্রাজ্যবাদী কাজে ভারতীয় জনগণকে যখন এই যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করা হতে লাগল, তখনও ভারতের জনমতকে মূল্য দিতে তারা চায়নি। ভারত স্বেচ্ছায় এই যুদ্ধে যোগ না দিলেও যুদ্ধে প্রায় ১০ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য অংশ গ্রহণ করেছিল; —যুদ্ধের ব্যয়ভারের একাংশ বহন করতে হয়েছিল ভারতীয়দের।

যুদ্ধের প্রথম দিকে ভারতীয় নেতারা বৃটেনের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও ভারতীয় জনমত বৃটেনের অনুকূলে ছিল না। জাতীয় কংগ্রেস প্রকাশ্যে ও পরিষ্কারভাবে এই আনুগত্যের বিনিময়ে রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করল। ভারতীয়রা যাতে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয় গান্ধীজী তার

জন্য চেষ্টা করছিলেন। তাঁর আশা ছিল যুদ্ধশেষে বৃটিশ সরকার স্বরাজের দাবি মেনে নেবে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী জানান স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি ছাড়া ভারতের মানুষকে সন্তুষ্ট করা যাবে না। কিন্তু যুদ্ধের প্রথম-দিকে জাতীয়তাবাদীদের যে উৎসাহ ছিল, বেশীদিন তা বজায় থাকেনি। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, বৃটিশরা তাঁদের সহযোগিতার মূল্য দেবে না।

যুদ্ধের শুরুতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়েছিল। বিদেশী জিনিসপত্রের আমদানী বন্ধ হওয়ায় ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও তার ফলে শিল্প ও বাণিজ্যে কিছু উন্নতি হয়। কিন্তু, কিছুদিন পরেই এল মন্দা। কলকারখানা বন্ধ হওয়ায় শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়ে ও শিল্পে সংকট দেখা দেয়। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্রের মূল্য বেড়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের দুর্দশা চরমে পৌঁছল।

বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বিপ্লবী আন্দোলন: বিশ্বযুদ্ধে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে উৎসাহ ও আশার সৃষ্টি হলেও সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীরা আশাবাদী হলেন না। তাঁরা যুদ্ধের সময়ে জার্মানির সাহায্যের ওপর ভরসা করে স্বাধীনতালাভের সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

বিংশ শতাব্দীতে শুরুতে যে বিপ্লববাদী আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা সরকারের দমননীতির ফলে সফল হয়নি। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের পর দেশে ও বিদেশে পুনরায় দল গঠিত হতে থাকে সরকারের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষার জন্য। বিশেষ করে বিদেশে, বিপ্লবীদের কার্যকলাপে আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলন নতুন রূপ ধারণ করে। বহু বিপ্লবী বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী-কেন্দ্র তৈরি করে তার মাধ্যমে ভারত সম্পর্কে প্রচার চালান। স্বদেশে বিপ্লবকে জোরদার করার জন্য বিদেশ থেকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করাও তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল। বিদেশে ভারতীয় ছাত্র, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের মধ্য থেকেও তাঁরা সদস্য সংগ্রহ করতেন। বিশ্বযুদ্ধের সময় তাঁদের কাজ হল বিদেশে ভারতীয় সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। জার্মানির সাহায্য গ্রহণ করার জন্যও পরিকল্পনা তৈরি হল। বিপ্লবী সাভারকর এই সময় ধরা পড়লে লণ্ডনের বিপ্লবীরা নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েন।

লণ্ডন থেকে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্যারিস হয়ে জার্মানিতে আসেন ও বার্লিন শহরে একটি স্বাধীনতা-কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি বাগ্‌দাদ

ইস্তানবুল, পারস্য, কাবুলে প্রতিনিধি পাঠিয়ে ভারতীয় সৈন্য ও যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করলেন। এঁদের কাছ থেকে মহেন্দ্রপ্রতাপ, মৌলানা বরকতউল্লা ও মৌলানা ওবেদুল্লা কাবুলে এসে অস্থায়ী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই সময় বিপ্লবী হরদয়াল প্যারিস থেকে আমেরিকা পৌঁছান ও আমেরিকায় 'গদর' বা বিপ্লবী দল গঠিত হল। ১৯১৩ খ্রীঃ থেকে আমেরিকায় 'গদর' পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। সানফ্রান্সিস্‌কো শহরে গদর পার্টির সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়ে তার শাখা-প্রশাখা সমগ্র আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ল।

বাংলায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে নতুন যুগের সূচনা হয় এই সময়। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, রাসবিহারী বসু, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই সময়ের বিশিষ্ট বিপ্লবী। এঁদের পরিকল্পনা ছিল যে, বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত করে তুলবেন ও পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পুলিশ লাইন ও সরকারী কোষাগার আক্রমণ করে জার্মানী অস্ত্রের সাহায্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। ১৯১৫ খ্রীঃ ২১শে ফেব্রুয়ারী ছিল নির্দিষ্ট তারিখ। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেল—মীরাটে ভি. জে. পিংলে ধরা পড়লেন। বিদ্রোহী সেনাদল ভেঙ্গে দেওয়া হল ও ষড়যন্ত্রকারীদের অনেকেই গ্রেপ্তার হলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে পালিয়ে যান।

হোমরুল লীগ ও লক্ষ্ণৌচুক্তি : যুদ্ধের মধ্যে শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত কংগ্রেসের নেতৃত্ব দেন। তাঁর পরামর্শে চরমপন্থীদের পুনরায় কংগ্রেসে নেওয়া হল। তিনি ১৯১৬ খ্রীঃ আয়র্ল্যাণ্ডের অনুকরণে হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করে স্বায়ত্তশাসনের জন্য দাবি জানাতে লাগলেন। বালগঙ্গাধর তিলক জেল থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে হোমরুল লীগ বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

যুদ্ধের সময় মুসলিম লীগেও পরিবর্তন দেখা দিল। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগ ১৯১৬ খ্রীঃ লক্ষ্ণৌ-চুক্তি করে এক নতুন পথের সন্ধান দিলেন। উভয় দলই সম্মিলিত ভাবে স্বায়ত্তশাসন দাবি করল। তাঁদের দাবি হল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক-আইন-সভাগুলিতে মোট সদস্য-সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ

হবেন নির্বাচিত ও প্রাদেশিক বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করবেন না। তাঁরা জানালেন প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি ছাড়া সব ক্ষেত্রে সরকার সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয়দের হাতে থাকবে। সরকার দমন ও সংস্কার নীতি একই সঙ্গে গ্রহণ করে এই আন্দোলনের মোকাবিলা করতে চাইলেন।

হোমরুল লীগকে বন্ধ করে দেওয়া হল ও শ্রীমতি বেসান্ত গ্রেপ্তার হলেন। ২০শে আগস্ট ১৯১৭ খ্রীঃ বৃটিশ পার্লামেণ্টে সেক্রেটারী অব্ স্টেট মেণ্টেগু-সংস্কার নীতি ঘোষণা করলেন। ঘোষণা করা হল সংস্কারের মাধ্যমে ধীরে ধীরে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এদিকে ফৌজদারী আইন সংশোধন করে দমন-নীতি চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ায় ব্যবস্থা হল।

১৯১৯ খ্রীঃ বৃটিশ পার্লামেণ্ট মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড আইন পাস করে ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রিত অধিকার দেয়। এই সংস্কারের ফলে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ, যেমন—স্থানীয় শাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির ভার ভারতীয়দের হাতে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি বৃটিশ শাসকদের হাতে রাখা হল। এইভাবে "দ্বৈত শাসন" ব্যবস্থা প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করা হল। এই সংস্কার আইন কোনো পক্ষকেই সন্তুষ্ট করতে পারল না। যুদ্ধের ফলে চারদিকে খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতির সমস্যা দেখা দিল। আরও সংস্কারের দাবি চারিদিকে ধ্বনিত হতে আরম্ভ হল।

গান্ধীজীর আভির্ভাব ঃ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা রূপে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব এক চমকপ্রদ ঘটনা। যুদ্ধের মধ্যেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে দেশে ফেরেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। অহিংসা ও সত্যের ওপর ভিত্তি করে যে সংগ্রাম তিনি গড়ে তোলেন, তার নাম দেন "সত্যাগ্রহ"। যুদ্ধের মধ্যে দেশে ফিরে তিনি যুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুদ্ধশেষে তার আশা পূর্ণ হল না।

এই সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে আমেদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করে ও গুজরাটের কৃষক-আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। অনাবৃষ্টির দরুন গুজরাটের কইরা জেলায় কৃষকরা খাজনা দিতে অস্বীকার করায় গান্ধীজী বল্লভভাই প্যাটেল নামে স্থানীয় নেতার সাহায্যে সত্যাগ্রহ শুরু করেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এইসব আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার "রাওলাট

আইন" পাস করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করে। তা ছাড়া, বিনা-বিচারে জেলে দেওয়া ও দেশ থেকে নির্বাসিত করা প্রতিদিনের কাজ হয়। এই আইনের প্রতিবাদে গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল 'হরতাল' ডাকলেন। স্থির হল, হরতালের পর 'আইন অমান্য আন্দোলন' শুরু হবে। হরতাল সর্বত্র সফল হল। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের চরম পরিণতি ঘটে পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে। ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের নাগরিকরা জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হন সামরিক কর্তৃপক্ষের জুলুম ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে। সামরিক নেতা ডায়ারের সেনাবাহিনী কোনও রকম সতর্ক না করেই এই জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করে। প্রায় এক হাজার লোক মারা যায়। আহত হয় দু'হাজারেরও বেশী। সেনাবাহিনীর এই বর্বর ব্যবহারে ভারতবাসী স্তম্ভিত হয়ে যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই অত্যাচারের প্রতিবাদে বৃটিশ সরকার-প্রদত্ত "নাইট" উপাধি ত্যাগ করেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দিয়ে পরাজিত হয়। তুরস্ক ছিল ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি খলিফার সাম্রাজ্য। যুদ্ধশেষে তুরস্ককে ভাগ করার জন্য ইংলণ্ডকে দায়ী করে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয়। সৌকত আলী ও মহম্মদ আলী ভ্রাতৃদ্বয় ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ "খিলাফত" নামে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করলেন। গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করলেন ও ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে খিলাফত সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। এইভাবে গান্ধীজী সর্বভারতীয় নেতা রূপে পরিগণিত হন ও তাঁর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়।

প্রশ্নাবলী

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর।
২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ও ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৩। কিভাবে ভারতীয়রা প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে গ্রহণ করেছিল ?
৪। যুদ্ধের সময়ে বিপ্লবী আন্দোলনের পরিচয় দাও।
৫। 'হোমরুল লীগ' কি ? ইহা কে প্রতিষ্ঠা করেন ও কেন ?
৬। গান্ধীজীর আবির্ভাব কিভাবে হয় ?

১৭

রুশ বিপ্লব
(The Bolshevik Revolution)

বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা রাশিয়ায় 'বলশেভিক বিপ্লব'। আধুনিক যুগের যে ধারাগুলি ইউরোপের ইতিহাসে পরিবর্তন এনেছিল, তারই এক বিশেষ পর্যায় হল রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব। রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসনের ব্যর্থতা, জার দ্বিতীয় নিকোলাসের রাজ্যশাসনে অক্ষমতা ও রাশিয়ায় পশ্চিমী ভাবধারার প্রবর্তন রাশিয়ানদের মধ্যে বিপ্লবের চেতনা নিয়ে আসে।

বিপ্লবের কারণ ঃ রাশিয়ার সম্রাটকে 'জার' বলা হত। রোমান বংশ রাশিয়াতে তিন শ' বছর রাজত্ব করে। রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা ছিল স্বেচ্ছাচারতন্ত্র। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস ছিলেন জার। তিনি নিজেকে ভগবানের প্রতিনিধি হিসেবে মনে করে রাজত্ব চালাতেন। দেশে কোনও লিপিবদ্ধ আইন ছিল না। জারের হুকুম ও ঘোষণাপত্রই ছিল আইন। জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ জানাবার কোনও প্রতিনিধি-সভা ছিল না। সম্রাট গোয়েন্দা পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে দেশ শাসন করতেন। অভিজাতরা সবরকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন। জার দ্বিতীয় নিকোলাস দেশপ্রেমিক হলেও, তিনি ছিলেন দুর্বল। তাঁর হাতে কোনও ক্ষমতা ছিল না। রানী আলেকজেন্দ্রার নির্দেশে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস রাস্‌পুটিন নামে এক কুচক্রী ধর্মযাজকের হাতে শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন। ফলে রাস্‌পুটিনই তখন আসল শাসক হয়ে ওঠেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতি হাজার রুশের মধ্যে ১৭ জন অভিজাত, ১২৫ জন ব্যবসায়ী ও শহরবাসী এবং ৮০০ জনের বেশী ছিল কৃষক সম্প্রদায়ের। কৃষকদের অবস্থা ভাল ছিল না। ভূমিদাস-প্রথা তুলে দেওয়ার পর 'মির' বা গ্রাম-পঞ্চায়েতের ওপর কৃষকদের জমির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। 'মির' জমিদারদের স্থানে শাসন ও শোষণের একটি স্থায়ী কেন্দ্রে পরিণত হয়। কৃষকদের জমি বিক্রি করার কোনও অধিকার ছিল না।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পর কৃষকদের নিজ নিজ জমি বিক্রয় অধিকার দেওয়া হল ? কিন্তু ফল শুভ হল না। অর্থাভাবে তারা নিজ নিজ জমি বিক্রি করে সব অর্থ ব্যয় করে ফেলে আরও দুর্দশায় পড়ল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবে রাশিয়াতে শিল্প-বিপ্লব অনেক দেরিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে হঠাৎ শিল্প-বিপ্লব তাড়াতাড়ি ঘটতে থাকে। শিল্পোন্নতির সঙ্গে জড়িত হয় শ্রমিকশ্রেণীর দুঃসহ অবস্থা। অধিকাংশ কলকারখানার মালিক ছিল বিদেশীয়। শ্রমিকদের স্বার্থ উপেক্ষা করে বেশী লাভ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। জার-শাসিত রাশিয়ায় 'ট্রেড ইউনিয়ন' গঠন করা বা 'ধর্মঘট' করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। এই মানসিক অবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতন্ত্র-মতবাদ বিস্তার লাভ করে।

রাশিয়ায় জনসাধারণ বলতে শ্রমিক ও কৃষকদের বোঝাত। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে রাশিয়া ছিল সবচেয়ে অশিক্ষিত। শিক্ষার অভাব ও সামাজিক দুরবস্থা জনসাধারণকে মদ্যপানে আসক্ত করে। এই সময় রাশিয়াতে "ভদ্‌কা" নামে একরকম মদ সবাই পান করত।

এইভাবে যখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অসন্তোষ দেখা দিল, তখন মানসিক দিক থেকে প্রস্তুতি চলতে লাগল। ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল লোকদের সম্মিলিত চেষ্টায় এক নতুন যুগের সূচনা হয়। গোগল, টুর্গোনিভ, টলস্টয়, গোর্কি ও ডস্টভয়েস্কি প্রভৃতি সাহিত্যিক, দার্শনিক অকর্মণ্য ও অযোগ্য স্বৈরাচারী জারতন্ত্রের প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনসাধারণের এই মনোভাব ও প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় রাজনৈতিক প্রচার-কাজের তীব্রতা বেড়ে যায়।

বিপ্লবের পথে : শিল্প-বিপ্লবের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে পুরানো রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে না নিয়ে জার-শাসনব্যবস্থা আরও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। এর বিরুদ্ধে নতুন বিপ্লবী আন্দোলনের সূত্রপাত এবং সর্বত্র ধর্মঘট, গণবিক্ষোভ প্রভৃতি দেখা দেয় ও সর্বত্র সংস্কারের দাবি ওঠে। সংবাদপত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বিপ্লবী সংবাদপত্রগুলি গোপনে প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রমিকরা কার্ল মার্কস-এর বাণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সমাজতন্ত্রের ভক্ত হয়ে পড়ে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জর্জ প্লেখানভের নেতৃত্বে "সমাজবাদী গণতান্ত্রিক" দল তৈরি হয়।

এই দল অন্যান্য দলের সঙ্গে মিলে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে "সমাজবাদী গণতান্ত্রিক শ্রমিক দল" নাম নেয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই এই দল মেন্‌শেভিক বা সংখ্যালঘিষ্ঠ ও বল্‌শেভিক বা সংখ্যাগরিষ্ঠে বিভক্ত হয়ে যায়। যাঁরা বিপ্লব-বিরোধী ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা মেন্‌শেভিক বলে পরিচিত হন। ভাদিমির ইলিচ্ উলায়নভ বা লেনিন ছিলেন বল্‌শেভিকদের নেতা। বিপ্লবের হাতিয়ার হিসেবে তিনি বল্‌শেভিক দলের সংগঠন গড়ে তুললেন।



লেনিন

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিপ্লবী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জার সরকারও সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই আন্দোলন দমন করতে বদ্ধপরিকর হন। বুদ্ধিজীবীরা সমস্ত বিপ্লবী মতবাদের উৎস ও প্রচারক—এই বিশ্বাসে শিক্ষক ও ছাত্র সমাজের ওপর নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। ১৯০৪-১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জাপানের হাতে পরাজিত হয়। এই পরাজয়ে রাশিয়ার ভেতরে দারুণ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে একদল ধর্মঘটকারী তাদের দাবি জানাবার জন্য জারের প্রাসাদ অভিমুখে এগিয়ে গেলে সৈন্যরা গুলি চালায় ও বহুলোক হতাহত হয়। এই ঘটনাকে "রক্তাক্ত রবিবার" বলে। এর প্রতিবাদে রাশিয়াতে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। জার শাসনসংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন ও "ডুমা" বা জাতীয় পরিষদ গঠন করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে জার দ্বিতীয় নিকোলাস বাক্-স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা স্বীকার করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই জার আবার পুরানো ব্যবস্থায় ফিরে যান। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লব ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে। জনগণ এই বিপ্লবের ফলে জাগ্রত হয় এবং সৈন্যরা ও জনগণ এই বিপ্লবের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে।

এইভাবে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পথ প্রস্তুত হল। রুশ বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ হল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রুশবাহিনীর চরম ক্ষতিস্বীকার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার সরকারের চরম অকর্মণ্যতা ও অযোগ্যতার ফলে দলে দলে রুশসৈন্য জার্মানিদের হাতে নিহত ও বন্দী হল। দেশের কৃষকদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ায় কৃষিকাজ ও কৃষি-উৎপাদন কমে যায়। দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে পেট্রোগ্রাদে কলকারখানায় শ্রমিক-ধর্মঘট শুরু হল। রুশসৈন্য দলে দলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে ও ধর্মঘটকারীদের সঙ্গে যোগ দেয়। আন্দোলন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সৈনিক ও শ্রমিকরা একটি 'সোভিয়েত' বা 'পরিষদ' গঠন করে। জারের সেনাবাহিনী পেট্রোগ্রাদ দখলে ব্যর্থ হলে অতঃপর জার দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠনের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু জনসাধারণ জারের সিংহাসন-ত্যাগ দাবি করে। ফলে, জার সিংহাসন ত্যাগ করলে ১৫ই মার্চ অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। রাশিয়ার বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী ২৭শে ফেব্রুয়ারি এই ঘটনা ঘটেছিল বলে একে 'ফেব্রুয়ারি বিপ্লব' বলে।

জনসাধারণের চার দফা দাবি ছিল :—যুদ্ধে শান্তিপ্রতিষ্ঠা, কৃষকদের হাতে জমি, শ্রমিকদের হাতে শিল্পের দায়িত্ব দেওয়া, রাশিয়ান নয় এমন মানুষদের সমান অধিকার। মেন্‌শেভিক দলের নেতা কেরেনস্কি ছিলেন অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী। লেলিন এপ্রিল মাসে সুইট্‌জারল্যাণ্ড থেকে রাশিয়ায় ফিরে আসেন। তাঁর নেতৃত্বে বলশেভিক দল যুদ্ধশেষে কৃষকদের কাছে জমি অর্পণ ও সোভিয়েতগুলির হাতে সব ক্ষমতা অর্পণ করার জন্য পরিষ্কার নীতি ঘোষণা করেন। কেরেনস্কি সরকারের অক্ষমতা ও যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার নীতি এই সরকারের পতন ডেকে আনল। ৭ই নভেম্বর (রাশিয়ার বর্ষপঞ্জী অনুযায়ী ২৫শে অক্টোবর) একদল নাবিক শীতকালীন প্রাসাদ দখল করে নেয়। সমস্ত রাশিয়ায় সোভিয়েতের সম্মেলন বসল একই দিনে এবং এই সম্মেলন রাজ্যের সব ক্ষমতা দখল করে নিল। এই ঘটনাকে 'অক্টোবর বিপ্লব' বলে।

'সোভিয়েত' সম্মেলনের পরদিনই এই যুদ্ধ শেষ করার আবেদন জানাল। ডিক্রি বা নির্দেশ জারী করে জমিদার, জার ও চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকসমিতির মধ্যে ভাগ করে দিল। কারখানা-সমিতি গঠন করে

কারখানাগুলির দায়িত্ব তাদের ওপর দেওয়া হল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্যাঙ্ক, ইন্‌সিওরেন্স, বড় বড় শিল্প, খনি, পরিবহণ-ব্যবস্থা জাতীয়করণ করা হল। লেনিনের নেতৃত্বে জনসাধারণের 'কমিশার পরিষদ' নামে এক নতুন সরকার গঠিত হল।

ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের ওপর প্রভাবঃ রাশিয়াতে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে পশ্চিমী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। পশ্চিমী ধনতন্ত্রী দেশগুলি তাদের দেশে সাম্যবাদ ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে সাম্যবাদের পীঠস্থান রাশিয়াকে আক্রমণ করে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান, ইটালী প্রভৃতি দেশ এই সাম্যবাদী সরকারকে ধ্বংস করার জন্য একযোগে আক্রমণ চালায় ও প্রতি-বিপ্লবীদের সাহায্য দেয়। লেনিন এই বিপদে সাহস না হারিয়ে এই নবগঠিত রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। তাঁর সহকারী ট্রট্স্কি শ্রমিক-সেনা বা 'লাল ফৌজ' গঠন করে এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। লেনিনের অপর সরকারী যোসেফ স্ট্যালিন গুপ্তচরদের সাহায্যে দেশের প্রতি-বিপ্লবীদের দমন করেন।

বল্‌শেভিক বিপ্লব আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। বিশ্ব-রাজনীতির ক্ষেত্রে এই বিপ্লব এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রুশ বিপ্লবের ফলে পশ্চিমী সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সামনে দাঁড়ায়। রাশিয়ার নেতারা অন্যান্য দেশেও রাশিয়ার মত বিপ্লব ঘটাবার চেষ্টা করতে থাকেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল বা 'কমিন্‌টার্ন' নামে আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সাম্যবাদ প্রচারিত হতে থাকে। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি রাশিয়ার সাম্যবাদ ধ্বংস করতে বিফল হয়ে নিজ নিজ দেশে শ্রমিক-কল্যাণমূলক আইন প্রণয়ন করে সাম্যবাদী প্রভাব সীমিত করার চেষ্টা করলেন।

সাম্যবাদী ভাবধারা আন্তর্জাতিকতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি শুধু নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থের কথা চিন্তা না করে অপরাপর রাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে আরম্ভ করে। বিভিন্ন জাতীয় সমস্যা আন্তর্জাতিক ভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

প্রথম দিকে সাম্যবাদ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ছিল। রাশিয়ার বল্‌শেভিক বিপ্লব সাম্রাজ্যবাদ অবসান ত্বরান্বিত করেছিল। এশিয়ার দেশ-

গুলিতে সাম্যবাদ সহজেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। চীনদেশে সাম্যবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ও পরবর্তীকালে এই দলই চীনের ক্ষমতা দখল করে। নতুন সোভিয়েত রাষ্ট্র উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা-সংগ্রামী জনসাধারণের বন্ধু রূপে পরিগণিত হয়। বিদেশী শাসন থেকে মুক্তির জন্য সাম্যবাদী রাশিয়াই ইউরোপে একমাত্র প্রথম রাষ্ট্র, যে এই সাম্যবাদকে সমর্থন জানায়। রাশিয়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করে। এই দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্যান্য দেশকেও প্রভাবিত করে ও বহু দেশ এই পরিকল্পনা-নীতি অনুসরণ করতে থাকে।

প্রশ্নাবলী

১। বলশেভিক কাদের বলা হয়। রাশিয়াতে বলশেভিক বিপ্লব ঘটে কেন? রাশিয়ার ইতিহাসে এই বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা কর।

২। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের কারণগুলি বিশ্লেষণ কর।

৩। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের ওপর রুশ বিপ্লবের প্রভাব আলোচনা কর।

১৪ | ইউরোপ, ১৯১৯-১৯৩৯ খ্রীঃ (Europe, 1919-1939)

প্যারিস শান্তি-সম্মেলন ও ইউরোপের পুনর্গঠন

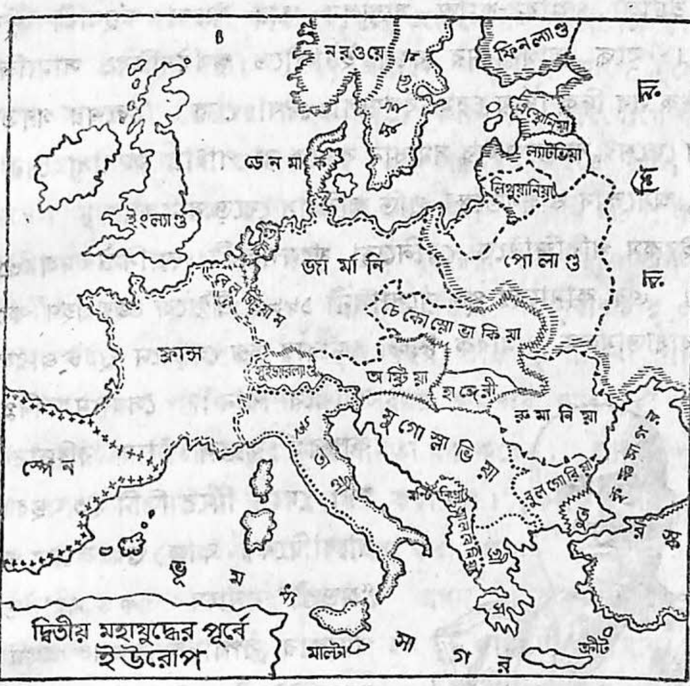
জার্মানি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরতি হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-সন্ধিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়।

যুদ্ধবিরতির পর পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ ফ্রান্সের আমন্ত্রণে প্যারিসে মিলিত হন। মোট ৩২টি দেশের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইটালী ও জাপান এই সম্মেলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই বৈঠকের প্রধান পরিচালক ছিলেন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্‌সো, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লাণ্ডো ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন। যুদ্ধবিরতির পূর্বেই (৮ই জানুয়ারি, ১৯১৮ খ্রীঃ) আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন সন্ধিস্থাপনের জন্য মূলসূত্র রূপে চোদ্দটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন।

প্যারিসের শান্তি-সম্মেলনে জার্মানির সঙ্গে ভার্সাই-সন্ধি, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেণ্ট জার্মেইন সন্ধি, হাঙ্গেরির সঙ্গে ট্রিয়ানন্‌, সন্ধি, বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলির সন্ধি ও তুরস্কের সঙ্গে সেভরের সন্ধি সম্পাদন করে।

ভার্সাই-সন্ধিতে জার্মানি (১) ফ্রান্সকে আলসাস্‌, লোরেন ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়; (২) বেলজিয়ামকে মরস্‌নেট, ইউপেন ও মেলমেডি—এই তিনটি জেলা ছেড়ে দেয়; (৩) লিথুয়ানিয়াকে মেমেল বন্দর ফিরিয়ে দেয়, (৪) পোল্যাণ্ডকে পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া ছেড়ে দিতে হয়; (৫) চীনে জার্মান-অধিকৃত স্থানগুলি জাপানকে দিতে হয়; (৬) আফ্রিকায় জার্মান উপনিবেশগুলি জাতিসংঘের অধীনে রাখা হয়; (৭) উত্তর সাইলেশিয়ার কিছু অংশের জনগণ গণভোটের দ্বারা পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে যুক্ত হল, ডান্‌জিগ বন্দরকে জার্মানি থেকে বিচ্ছিন্ন করে জাতিসংঘের অধীনে স্বাধীন শহর হিসেবে রাখা হল; (৮) জার্মানিকে শ্যাম, নাইজেরিয়া

মরক্কো, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানের সব সম্পত্তি ও বিশেষ অধিকার ত্যাগ করতে হয়; (৯) এ ছাড়াও জার্মানির শিল্প ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ 'সার' অঞ্চল ১৫ বছরের জন্য জাতিসংঘের অধীনে রাখা হয়।



দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপ

জার্মানিকে মাত্র ১ লক্ষ সৈন্য রাখার অনুমতি দেওয়া হয় ও বাধ্যতামূলক সৈন্যসংগ্রহের রীতি বন্ধ করা হয়। জার্মানির কামান ও যুদ্ধজাহাজের আকার ছোট করা হয়। রাইন নদীর বামতীরে সৈন্যসমাবেশ, ও দুর্গনির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়; জার্মানি যাতে ভার্সাই-চুক্তি মেনে চলে, সেইজন্য মিত্র-শক্তির এক সেনাবাহিনী রাইন নদীর পশ্চিম দিকের ভূখণ্ড দখলে রাখে। বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। জার্মানি এই ভার্সাই-সন্ধিকে 'জোর করে চাপিয়ে দেওয়া সন্ধি' আখ্যা দেয়।

শান্তি-চুক্তির ফলে জাতিসংঘ নামে এক আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি হল। শান্তি, স্বাধীনতা রক্ষা ও সহযোগিতার জন্য এই সংস্থা তৈরি হয়েছিল।

ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের উদ্ভব : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে

কতকগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব হয়,—যাকে সাধারণভাবে ফ্যাসিস্ট আন্দোলন বলে। এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হল গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতি অনীহা ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।

ইটালীতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব : প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিলে ইটালী প্যারিস-শান্তি সম্মেলন তার আশা অনুযায়ী পুরস্কার পায়নি। যুদ্ধে যোগদানের ফলে ইটালীতে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মনৈতিক সব দিক দিয়ে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দেশের গণতান্ত্রিক সরকার দেশের সমস্যাগুলির সমাধান করতে না পারায় জনসাধারণের মধ্যে হতাশা, অসন্তোষ ও গণতন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস বেড়ে যায়।

এইরকম পরিস্থিতিতে বেনিত্তো মুসোলিনী ফ্যাসিস্ট দল প্রতিষ্ঠা করেন। এক কামারের পুত্র মুসোলিনী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা এড়াবার জন্য গোপনে স্যুইট্‌জারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। সেখানে বিপ্লবধর্মী কাজকর্ম করলে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। দেশে ফিরে তিনি ২৩ বছর বয়সে সাংবাদিকের কাজ শুরু করেন ও পরে "অভন্তী" নামে এক সমাজতান্ত্রিক পত্রিকার সম্পাদক হন। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে ইটালীর মিত্রশক্তির সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেওয়া উচিত, এই মত প্রকাশ করলে তাঁকে পত্রিকার সম্পাদকের পদ থেকে বিতাড়িত করা হয়। ইটালী যুদ্ধে যোগ দিলে মুসোলিনী সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন ও আহত হন। যুদ্ধশেষে দেশের চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি ফ্যাসিস্ট দল প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের সদস্যরা 'কালো কোর্তা' পরত। ইটালীর হতাশাগ্রস্ত যুবকরা দলে দলে এই বাহিনীতে যোগ দিল। প্রাচীন রোমে কতকগুলি দণ্ডকে রাজশক্তির প্রতীক রূপে ব্যবহার করা হত ;—একে বলা হত 'ফ্যাসেস্'। মুসোলিনী এই থেকে তাঁর দলের নাম 'ফ্যাসিস্ট' রাখেন। মুসোলিনীর অধ্যবসায়, পরিশ্রম, উদ্যম ও অপূর্ব কর্মদক্ষতায় ফ্যাসিস্ট দলও প্রবল


মুসোলিনী

শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফ্যাসিবাদ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়; ফ্যাসিবাদ ব্যক্তিগত অধিকারের বিরোধী।

সাম্যবাদী দলগুলির সভা-সমিতি বন্ধ করাই ছিল ফ্যাসিস্টদের উদ্দেশ্য। এই দল ক্রমে ইটালীর পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জন করে। ক্রমে ইটালীর সব সরকারী কার্যালয়, রেলওয়ে স্টেশন ও অন্যান্য স্থানে এই দলের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে মুসোলিনী সদলবলে রাজধানী রোমের দিকে যাত্রা করেন ও তারযোগে রাজাকে মন্ত্রীদের পদচ্যুতির দাবি জানালেন। এই সঙ্কটময় সময়ে রাজা ভিক্টর ইম্যানুয়েল মুসোলিনীকে মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন। রাজার মত পার্লামেণ্টও জবরদস্তির কাছে মাথা নত করে এক বছরের জন্য রাজ্যশাসনক্ষমতা মুসোলিনীর হাতে তুলে দেয়। প্রথমেই তিনি শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক বিভাগের ক্ষমতা বাড়ালেন। কয়েক বছর পরে মুসোলিনী পার্লামেণ্ট উঠিয়ে দিয়ে "ডুসে" পদবি গ্রহণ করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাক্-স্বাধীনতা বন্ধ করেন। ফ্যাসীদল ছাড়া অন্যান্য দলকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হল। কলকারখানায় ধর্মঘট ও কাজ বন্ধ করাও বেআইনী বলে ঘোষণা করা হল।

জার্মানিতে নাৎসী-শক্তির উত্থান ঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি অপমানিত ও হীনবল রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জার্মানির সাম্রাজ্য নষ্ট হয়, সামরিক শক্তি ধ্বংস হয়, প্রচুর ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব পড়ে তার ঘাড়ে। যুদ্ধশেষে জার্মানিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফ্রান্স ক্ষতিপূরণ আদায়ের নামে শিল্পসমৃদ্ধ 'রূঢ়' অঞ্চল দখল করলে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। জার্মানিতে অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অবস্থার উন্নতি হলেও, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে পুনরায় অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ নিয়ে এডল্‌ফ হিটলার ও তাঁর নাৎসী-দল জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করেন।

অস্ট্রিয়ার সীমান্তে একটি গ্রামে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জন্মগ্রহণ করেন। হাইস্কুলে পড়া শেষ করে তিনি ভিয়েনায় আসেন ও একটি আর্ট কলেজে ভর্তির পরীক্ষায় ব্যর্থ হন। এই সময় ছবি এঁকে ও নানা কাজ করে তাঁর জীবনযাত্রা চলত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে হিটলার জার্মান সেনাবাহিনীতে সাধারণ সেনা হিসেবে যোগ দেন ও বীরত্বের জন্য পুরস্কার পান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি "জার্মান ওয়ার্কাস্" পার্টিতে যোগ দেন। এই পার্টিই পরে "জাতীয় সমাজবাদী দল" বা 'নাৎসী' নাম নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জেনারেল লুডেন্‌ডর্ফে'র সঙ্গে একত্রিত হয়ে এক অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টা করলে ধরা পড়েন ও তাঁর জেল হয়। জেলে বসে তিনি তাঁর বিখ্যাত



হিটলার

গ্রন্থ "মেইন্ ক্যাম্প" বা "আমার সংগ্রাম" নামক পুস্তক রচনা করেন। এই বইতে তিনি নাৎসীবাদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে জাতি ও রাষ্ট্রই সবকিছু। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ব্যক্তি ও সংঘের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে জার্মান জাত পবিত্র জাত— জার্মানদের মধ্যে নাৎসীরা পবিত্র এবং নাৎসীদের মধ্যে হিটলার হলেন একমাত্র নেতা। হিটলার জঙ্গীবাদ-নীতি প্রচার করেন। তিনি ভার্সাই-সন্ধি ভঙ্গ করে জার্মানির হৃতমর্যাদা ফিরিয়ে নিয়ে আসার আহ্বান জানান।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পর নাৎসীদল খুব প্রভাব বিস্তার করে। দিশেহারা ও হতাশাগ্রস্ত জার্মান যুবসম্প্রদায় হিটলারের নীতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়। হিটলার তাঁর বক্তৃতায় জার্মান যুবকদের জাতীয়তাবাদে উন্মত্ত করে তোলেন। তিনি এক 'ঝটিকাবাহিনী' তৈরি করেন। এতে যুবকরা, অবসরপ্রাপ্ত সেনাগণ ও বেকারগণ যোগ দেয়। এরা সামরিক পোশাক পরত ও 'স্বস্তিকা-চিহ্ন'-যুক্ত ব্যাজ ব্যবহার করত। হিটলারের ঝটিকাবাহিনী সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করত। ঝটিকাবাহিনীর সাহায্যে নাৎসীরা অন্যান্য দলের সভা-সমিতি ভেঙ্গে দিত। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীদল আইনসভায় একমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হওয়ায় প্রেসিডেন্ট হিডেন্‌বুর্গ হিটলারকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রী-পদে থেকেই তিনি পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। নির্বাচনের

আগে কে বা কারা পার্লামেন্ট-ভবনে আগুন লাগায়, —হিটলার এই কাজ কমিউনিস্টদের বলে প্রচার করেন। নির্বাচনে নাৎসীদল বিপুলভাবে জয়লাভ করল। রেইখ্‌স্ট্যাগ বা পার্লামেন্ট আইন করে চার বছরের জন্য সব ক্ষমতা হিটলারের হাতে অর্পণ করে।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি "ফুয়েরার" বা প্রধান বলে অভিহিত হন। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে হিটলার নাৎসী-বিরোধী কোনো দল ও ব্যক্তি যাতে জার্মানিতে থাকতে না পারে, সেই ব্যবস্থা করেন। অভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন, সামরিক শক্তিবৃদ্ধি, ভোগ্য-সামগ্রী ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত, সাম্যবাদী দল ও ইহুদী-দমন ছিল হিটলারের অভ্যন্তরীণ কর্মসূচী। ভার্সাই-সন্ধির প্রতিশোধ গ্রহণ করা ও সমস্ত জার্মানকে নিয়ে জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য।

জাতিসংঘ ঃ প্রত্যেক যুদ্ধের পর মানুষের মনে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরেও মানুষের মনে এইরকম মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। শান্তির আকাঙ্ক্ষা থেকেই 'জাতিসংঘ' নামক সংস্থার উদ্ভব হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইল্‌সন তাঁর ১৪ দফা শর্তের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ভার্সাই-সন্ধিতে 'লীগ' বা জাতিসংঘ-চুক্তিপত্র গৃহীত হয়। জাতিসংঘের উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখা; বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পরস্পর সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি, সাহায্য ও সমবায় বৃদ্ধি করা। ন্যায় ও সততার ভিত্তিতে পরস্পরের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা ও আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি মেনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ-বিসংবাদ মিটিয়ে নেওয়া।


উইল্‌সন

জাতিসংঘের একটি সাধারণ সভা, একটি পরিষদ ও একটি দপ্তর ছিল। প্রতি বছর সাধারণ সভার একটি অধিবেশন বসত। জাতিপুঞ্জের সদরদপ্তর

ছিল জেনেভা শহরে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সমস্যা সমাধানের জন্য ও আন্তর্জাতিক আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নের মীমাংসার জন্য জাতিপুঞ্জের অধীনে আন্তর্জাতিক শ্রমিক-সংস্থা ও আন্তর্জাতিক বিচারালয় ছিল।

১৯২০ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষার চেষ্টা করে। তুরস্ক ও ইরাকের মধ্যে বিরোধ জাতিসংঘের চেষ্টায় মিটেছিল। গ্রীস ও বুলগেরিয়ার বিবাদ, পোল্যাণ্ড ও লিথুয়ানিয়ার বিবাদ জাতিসংঘের চেষ্টায় সমাধান হয়। কিন্তু ইঙ্গ-মিশর, ইঙ্গ-চীন বিরোধে ও নিকারাগুয়ার অভিযোগে জাতিসংঘ পক্ষপাতিত্ব দেখায়। ম্যাণ্ডেট ও সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধান ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য জাতিসংঘ চেষ্টা চালায়।

জাপান ও জার্মান জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করলেই পতন শুরু হয়। জাতিসংঘ কোন সিদ্ধান্ত সদস্য-রাষ্ট্রের ওপর জোর করে কার্যকর করতে পারত না। জাতিসংঘের নিজস্ব কোনও সৈন্যবাহিনী ছিল না। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর নীতিই জাতিসংঘের পতনের কারণ। জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে ও জাতিসংঘের সদস্য-পদ ত্যাগ করলে জাতিসংখের দুর্বলতা প্রকাশ পায়। পরবর্তী কালে মুসোলিনী ইথিওপিয়া আক্রমণ করলে ও হিটলার ভার্সাই-সন্ধি অগ্রাহ্য করলে জাতি-সংঘ কোন বাধা দিতে পারেনি। এইভাবে জাতিসংঘের পতন হয়।

প্রশ্নাবলী

১। ভার্সাই-সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়? এই সন্ধির শর্তগুলি কি কি? এই সন্ধির দ্বারা জার্মানী কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হয় আলোচনা কর।

২। ইটালীতে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস লেখ।

৩। যুদ্ধোত্তর জার্মানির সমস্যাগুলি আলোচনা কর। জার্মানিতে হিটলার কিভাবে ক্ষমতা হস্তগত করেন তা বর্ণনা কর।

৪। জাতিসংঘের উৎপত্তি, লক্ষ্য এবং ইহার প্রধান প্রধান সংস্থাগুলির গঠনপ্রণালী, কর্ম ও ক্ষমতা সম্বন্ধে যাহা জান লেখ।

৫। জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আলোচনা কর।

১৫

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
(Second World War)

কারণঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাক্ষরিত ভার্সাই-চুক্তির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ নিহিত ছিল। ভার্সাই-সন্ধিতে জার্মানির ওপর এমন সব কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়েছিল, যা তার পক্ষে কোন ক্রমেই মেনে চলা সম্ভব ছিল না। এর ফলে জার্মানি বুঝতে পারে যে, একমাত্র সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেই তার পক্ষে ঐ সন্ধির অন্যায় শর্তগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হতে পারে। চুক্তি তৈরির ও আলোচনার সময়ে জার্মান প্রতিনিধিদের মতামতের মূল্য দেওয়া হয়নি। ভার্সাই-সন্ধি গ্রহণ করতে জার্মানিকে বাধ্য করা হয়েছিল। সন্ধির ত্রুটিগুলি সম্পর্কে জার্মান প্রতিনিধিরা মতামত জানালে সেগুলি অগ্রাহ্য করে সন্ধির শর্তাবলী রচনা করা হয়েছিল। শর্তগুলি গ্রহণ না করলে পুনরায় যুদ্ধ করা হবে এই ভয় দেখিয়ে জার্মান প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জোর করে অনুমোদন আদায় করা হয়েছিল। এইজন্য জার্মানজাতি ভার্সাই-সন্ধিকে "জবরদস্তিমূলক চাপানো" সন্ধি বলত। তারা এই সন্ধি মানবার জন্য কোন নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করত না। জার্মানির মত জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ও শক্তিশালী জাতির পক্ষে এরূপ অপমানজনক শর্তাদি মেনে চলা সম্ভব ছিল না। কাজেই, জার্মানি ভার্সাই-চুক্তির শর্তগুলি ভাঙ্গতে বদ্ধপরিকর ছিল। এই হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ।

জার্মানিতে নাৎসীদের উত্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। হিটলার ও নাৎসীদের উদ্দেশ্য ছিল—(১) ভার্সাই-সন্ধির শর্তগুলিকে অস্বীকার করা; (২) ইউরোপে জার্মানজাতির লোকদের নিয়ে বৃহত্তর জার্মানি গঠন করা; (৩) যেহেতু জার্মানরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, সুতরাং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলির ওপর জার্মানির আধিপত্য বিস্তার করা। হিটলারের এই নীতিগুলি কার্যকর করার জন্য যুদ্ধ ভিন্ন উপায় ছিল না; এবং সেই যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধ।

হিটলারের পররাষ্ট্রনীতিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য বহুলাংশে দায়ী। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার জার্মানিকে জাতিসংঘ থেকে সরিয়ে আনেন ও বিপুলভাবে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল ও পোল্যাণ্ডের দিকে হাত বাড়ালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।

দূর প্রাচ্যে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতিও বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে। জাতিসংঘ জাপানের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়। এইভাবে জাপানের সন্ত্রাসের নীতি বিশ্বের শান্তি ব্যাহত করে।

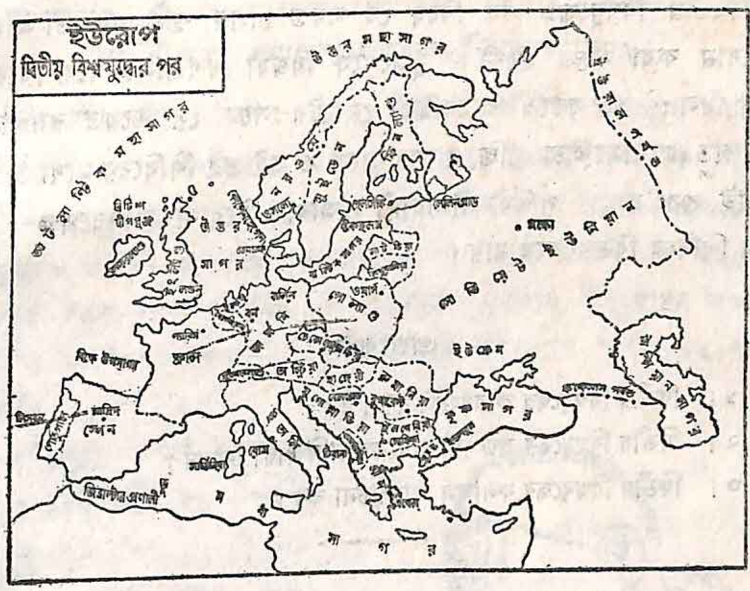
ইটালীও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য কিছু দায়ী। মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট দল ক্ষমতালাভের পর সম্প্রসারণ-নীতি গ্রহণ করে। ইটালীর পররাষ্ট্র-নীতির লক্ষ্য ছিল পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে দখল করা। ইটালী ইথিওপিয়া দখল করলে জাতিসংঘের ক্ষতি হয়।

জার্মানি, জাপান ও ইটালী মিলিত হয়ে রাষ্ট্রজোট গঠন করলে বিশ্ব-যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে হিটলার জাপানের সঙ্গে সাম্যবাদ-বিরোধী "কমিণ্টার্ন-বিরোধী"-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ইটালীও ঐ চুক্তি সাক্ষর করে। তিনটি রাষ্ট্র পরস্পর স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়। হিটলার আগামী যুদ্ধে যাতে পূর্ব ও পশ্চিম দু'দিকেই যুদ্ধ করতে না হয়, সেইজন্য ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সঙ্গে অনাক্রমণ-চুক্তি সই করে। রাশিয়াও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত না হওয়ায় আপাতত সময় নেওয়ার জন্য অনাক্রমণ-চুক্তি সই করতে রাজী হয়। এর ফলে হিটলারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের জার্মানি, জাপান ও ইটালী তোষণ-নীতিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। প্রথম থেকেই যদি ইংলণ্ড ও ফ্রান্স একত্রে জার্মানি, জাপান ও ইটালীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করত, তবে হয়ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে রোধ করা যেত।

হিটলার অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেই সন্তুষ্ট হলেন না। মিউনিখ-চুক্তি ভঙ্গ করে পোল্যাণ্ডের ডান্‌জিগ্ বন্দর ও পোলিশ করাইডোর দাবি করলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তোষণ-নীতি ত্যাগ করে প্রতিরোধের পথে

অগ্রসর হয়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বুঝতে পারল যে জার্মানিকে বাধা না দিলে হিটলার সমগ্র ইউরোপ দখল করে নেবে। ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। এর দু'দিন পরে ৩রা সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়।



ফলাফল : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের ক্ষতি হয়েছিল অধিক। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই এই যুদ্ধের ফল ভোগ করে। যুদ্ধের পর পরাজিত রাষ্ট্রগুলি মিত্রবাহিনীর অধীনে চলে আসে। জার্মানি দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়। পূর্ব জার্মানি রাশিয়ার সামরিক শাসনের অধীনে আসে আর পশ্চিম জার্মানি আমেরিকা, ফরাসী ও ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রায় সম্পূর্ণ পূর্ব ইউরোপ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে থাকল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জাপান ও জাপান-অধিকৃত অঞ্চলে আমেরিকার সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া ও আলবানিয়া স্বাধীন হলে ঐসব দেশে রাশিয়ার প্রাধান্য স্বীকৃত হল। এইসব দেশে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। নতুন নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ও পুরানো শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর পুরাতন মানচিত্র পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ নিল। দ্বিতীয় বিশ্ব-

যুদ্ধের পর ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন দেশে পরিণত হয়। চীনে বিপ্লবের ফলে মাও-সে তুংয়ের পরিচালনায় সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' নামে এক আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে যে সমস্যাগুলির সৃষ্টি হয়, তা আজও সমাধান করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধশেষে বিজয়ী দেশগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিল; ইঙ্গ-ফরাসী আমেরিকা জোটের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রমাগত মনোমালিন্য বৃদ্ধি পেতে থাকে ও এই দুই শিবিরের মধ্যে ঠাণ্ডা-লড়াই শুরু হল। পৃথিবী সাম্যবাদী সাম্যবাদ-বিরোধী ও নিরপেক্ষ—এই তিন শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

প্রশ্নাবলী

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।
২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য হিটলার কতখানি দায়ী ছিলেন ?
৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর।

১৬ ভারতবর্ষ, ১৯১৯-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ
(India, 1919-1947)

স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিভিন্ন স্তর

অসহযোগ আন্দোলন : ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপন্থা ঘোষণা করেন। অনেক নেতা, যেমন—মহম্মদ আলী জিন্না, চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেও প্রস্তাবটি ভোটাধিক্যে পাস হয়ে যায়। ঐ বছরেই নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেস এই পরিকল্পনা পুনরায় অনুমোদন করলে গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে যুগ্মভাবে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।


গান্ধীজী

অসহযোগ আন্দোলনে হিংসার স্থান ছিল না। অসহযোগের মূল কর্মসূচী ছিল—সরকারী খেতাব বর্জন, স্কুল-কলেজ বর্জন, অফিস-আদালত বর্জন, বিলাতী দ্রব্য বর্জন, জাতীয় শিক্ষানীতি গ্রহণ, জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার ও দেশের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। গান্ধীজীর আহ্বানে দেশের বিপুল জনসাধারণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেয়। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যারিস্টার, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, ছাত্র-ছাত্রী, কর্মচারী, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ত্যাগ করে বৃটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করার প্রতিজ্ঞা করে।

কর্মহীন শ্রমিক, কারখানার কর্মী, শহরের দরিদ্র নাগরিক—সবাই এসে যোগ দিতে লাগল। এই আন্দোলনের সময় কতকগুলি বড় বড় ধর্মঘট হয়।

ধর্মঘট আসামের চা-বাগানে ও দেশের প্রধান প্রধান কয়লাখনি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। খাজনা বন্ধের আহ্বান কংগ্রেস দিতে শুরু করায় কৃষকরাও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেদিনীপুরের কৃষকেরা স্থির করল, তারা ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স ও খাজনা দেবে না। বাংলাদেশে প্রথম কৃষক-সংঘও এই সময় গঠিত হল। অন্ধ্রপ্রদেশেও কৃষকরা আন্দোলনে নেমে পড়ল। উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলী ও ফৈজাবাদের ভাড়াটিয়া প্রজারা বেআইনী খাজনা দেওয়া বন্ধ করল। জাতীয় রাজনীতিতে এই সময় জওহরলাল নেহেরুর কর্মজীবন শুরু হয়। এই আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের দমন-নীতিও চরমে উঠল। গান্ধীজী গুজরাটের বরদৌলীতে 'অহিংস সত্যাগ্রহ' করবেন স্থির করলেন। এই সময় গোরখপুর জেলার চৌরিচেরা গ্রামে সত্যাগ্রহীরা একটি পুলিশ-চৌকিতে আগুন দিলে ২২ জন কন্‌স্টেবল মারা যায়। অহিংসার পথ থেকে আন্দোলন হিংসার পথ নিচ্ছে দেখে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। আন্দোলন প্রত্যাহার করলেও সরকার গান্ধীজীকে কারারুদ্ধ করল। এই আন্দোলনের ফলে একটা জাতীয় চেতনা গড়ে ওঠে এবং কংগ্রেস একটি সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

আইন-অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-৩৪ খ্রীষ্টাব্দ)

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর জাতীয় আন্দোলনে কিছুদিন ভাঁটা পড়ে। মহাত্মা গান্ধী এই সময় জেলে থাকায় দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার মত উপযুক্ত নেতা ছিল না। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী জেল থেকে মুক্তি পেলে জাতীয় আন্দোলন পুনরায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার-আইন পর্যালোচনার জন্য দশ বছর পর একটি কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার স্যার সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন পাঠায়। এই কমিশনে কোনও ভারতীয় সভ্য না থাকায় কংগ্রেস 'সাইমন কমিশন' 'বয়কট' করে। দেশের সর্বত্র "সাইমন ফিরে যাও" ধ্বনিতে মুখরিত হয়। ঝিমিয়ে-পড়া জাতীয়তাবাদ এই আন্দোলনে আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের মাদ্রাজ

অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় কমিটির ওপর সংবিধানের খসড়া তৈরির ভার দেওয়া হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেসে নেহেরু কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়। এই রিপোর্টে বৃটিশ শাসনের অধীনে স্বায়ত্তশাসন (ডোমিনিয়ন) আদায় আদর্শ হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। পুরাতনপন্থীরা ডোমিনিয়ন দাবিকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণের দাবি জানান। তরুণদের নেতা কংগ্রেসের তুই সম্পাদক জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন ও পূর্ণস্বরাজের দাবিতে অটল থাকেন। শেষ পর্যন্ত কলকাতা কংগ্রেসে স্থির হল যে, এক বছরের মধ্যে সরকার 'ডোমিনিয়ন বা স্বায়ত্তশাসন' না দিলে পূর্ণস্বরাজ দাবি করা হবে।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট লর্ড আরউইন 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের চাপে তিনি এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বরাজ আদর্শ হিসেবে গৃহীত হল। জাতীয় কংগ্রেস লক্ষ্যপূরণ না হওয়া পর্যন্ত আইন-অমান্য আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবও গ্রহণ করে। মহাত্মা গান্ধীকে আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে কংগ্রেস-সভাপতি জহরলাল নেহেরু ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা তুলে আন্দোলনের সূচনা করলেন। ঠিক হল যতদিন না স্বাধীনতালাভ হচ্ছে, ততদিন ২৬শে জানুয়ারি দিনটি 'স্বাধীনতা দিবস' হিসেবে পালন করা হবে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি মহা উদ্দীপনার মধ্যে দিনটি উদ্‌যাপিত করা হয়।


জওহরলাল নেহেরু

মহাত্মা গান্ধী "ইয়ং ইণ্ডিয়া" কাগজে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে ১১ দফা শাসনসংক্রান্ত-সংস্কারের প্রস্তাব করলেন। যদি ইংরেজ সরকার তাঁর এইসব প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে

নেওয়া যেতে পারে বলে জানালেন। ৬ই মার্চ গান্ধীজী আরউইনকে জানালেন যে, অবিলম্বে ১১ দফা আইন ও শাসন-সংক্রান্ত সংস্কার কার্যকর না করলে ব্যাপকভাবে আইন-অমান্য আন্দোলন করা হবে।

শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী মন স্থির করলেন। ঠিক হল তিনি ৭৮ জন তাঁর অনুগামী নিয়ে গুজরাটের সবরমতী আশ্রম থেকে রওনা হয়ে সমুদ্রের তীর দিয়ে ২০০ মাইল পায়ে হেঁটে গিয়ে ডাণ্ডিতে পৌঁছবেন। সেখানে তিনি প্রকাশ্যে সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করে সরকারী আইন অমান্য করবেন। গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযান থেকে সারা দেশে জাতীয় চেতনা ছড়িয়ে পড়ল। সত্যাগ্রহ শুরু করার আগেই গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করা হল। লবণ-আইন ভঙ্গ করে এইভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায় শুরু হল। চব্বিশ-পরগনা জেলার মহিষবাথানে, মেদিনীপুরের কাঁথিতে, গুজরাটের ধারসানা ও ওয়াড়ালাতে লবণ-আইন ভঙ্গ ও সত্যাগ্রহ চলে। দেশের বিভিন্ন শহরে, গঞ্জে, গ্রামে বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট ইত্যাদি পন্থায় আইন-অমান্য চলতে থাকে। পেশোয়ারের এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন "সীমান্ত-গান্ধী" আবদুল গফ্‌ফর খাঁ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম ছিল "খোদাই-খিদ্‌মত্‌গার" অর্থাৎ ভগবানের সেবক। এই দলের স্বেচ্ছাসেবকরা লাল রঙের পোশাক পরত বলে এদের "লাল কোর্তা" বলা হত। সরকার কঠোর দমন-নীতির সাহায্যে এই আন্দোলন স্তব্ধ করে দিতে চাইল। বিভিন্ন শহরে জনতার ওপর পুলিশ নির্বিচারে গুলি ও লাঠি চালায়। কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করে বহু নেতাকেও গ্রেপ্তার করা হয়।


আবদুল গফ্‌ফর খাঁ

আইন-অমান্য আন্দোলন যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছে, তখন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকার লণ্ডনে এক 'গোল টেবিল বৈঠক' ডাকেন। কংগ্রেস প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেয়নি। বৃটিশ সরকার মহাত্মা গান্ধীকে মুক্তি

দেয় ও কংগ্রেসের সঙ্গে আপসের জন্য সর্ববিধ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ও বড়লাট আরউনের মধ্যে এক চুক্তি হয়। তার ফলে সরকার সব আইন রদ করে ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়। অন্যদিকে কংগ্রেস আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখতে ও গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হল। গান্ধীজী বৈঠকে যোগ দিয়ে খালিহাতে দেশে ফিরলেন। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে তাঁর সঙ্গে অন্য প্রতিনিধিদের মত-বিরোধ হয়। গান্ধীজী দেশে ফিরে পুনরায় আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। দ্বিতীয় পর্বে কংগ্রেসের প্রচুর স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হয়। কংগ্রেসের কাগজপত্র ও তহবিল বাজেয়াপ্ত হল। এই অবস্থায় সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ঘোষণা করলে গান্ধীজী আমরণ অনশন শুরু করেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ডাঃ বি. আর. আম্বেদকর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে "পুনা-চুক্তি" সই করে পৃথক নির্বাচনকেন্দ্রের দাবি ত্যাগ করলেন। ভারতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে বিপুল প্রতিক্রিয়া হলে সরকার জনমতের চাপে এই প্রস্তাব বাতিল করে। আইন-অমান্য আন্দোলনে ভাটা পড়ে গেল। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের নির্দেশে আইন-অমান্য আন্দোলন তুলে নেওয়া হল।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত সরকার' আইন পাস হল। ভারতীয় প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়। প্রতি প্রদেশে একটি নির্বাচিত আইনসভা থাকবে ও শাসনভার থাকবে একটি মন্ত্রিসভার হাতে। মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য হবেন ও তাঁদের নিয়োগ করবেন প্রাদেশিক গভর্নর। কেন্দ্রে ভাইস্‌রয় প্রয়োজনবোধে আইনসভা ও মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নাকচ করার অধিকার পান। সরকার দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ করবে না, এই প্রতিশ্রুতি দিলে কংগ্রেস নির্বাচনে অংশ নিতে রাজী হয়।

'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন : ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সঙ্গে পরামর্শ না করে ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করার বিরুদ্ধে কংগ্রেস প্রতিবাদ করে ও মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করে।

কংগ্রেস পদত্যাগ করলেও মুসলিম লীগ পদত্যাগ করল না। তারা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে মহম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে "পাকিস্তান" গঠনের দাবি করে। ভারতের মুসলিম-গরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে "পাকিস্তান"

নামে পৃথক রাষ্ট্রগঠনের প্রস্তাব করা হয়। সুভাষচন্দ্র বসু এই সময় কংগ্রেসের নেতা বল্লভভাই প্যাটেল, রাজা গোপালাচারী, গান্ধীজী প্রভৃতির সঙ্গে একমত হতে না পেরে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে এক নতুন দল গঠন করেন।

বৃটেন সর্বত্র পরাজিত হতে থাকলে কংগ্রেস জাতীয় সরকার গঠনের বিনিময়ে সরকারকে সাহায্যদানের প্রস্তাব করলে ভাইস্রয় এতে রাজী হলেন না। তিনি ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধ-শেষে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন মর্যাদা' দেওয়া হবে ও একটি সংবিধান-সভা গঠন করা হবে। পূর্ণস্বরাজের উল্লেখ না থাকায় কংগ্রেস এই প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে।

জাপান যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠল। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপ্‌স্‌কে ভারতে পাঠালেন বোঝাপড়ার জন্য। ক্রীপ্‌সের প্রস্তাব কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না।

একদিকে ক্রীপ্‌স্‌ মিশনের ব্যর্থতা, অন্যদিকে ভারতের দিকে জাপানের অগ্রগতি ভারতীয় নেতাদের জোরদার আন্দোলনে উৎসাহিত করল। দেশে এই সময় দারুণ হতাশা দেখা দিয়েছিল। ভারতীয়রা বুঝতে পারল যে, ইংরেজ সরকার ক্ষমতা ছাড়তে অনিচ্ছুক। মহাত্মা গান্ধী তখন ইংরেজদের ভারত ছাড়ার উপদেশ দিলেন। গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই জাতীয় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ঐতিহাসিক "ভারত ছাড়" প্রস্তাবটি গ্রহণ করে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট কংগ্রেস ব্যাপক অহিংস গণ-আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গান্ধীজী ভারতের এই মুক্তি-সংগ্রামে সমস্ত দেশবাসীকে যোগদানের আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন, "আমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হব না। আমরা দেশকে স্বাধীন করব, না-হয় ঐ চেষ্টায় মৃত্যুবরণ করব"। (করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে)

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই আগস্ট গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতাকে গ্রেপ্তার করা হল। কংগ্রেসকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হয়। এই খবর প্রচারিত হলে চারদিকে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ও তীব্র আন্দোলন

শুরু হয়ে যায়। সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস, রেললাইন অপসারণ, টেলিগ্রাফ লাইন বিচ্ছিন্নকরণ, পুলিশ ও থানা আক্রমণ ইত্যাদি হিংসাত্মক কাজ জনসাধারণ করতে আরম্ভ করে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এই আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ নেয়। বাংলাদেশে মেদিনীপুরের মাতঙ্গিনী হাজরা ও রামচন্দ্র বেরা প্রমুখ নেতার অবদান উল্লেখযোগ্য। ৪২'-এর ব্যাপক গণ-আন্দোলন দমন করার জন্য সরকার নির্যাতন ও দমনমূলক ব্যবস্থা নেয়। জনসাধারণের হিংসাত্মক কাজ গান্ধীজীকে ব্যথিত করে। তিনি একুশ দিনের অনশন শুরু করেন। তাঁর শারীরিক অবনতি ঘটলে সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়।



মাতঙ্গিনী হাজরা

আজাদ হিন্দ ফৌজ : ভারতের ভিতরে যখন "ভারত ছাড়" আন্দোলন চলছিল, তখন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ভারতের বাইরে থেকে স্বাধীনতা আদায়ের জন্য সশস্ত্র আক্রমণের কথা চিন্তা করছিলেন। যুদ্ধের শুরুতে তিনি কলকাতায় বন্দী হন। অসুস্থতার জন্য মুক্তি পেয়ে স্বগৃহে অন্তরীণ হয়ে থাকেন। ঐ অবস্থায় পুলিশ গোয়েন্দার চোখে ধুলো দিয়ে তিনি ছদ্মবেশে দেশত্যাগ করে আফগানিস্থান হয়ে জার্মানিতে পৌঁছান। ইংরেজ-শত্রু জার্মানি সুভাষ-চন্দ্রকে সাদরে গ্রহণ করে। সেখানে তিনি জার্মানির হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অভি-প্রায় ঘোষণা করেন। এই সময় জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করে। অল্পদিনের মধ্যে



নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

জাপান মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ দখল করে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে জাপানে "ভারতীয় স্বাধীনতা-সংঘ" নামে এক বিপ্লবী সংস্থা স্থাপিত হয়। এই সংস্থা ঠিক করে, বৃটিশ শাসন থেকে ভারতের মুক্তির জন্য "আজাদ হিন্দ্ ফৌজ" গঠন করা হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় ও জাপানের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে এই সৈন্যদল গঠিত হবে। রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে জাপানে আমন্ত্রণ জানালে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রা করে সুভাষচন্দ্র টোকিওতে উপস্থিত হন। সিঙ্গাপুরে এলে তাঁকে বিপুল অভ্যর্থনা করা হয়। তাঁকে "ভারতের স্বাধীনতা-সংঘ" ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত করা হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর সুভাষচন্দ্র স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন। এরপর শুরু হয় আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভারত অভিযান। প্রথমে তারা সীমান্তে মউডক আক্রমণ করে দখল করে। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলও আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসে। দুর্ভাগ্যবশত এই সময় জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ পিছু হঠতে বাধ্য হয়। কিছুকাল যুদ্ধ চলার পর এই বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ব্যর্থ হলেও দেশের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব জাতীয়তা-বোধের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নেতাদের বিচার শুরু হয়। কংগ্রেস আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর নেতাদের সমর্থন ও সাহায্য করে। জনমত প্রবলভাবে সমর্থন করায় এই বাহিনীর নেতারা মুক্তিলাভ করেন।

ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা-লাভ : চারদিকে যখন বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছিল, ঠিক তখন (১৯৪৬ খ্রীঃ, ১৮ই ফেব্রুয়ারি) বোম্বাইয়ে নৌ-বাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়। নৌ-সেনারা স্বল্প বেতন, খারাপ খাদ্য ও বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে অনশন শুরু করে। এই বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ভারতীয়দের সমর্থনে এই বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কংগ্রেস-নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের প্রচেষ্টায় এই বিদ্রোহ শান্ত হয়।

যুদ্ধের পর ইংলণ্ডে শ্রমিকদল সরকার গঠন করে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এট্‌লী ভরেতের অবস্থা পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার না করে আর উপায় নেই। এইজন্য তিনি এক মন্ত্রিমিশন ভারতে পাঠান। মন্ত্রিমিশনের সঙ্গে আলোচনায় ভারতের নেতারা একমত হতে পারলেন না। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ একমত হতে না পারায় মন্ত্রিমিশন তাঁদের নিজেদের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তাঁদের প্রস্তাব ছিল ভারতের বৃটিশ-শাসিত রাজ্য ও দেশীয় রাজ্য নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র তৈরি করা; ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সংবিধান-সভা গঠন করা; এবং সংবিধান তৈরি না-হওয়া পর্যন্ত সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান-সভার নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ভাইস্‌রয় লর্ড ওয়াভেল জওহরলাল নেহেরুকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে অনুরোধ করলে মুসলীম লীগ "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে জওহরলাল নেহেরু সরকার গঠন করেন। লর্ড ওয়াভেলের চেষ্টায় মুসলিম লীগ এই সরকারে যোগ দেয়। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ঘোষণা করেন ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে বৃটিশ সরকার দায়িত্বশীল নেতাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে ভারত ত্যাগ করবে। মুসলিম লীগ দায়িত্বশীল বলতে কেবলমাত্র কংগ্রেস অনুমান করে পাঞ্জাবে শিখ ও হিন্দুদের ওপর আক্রমণ চালায়। এই সময় লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের পরোয়ানা নিয়ে ভাইসরয় হয়ে ভারতে আসেন। তিনি কংগ্রেসকে, বিশেষভাবে জওহরলাল নেহেরুকে দিয়ে দেশবিভাগের প্রস্তাব স্বীকার করিয়ে নেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতা-আইন পাস হয়। "ভারত" ও



লর্ড মাউণ্টব্যাটেন

"পাকিস্তান" নামে পৃথক দুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হল। ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ও পাকিস্তান দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম নিল। এইভাবে দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর ভারতবাসী অখণ্ড ভারতকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে স্বাধীনতা লাভ করল।

প্রশ্নাবলী

১। অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কেন? এই আন্দোলনে গান্ধীজীর ভূমিকা আলোচনা কর।

২। আইন-অমান্য আন্দোলনের কারণ কি? এই আন্দোলনে গান্ধীজী কতদূর সফল হয়েছিলেন? কে কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতকে "ডোমিনিয়ন স্টেটাস" দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন?

৩। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত-শাসন আইন সম্পর্কে কি জান? এই আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্খা কতখানি পূরণ করতে পেরেছিল?

৪। গান্ধীজী-আরউইন চুক্তি কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়। আইন-অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। 'ভারত ছাড়' বা আগস্ট আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৬। নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৭। ভারতে নৌ-বিদ্রোহ কত খ্রীষ্টাব্দে কোথায় প্রথম দেখা দেয়? এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৮। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতালাভ ও ভারতবিভাগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৭ চীনের বিপ্লব, ১৯১১-১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ
(Revolution in China, 1911-1949)

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীন রাজতন্ত্রের অবসান হয়ে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডাঃ সান্ স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করে সেনাপতি ইউ-য়ান্-সিকাইকে সেই পদে বসান। নতুন রাষ্ট্রপতি গণতন্ত্রের বদলে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলে বিপ্লবীরা হতাশ হয়ে পড়ে। ইউ-য়ান্-সিকাই-এর শাসনব্যবস্থায় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ পূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় বিপ্লব করার জন্য ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন জনগণের দল বা কুয়োমিন্-তাঙ্ নামে এক নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। তিনি দ্বিতীয় বিপ্লবের ডাক দিলে দক্ষিণের কয়েকটি রাজ্য সাড়া দেয় ও দক্ষিণ চীনে একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই এই সরকারের পতন ঘটে।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউ-য়ান্-সিকাই-এর মৃত্যুর পর চীনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা তু-চুন্ নামে সমরনায়কদের হাতে চলে যায়। রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হল। কেন্দ্রীয় সরকার নামেমাত্র বজায় থাকে। ইউ-য়ানের সামরিক অনুগামীরা তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে। রাজধানী পিকিং-এর অধিকার নিয়ে সর্বদাই আক্রমণ ও প্রতি-আক্রমণ শুরু হয়। ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি ভেঙ্গে পড়ে ও দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার চিহ্নমাত্র থাকে না।

এইরকম অবস্থায় ডাঃ সানের কুয়োমিন্-তাঙ্ দলের পুনরাবির্ভাব ঘটে। উত্তর চীনের সমরনায়কদের সঙ্গে আপস করতে সম্মত না হয়ে ডাঃ সান্ দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন শহরে এক প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন করেন (১৯১৭ খ্রীঃ)। পিকিং-এর ডাঃ সানের পূর্বতন সহকর্মীরা ক্যান্টনে পুনরায় মিলিত হয়ে ডাঃ সান্‌কে চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি-পদে নির্বাচিত করেন। দক্ষিণ চীনের সমরনায়কদের সাহায্যেই ডাঃ সান্ ক্যান্টনে 'চীন সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি

কুয়োমিন্‌-তাঙ দলকে পুনর্গঠিত ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। তাঁর তিন দফা কর্মসূচী সান্‌-মিন-চুয়াই চীনের জনগণের আদর্শে পরিণত হয়েছিল। এই আদর্শের প্রথমে ছিল জাতীয়তাবাদ। চীনারা পরিবার, গোষ্ঠী ও গ্রামের প্রতি অনুগত ছিল, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য তারা জানত না। ডাঃ সানের জাতীয়তাবাদ ছিল রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। তাঁর দ্বিতীয় আদর্শ ছিল গণতন্ত্র। রাজতন্ত্র ও সামরিক একনায়কতন্ত্র উচ্ছেদ করে তিনি জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তৃতীয় আদর্শ ছিল জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এর জন্য প্রয়োজন ছিল সামাজিক বিপ্লবের। চীনের কৃষি-জমি কৃষকদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে তাদের অবস্থার উন্নতির ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন।

৪ঠা মে-এর আন্দোলন: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিয়েছিল। শেষে ভার্সাই-সন্ধিতে জাপানকে সাণ্টুপ্রদেশ দেওয়ার প্রস্তাব করা হলে চীনে ছাত্ররা ৪ঠা মে, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এমন আন্দোলন শুরু করে যে সমস্ত চীন তার ফলে জ্বলে ওঠে। এই আন্দোলন থেকে চীনের জাতীয়তাবাদ শুরু হয়েছে বলে মনে করা হয়। এই আন্দোলনকে 'মে ফোর্থ বা ৪ঠা মে-র আন্দোলন' বলা হয়। চীনের কয়েকজন মন্ত্রী জাপানের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে বলে ছাত্ররা ক্ষেপে ওঠে। তারা এইসব মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করে ও ভার্সাই-সন্ধি যাতে অনুমোদন না করা হয়, তার দাবি জানায়। পুলিশী অত্যাচার সহ্য ক'রে, এবং কারাবরণ করেও তারা আন্দোলন বন্ধ করে না। কিছুদিনের মধ্যে ব্যবসায়ী ও শ্রমিকরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং জাপানী জিনিস বয়কট শুরু করে। জনগণের চাপে সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হয়। সন্দেহভাজন মন্ত্রীরা পদত্যাগ করে ও সরকার ভার্সাই-সন্ধি অনুমোদন করে না। এই আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের আকৃতি নেয় এবং এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হয়।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ডাঃ সান্‌-ইয়াৎ-সেন উত্তর চীনের সমরনায়কদের সঙ্গে আলোচনার জন্য পিকিং-এ যান। সেইখানেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন ও পরলোকগমন করেন। ডাঃ সান্‌-ইয়াৎ-সেনকে "চীনের বিপ্লবের জনক" বলা হয়।

১৯২১ থেকে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুয়োমিন্ তাঙ্ ও কমিউনিস্ট দলের সম্পর্ক : ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট দলের সৃষ্টি হয়। মাও-সে-তুং, লি-সাউ-চি, চৌ-এন্-লাই ও চুতে ছিলেন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠার সময়ে প্রধান নেতা। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সানের সঙ্গে চীন সাধারণতন্ত্রের সেনাপতি জেনারেল চেন্-এর মতবিরোধ হলে কিছুদিনের জন্য ডাঃ সান্ কোয়াংটু ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই সময় কমিউনিস্ট দল ও সোভিয়েত রাশিয়া তাঁকে সাহায্য করে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সান্ পুনরায় দক্ষিণ চীনের চীন-সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে রাশিয়ার কাছে উদার-ভাবে সাহায্যের জন্য আবেদন করেন। এই সময় ডাঃ সান্ কুয়োমিন্-তাঙ্ ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য তাঁর নীতির কিছু পরিবর্তন করেন। রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী, কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাহায্য দান—এই তিনটি নীতি গ্রহণ করায় কমিউনিস্ট দল কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের সঙ্গে মিশে যায় (১৯২৪ খ্রীঃ)। রাশিয়াও ডাঃ সান্‌কে সাহায্য করার জন্য মাইকেল বোরদিনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পাঠায়। ডাঃ সানের শিষ্য চিয়াং-কাইশেকের অধীনে রাশিয়ার সাহায্যে ওয়াম্‌পোয়াতে এক সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ক) ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর কুয়োমিন্ তাঙ্ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে বিচ্ছেদ

ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং-কাইশেক কুয়োমিন্ তাঙ্ দলের নেতৃ-পদে বসেন। তখনও চীনে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। মধ্য ও দক্ষিণ চীনে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও, উত্তর চীনে সমর-নায়কদের শাসন চলছিল। ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেনের মত চিয়াং-কাইশেকও চীনকে ঐক্যবদ্ধ করার সংকল্প নিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর চীন অভিযান আরম্ভ হলেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে চিয়াং-এর বিরোধ বাধে। চিয়াং-এর ওপর উত্তর চীন অভিযানের সর্বময় দায়িত্ব ছিল। চিয়াং-কাইশেক হ্যান্‌চাং-এ পৌঁছবার আগেই কমিউনিস্ট প্রভাবিত সৈন্য-বাহিনী হ্যান্‌কাও দখল করে নেয়। উত্তর চীন অভিযান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যান্টন সরকার কমিউনিস্ট প্রভাবে চলে আসে। চিয়াংকে

সৈন্যবাহিনীর প্রধানের পদ থেকে অপসারিত করা হল ও সরকারকে হ্যান্‌কাওয়ে সরিয়ে আনা হল। নান্‌কিং কমিউনিস্টদের দখলে এলে চিয়াং ও কুয়োমিন্ তাঙ্‌রা সাংহাই-এ সরে যায়। নান্‌কিং-এ কমিউনিস্টরা পৃথক সরকার স্থাপন করে,—কিন্তু বেশীদিন এই সরকার রক্ষা করা সম্ভব হল না। চিয়াং-এর সেনাবাহিনী নৃশংসভাবে কমিউনিস্টদের দমন করে নান্‌কিং দখল করে নিল। কুয়োমিন্ তাঙ্ দল থেকে কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করা হল ও তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হল।

কমিউনিস্টদের অপসারিত করে চিয়াং উত্তর চীন অভিযান পুনরায় শুরু করেন ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে পিকিং দখল করেন। চীনের রাজধানী পিকিং থেকে নান্‌কিং-এ সরিয়ে আনা হয়।

ইতিমধ্যে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কিয়াংসি প্রদেশে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তিনি খনি-শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য কমিউনিস্টদের নিয়ে বিপ্লবী সেনাবাহিনী তৈরি করে হুনান্ প্রদেশ থেকে উত্তর কিয়াংসি প্রদেশে কমিউনিস্ট প্রভাব বৃদ্ধি করলেন। ক্রমাগত কুয়োমিন্ তাঙ্ সরকারের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তিনি দুর্ভেদ্য চিংক্যান্‌সান্ পর্বত অঞ্চলে



মাও-সে-তুং



চিয়াং কাইশেক

আশ্রয় নেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কিয়াংসি, ফুকিয়েন্, হুনান্, হুপে, কোয়াংসি ও সেন্‌সি প্রদেশগুলিতে কমিউনিস্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চিয়াং-কাইশেকের অধীনস্থ

জাতীয়তাবাদী সৈন্যবাহিনী পরপর পাঁচবার কমিউনিস্টদের ঘিরে ধরে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়। চিয়াং-এর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কৃষক-শ্রমিক সৈন্যবাহিনী মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে সেন্‌সি প্রদেশে পৌঁছবার জন্য লং-মার্চের পরিকল্পনা নেয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তারা কিয়াংসি থেকে কুয়োমিন্ তাঙ্‌দের বাধা অগ্রাহ্য করে রওনা হয়। এই লালবাহিনী ফুকিয়েন্ হয়ে কিয়াচাউ-এ পৌঁছায়। তীব্র শীত ও প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যদের আক্রমণ অতিক্রম করে তারা সুনই প্রদেশে আসে। সুনই থেকে যুদ্ধ করতে করতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সেচুয়ান্ ও উনান্ প্রদেশে পৌঁছায়। সেচুয়ান্-সিকাং সীমান্তে পর্বত অতিক্রম করে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে সেন্‌সি প্রদেশের উত্তরে পৌঁছায়। এক বছরে এই লং-মার্চে ৬০০০ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করতে হয়েছে যুদ্ধ করতে করতে। ইতিহাসে এইরকম দৃষ্টান্ত বিরল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করেছিল। চিয়াং সরকার জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসুক ছিল না। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং-কাইশেক সিয়াং এলে তাঁর সৈন্যরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে একসাথে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাজী করার জন্য তাঁকে বন্দী করে। কমিউনিস্ট নেতা চু-এন্‌-লাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে সাময়িক ভাবে গৃহযুদ্ধ বন্ধ রেখে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তাব দেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কুয়োমিন্ তাঙ্ ও কমিউনিস্ট দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ রাখার চুক্তি হল। কমিউনিস্ট ও কুয়োমিন্ তাঙ্ উভয় দল নিয়ে "জনগণের রাজনৈতিক সমিতি" গঠন করা হল। জাপানের বিরুদ্ধে যৌথভাবে যুদ্ধ করার নীতি গ্রহণ করা হয়। এই যুদ্ধই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে কুয়োমিন্ তাঙ্ সরকারের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে চীনে পুনরায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। কমিউনিস্টরা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম চীনে প্রভাব বিস্তার করে। আমেরিকা চেষ্টা করে এই গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে না পেরে কুয়োমিন্ তাঙ্‌দের সাহায্য করতে আরম্ভ করে। ক্রমে মাঞ্চুরিয়া, সাংহাই, সান্‌সি, হোনান্ কমিউনিস্টদের অধিকারে চলে যায়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লাল সেনা পিকিং দখল করে চীন গণ-প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করে। মাও-সে-তুং এই প্রজাতন্ত্রের সভাপতি

নির্বাচিত হন। চিয়াং-কাইশেক ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় নিয়ে চীনা জাতীয়তাবাদী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করলেন।

চীন মূল-ভূখণ্ডে অক্টোবর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীন গণতান্ত্রিক শাসন স্থাপিত হয়।

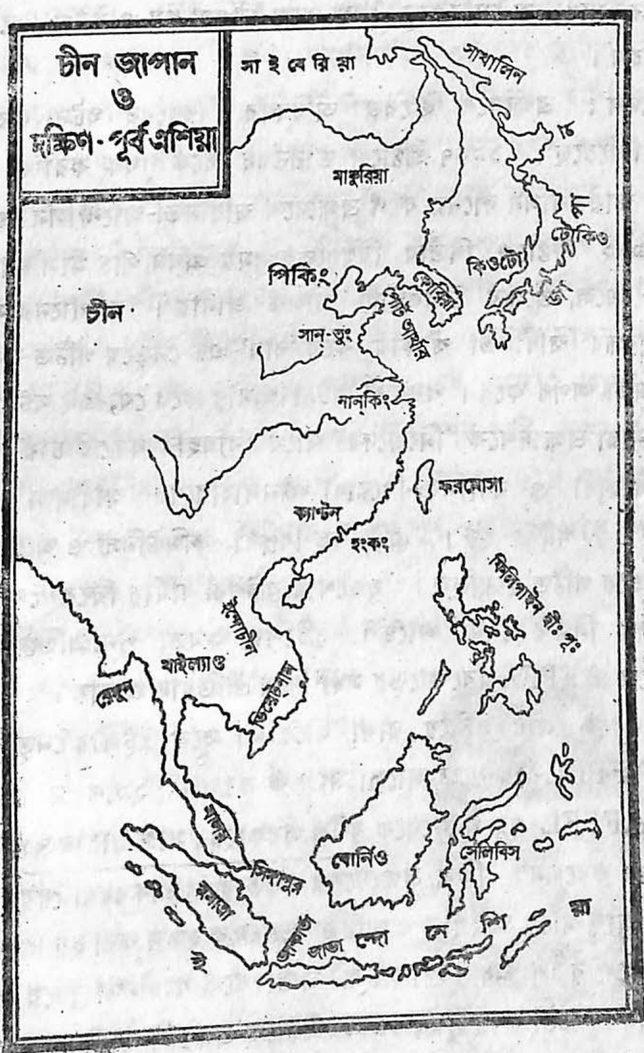
(খ) ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোচীন : বর্তমানের লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনাম নিয়ে ছিল ইন্দোচীন রাজ্য। ইন্দোচীন ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স জার্মানির কাছে আত্মসমর্পণ করলে জাপান ইন্দোচীনের অনেক অংশ দখল করে নেয়। ফ্রান্সের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অনেকদিন থেকেই ইন্দোচীনে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ভিয়েতনামের বড় নেতা ছিলেন হো-চি-মিন্। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তিনি কমিউনিস্ট ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করেন। হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের মানুষ ভিয়েতমিন নামে সৈন্যদল গঠন করে জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সময়ে ভিয়েতনামের বেশির ভাগ অঞ্চল ভিয়েতমিনের নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় ও হো-চি-মিন্ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। জাপানী আত্মসমর্পণের নামে ভিয়েতনামে ইংরেজ ও চীনা সৈন্য উপস্থিত হয়। ফরাসী সৈন্যবাহিনীও এসে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বাও দাই-এর নেতৃত্বে 'পুতুল-সরকার' গঠন করে। ভিয়েতমিনের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দিয়েন্ বিয়েন্ ফু-তে ফরাসীরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। জনসাধারণের সৈন্যের কাছে শক্তিশালী ফরাসী সৈন্যের



হো-চি মিন্

পরাজয় এক ইতিহাস সৃষ্টি করে। এই পরাজয়ে ফরাসীরা গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভাতে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা হয়। স্থির হয়, ভিয়েতনামকে আপাতত উত্তর ও দক্ষিণ—এই দু-ভাগে ভাগ করে রাখা



হবে। দু'বছর পরে দুটি ভাগের নির্বাচন করে সারা দেশে একটি সরকার স্থাপন করা হবে। কম্বোডিয়া ও লাওস্‌কে স্বাধীন বলে ঘোষণা করা হল। এরপর শুরু হয় আসল স্বাধীনতা-সংগ্রাম। দক্ষিণ ভাগের সরকার

আমেরিকার সমর্থনে নির্বাচন এড়িয়ে চলতে লাগল। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা ভিয়েতনামে হস্তক্ষেপ করে। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ আমেরিকার বিপক্ষে যায়। উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ মুক্তি-সংগ্রামীরা আমেরিকান সৈন্যদের ধ্বংস করে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল-এর মধ্যে আমেরিকান সৈন্য তুলে নেওয়া হয় ও সমগ্র ভিয়েতনাম একত্রিত হয়।

ব্রহ্মদেশ: ব্রহ্মদেশে ইংরেজ অধিকার বিস্তারের ঘটনা এর আগে বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করা ও সামান্য পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন দানের ফলে ব্রহ্মদেশে স্বাধীনতা-আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রথম পাঁচ মাস জাপানীরা ব্রহ্মদেশে এলে ব্রহ্মের উগ্রপন্থীরা স্বাগত জানায়। জাপানের সামরিক শাসন ব্রহ্মের স্বাধীনতা স্বীকার করে 'বাম'-এর নেতৃত্বে গঠিত সরকারের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করে যে, এই ঘটনা মিথ্যা ও জাপানীরা ব্রহ্মদেশকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। শীঘ্রই জাপান বিরোধী ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনসাধারণের স্বাধীনতা "লীগ" (AFPFL) গঠিত হয়। এটি বহু-বিপ্লবী কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সংস্থা একত্রিত হয়ে গঠিত হয়েছিল। যুদ্ধশেষে বৃটিশরা বার্মায় ফিরে দেখল যে, বিরোধীদের নিজস্ব সেনা আছে। বৃটিশের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জানা গেলে AFPFL বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদ জানায়।

ব্রহ্মদেশকে আর দমিয়ে রাখা যাবে না বুঝে এট্‌লীর নেতৃত্বে বৃটিশ সরকার AFPFL-এর সঙ্গে আলোচনা শুরু করল। ২৯শে মে জেনারেল আংসান AFPFL-এর পক্ষ থেকে বৃটিশ সরকারের সঙ্গে স্বাধীন ব্রহ্ম সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশের ভেতরে বিরোধ দেখা দেয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে আংসান ও আরও অন্যান্যকে হত্যা করা হয়। অক্টোবর, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লী ব্রহ্মদেশকে স্বাধীনতা দিয়ে চুক্তিতে সই করলেন। ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হল।

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া বৃটিশ অধিকারে ছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র মালয় দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে আসে। বৃটিশরা আসায় মালয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি হয় ও আধুনিক যুগের শুরু হয়।

মালয়ে বিভিন্ন জাতির বাস ছিল—(১) চীনারা মালয়কে তাদের স্থায়ী বাসস্থান বলে মনে করত না ; (২) ভারতীয়রা সংখ্যায় অল্প ছিল ; (৩) স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে মালয়ীরাই সংখ্যায় অধিক ছিল ; (৪) কিছু ইউরোপীয় বসবাসকারী ছিল। এই জাতিসমূহের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্য ছিল। বৃটিশ সরকার ভেদ-নীতি (Divide and rule) শুরু করে। বৃটিশরা ধর্মীয় ও জাতিগত পার্থক্য সমর্থন করে নিজেদের সুবিধার জন্য। খলিফার পতনের পর ইসলাম আন্দোলন কমে গিয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ আন্দোলন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান মালয় দখল করলে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জাপান মালয়ীদের সমর্থন করে জাতিগত বিরোধ তীব্র করে তোলে। বিশ্বযুদ্ধের পর বৃটিশরা ফিরে এসে মালয় ইউনিয়ন তৈরি ক'রে মালয়ী, চীনা ও ভারতীয়দের সমান নাগরিক অধিকার দেয়। এই প্রস্তাবে মালয়ে তীব্র বিরোধিতা সৃষ্টি করল। সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংস্থা ও PUTERA এর প্রতিবাদ করল। এই প্রস্তাব ত্যাগ করে বৃটিশ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে মালয় ফেডারেশন সৃষ্টি করল। এই ফেডারেশনকে কমিউনিস্টরা গ্রহণ করল না। ফলে, তীব্র কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হল। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মালয় পুর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল। মালয়ের নতুন নাম হল 'মালয়েশিয়া'।

ইন্দোনেশিয়া ঃ ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ মালয় থেকে মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত দেশ। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ডাচ্‌রা এই দেশ সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেয়। প্রথম জাতীয়তাবাদী সংস্থা "বুডি" উতামো" ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনা ব্যবসায়ীদের "সারেকত ইসলাম" নামে সংস্থা আন্দোলন শুরু করে স্বাধীনতা দাবী করে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে "পারটাই কমিউনিস্ ইণ্ডি" নামে এক কমিউনিস্ট দল তৈরি হয়। সারেকত ইসলামের সঙ্গে নেতৃত্ব নিয়ে বিরোধ বাধে। ডাচ্-বিরোধী আন্দোলনে "পারটাই ন্যাশনাল ইন্দোনেশিয়া' বিশেষ ভূমিকা নেয়। এই দলের নেতা ছিলেন



সুকর্ণ

সুকর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাপানীরা ইন্দোনেশিয়া দখল করে। তারা ইন্দোনেশিয়াকে প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে ইচ্ছুক ছিল না। আত্মসমর্পণের আগে জাপানীরা ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দেয় ও নতুন সরকারের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করে। যুদ্ধশেষে ইংরেজ সৈন্য এলে তারা ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রকে বেসরকারী ভাবে মেনে নেয়। কিন্তু ডাচ্ সৈন্যরা ফিরে এসে ক্ষমতা পুনরায় দখল করলে ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ শুরু হয়। সম্মিলিত-জাতিপুঞ্জ হস্তক্ষেপ করে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর আহ্বানে ইন্দোনেশিয়া-সমস্যা আলোচনার জন্য দিল্লীতে এশিয়া-সম্মেলন বসল। জনমতের চাপে ডাচ্ সরকার গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজী হয়। হেগে, ২রা নভেম্বর, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আলোচনা শুরু হল। ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নেদারল্যাণ্ড সংযুক্ত ইন্দোনেশিয়া রাষ্ট্রের কাছে ক্ষমতা অর্পণ করলে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়।

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও অসন্তোষের প্রসার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট অতলান্তিক মহাসাগরে একটি বৃটিশ রণতরীতে বসে "অতলান্তিক চার্টার" নামে একটি সনদ রচনা করেন। ঐ সনদে মিত্রপক্ষের যুদ্ধের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। তাতে বলা হয় অত্যাচারী নাৎসী শক্তির ধ্বংসের পর পৃথিবীতে সব জাতি নির্ভয়ে, নিরাপদে নিজ নিজ দেশে বাস করতে পারবে। এই ঘোষণার ভিত্তিতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ২৬টি দেশে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা প্রচারিত হয়। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও চীন—এই চার শক্তি মস্কো-ঘোষণার ভিত্তিতে এক নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা স্পষ্টভাবে প্রচার করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির চূড়ান্ত পরাজয়ের পর মিত্রশক্তি ও নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রতিনিধিরা আমেরিকার সান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ ও গঠন-পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হয় বিশ্বশান্তি রক্ষা, মানুষের অধিকার ও ছোট-বড় সব রাষ্ট্রেরই সমান অধিকার

প্রতিষ্ঠা করা ; এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আইন-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করা ও মানুষের জীবনযাত্রার সামাজিকতা ও ন্যায়-নীতিবোধের উন্নয়ণ করা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ছ'টি অঙ্গ ছিল—(১) সাধারণ পরিষদ, (২) নিরাপত্তা পরিষদ, (৩) অর্থনৈতিক ও সমাজ সম্পর্কিত সংস্থা, (৪) অছি পরিষদ, (৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও (৬) প্রধান কর্মসচিবের দপ্তর।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ান সেনারা ইউরোপের বহুদেশ জার্মানদের হাত থেকে মুক্ত করে। এই দেশগুলি হল পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া। এইসব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ও অন্যান্য ফ্যাসিবিরোধী পার্টিগুলি জার্মান-আক্রমণ প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা নেয়। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষে এই দেশগুলির সরকারে কমিউনিস্ট পার্টিরা আধিপত্য বিস্তার করে। আলবেনিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াতেও কমিউনিস্ট পার্টি জার্মান-দখলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। এইসব দেশেও কমিউনিস্ট পার্টি সরকার গঠন করে। এইসব দেশে কমিউনিস্ট সরকার গঠন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগে রাশিয়া কমিউনিস্ট-শাসিত ছিল। যুদ্ধের পর বিপুলসংখ্যক ইউরোপীয় দেশে কমিউনিস্ট-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানি দুই ভাগে বিভক্ত হলে পূর্ব-জার্মানিতেও কমিউনিস্ট-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট দল ক্ষমতায় আসে। ইউরোপের অন্যান্য অংশেও রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়। ফ্রান্স ও ইটালীর কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধের সময় জার্মান-প্রতিরোধে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল। যুদ্ধের পর এই পার্টি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যুদ্ধের পর ফ্রান্সের প্রথম সরকারে কমিউনিস্ট প্রতিনিধি ছিল। তারা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে বিরোধে পরিত্যাগ করে। ইটালীর সরকারে কমিউনিস্ট ও সোস্যালিস্ট বিশেষ শক্তিশালী ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কমিউনিস্টরা সরকার ত্যাগ করে। সরকার থেকে পদত্যাগ করলেও যুদ্ধের পর কমিউনিস্ট পার্টি এই দুই দেশে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ইংলণ্ডে নির্বাচনে রক্ষণশীল দলের পরাজয় হয় ও শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসে। শ্রমিকদলের শাসনে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবর্তন হয়। বড় বড় শিল্প জাতীয়করণ করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় বেশির ভাগ দেশ স্বাধীন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দুই মহাদেশের একের পর এক দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। এই দেশগুলি দীর্ঘকাল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও ঔপনিবেশিক দেশগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা আদায় করে। কোনও কোনও দেশে রক্তপাত না ঘটিয়েও দীর্ঘ-সংগ্রামের পর স্বাধীনতা আসে। সংগ্রাম ও আন্দোলন মূলত চলে ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অনেক দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয়। কিন্তু যুদ্ধের পর সেইসব শক্তি পুনরায় ফিরতে চেষ্টা করলে দীর্ঘ-সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে তা' উপনিবেশগুলির স্বাধীনতালাভে সহায়ক হয়। যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ছিল মূল উদ্দেশ্য। যুদ্ধের পর উপনিবেশগুলি এই দুই নীতির ওপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা দাবি করল। যুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি শক্তিশালী হওয়ায় সাম্রাজ্যবাদের অবসান ত্বরান্বিত হয়। এইসব দেশ উপনিবেশগুলির সংগ্রামে সমর্থন জানায় ও সাহায্য করে। এইভাবে ভারত, মালয়, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া ও সিংহল স্বাধীনতা পায়।

প্রশ্নাবলী

১। চীনে সাধারণতন্ত্র কত খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? রাষ্ট্রপতি ইউ-য়ান্-সিকাই চীনে গণতন্ত্রের পরিবর্তে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন? তাঁর মৃত্যুর পর সমরনায়করা কি করেন?

২। চীনে ৪ঠা মে-র আন্দোলন শুরু হয় কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কেন?

৩। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুয়োমিন্-তাঙ্ ও কমিউনিস্ট দলের সম্পর্ক বর্ণনা কর।

৪। ডাঃ সানের মৃত্যুর পর কুয়োমিন্ তাঙ্ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয় কেন?

৫। মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে কিভাবে চীনে গণ-প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়?

৬। ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৮। মালয়েশিয়ায় কমিউনিস্ট আন্দোলন শুরু হয় কেন? কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কিভাবে মালয়েশিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে?

৯। ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ মালয় থেকে কতদূর বিস্তৃত? ইন্দোনেশিয়ার প্রথম জাতীয়তাবাদী সংস্থা কি ও কত খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? ইন্দোনেশিয়া কিভাবে স্বাধীনতা লাভ করে?

১০। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতীয়তাবাদের প্রসার ও অধীনস্থ রাজ্যগুলির অস্থিরতা সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কিভাবে গঠিত হয়? এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ সংস্থাগুলি সম্বন্ধে যা জান লেখ।

[পরিশিষ্ট]

কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার সন-তারিখ

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৪৫৩ খ্রীঃ —তুর্কী আক্রমণে কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতন।
১৪৮২ „ —জার্মান পণ্ডিত রেউচলিনের ইটালী আগমন।
১৩০৪-১৩৭৪ খ্রীঃ—ইটালীতে পেত্রার্কের কাল।
১৩১৩-১৩৭৫ „ —ইটালীতে বোকাচ্চিওর কাল।
১৪৬৯-১৫২৭ „ —ইটালীতে মেকিয়াভেলির কাল।
১৩৪০-১৪০০ „ —ইটালীতে জিওফ্রে চসারের কাল।
১৫৫২-১৫৯৯ „ —ইংলণ্ডে এডমণ্ড স্পেন্সারের কাল।
১৫৬৪-১৬১৬ „ —ইংলণ্ডে উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়ারের কাল।
১৪৬৬-১৫৩৬ „ —নেদারল্যাণ্ডে ডেসিডেরিয়াস্ ইরাস্‌মাসের কাল।
১৫৪২-১৫৮০ „ —পর্তুগালের ক্যাওমেন্‌সের কাল।
১৫৪৭-১৬১৬ „ —স্পেনের সারভান্তিসের কাল।
১৪৯৫-১৫৫৩ „ —ফ্রান্সের ফ্রাঁসোয়া রাবেলের কাল।
১৫০৩ খ্রীঃ—রাফায়েল সেণ্ট ফ্রান্সিস্ চার্চের জন্য 'করোনেশন অব্ দি ভার্জিন' ছবি আঁকেন।
১৪৯৬ „ —মাইকেল এ্যাঞ্জেলো বোলানাতে যান।
১৫০১ „ —মাইকেল এ্যাঞ্জেলো ফ্লোরেন্সে ফিরে আসেন।
১৫০৮-১৫১১ খ্রীঃ—মাইকেল এ্যাঞ্জেলো সিস্‌টাইন গির্জার ছাদের দেওয়াল-চিত্র আঁকেন।
১৫০৮-১৫৪৫ „ — মাইকেল এ্যাঞ্জেলো মাঝে মাঝে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের কবরের কাজ করেন।
১৪৫৪ খ্রীঃ—যোহান গুটেন্‌বার্গ ছাপার যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

১৪৬০ খ্রীঃ— যুবরাজ হেনরীর মৃত্যু।
১৪৮৭ „ —বারথেলোমিউ ডিয়াজের আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে যাত্রা।
১৪৯৮ „ —ভাস্কো দা-গামা কালিকট বন্দরে পৌছান।
১৫০০ খ্রীঃ, ২২শে এপ্রিল—কেব্রাল ব্রেজিলে পৌছান।
১৫০১ „ —কেব্রাল কোচিন ও ক্যাননোর হয়ে লিস্‌বনে পৌছান।
১৫০৯ „ —আল্‌ফান্‌সো আল্‌বুকার্ক ভারতে পর্তুগালের গভর্নর হয়ে আসেন।
১৪৯২ „ —কলম্বাস বাহামা দ্বীপপুঞ্জে পৌছান।

১৫১৩ খ্রীঃ—বালবোয়া ডারিয়েন যোজক আবিষ্কার করেন।
১৪৯২-১৫৩৪ খ্রীঃ—স্পেনীন হিস্‌পানিওয়ালাতে স্থানীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৫০০০ থেকে কমে ২৫০ জন হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

১৫০৮ খ্রীঃ—মার্টিন লুথার উইটেন্‌বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।
১৫১০ ,, —মার্টিন লুথার রোম পরিভ্রমণে যান।
১৫২১ ,, —ওর্মসের আলোচনা-সভা বসে।
১৫১৮-১৫২৫ খ্রীঃ—জার্মানীতে লুথারের সমর্থনে সাহিত্য রচনা।
১৫১৯ খ্রীঃ—জুইংলির মঠে যাজকবৃত্তি গ্রহণ।
১৫০৯ খ্রীঃ, ১০ই জুলাই—জন ক্যাল্‌ভিন ফ্রান্সের লোয়ন শহরে জন্মগ্রহণ করেন।
১৫৩৪ ,, —জন ক্যাল্‌ভিন ফ্রান্স ত্যাগ করে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ব্যাসেল শহরে যান।
১৫৩৬ ,, —ক্যাল্‌ভিন জেনেভা শহরে আসেন।
১৫৩৮-১৫৪১ খ্রীঃ—ক্যাল্‌ভিন জেনেভা থেকে নির্বাসিত হয়ে বাইরে থাকেন।
১৫৩৬ খ্রীঃ—ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট আইন করে মঠ তুলে দেয়।
১৪৮৩ ,, —স্পেনে প্রথম যাজকদের বিচার-সভার প্রতিষ্ঠা।
১৫৩৪ ,, —জেস্থইট সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।
১৫৪০ ,, —পোপ তৃতীয় পল কর্তৃক জেস্থইট সোসাইটি অনুমোদন।
১৫৪৫ ,, —ট্রেণ্টের কাউন্সিল আহ্বান।
১৫৬৩ ,, —এই সময় পর্যন্ত ট্রেণ্টের কাউন্সিলের কয়েকটি অধিবেশনে মিলিত হওয়া।
১৫৩০ ,, —পঞ্চম চার্লস কর্তৃক অগস্‌বার্গে সভা আহ্বান।
১৫৫৫ ,, —অগস্‌বার্গের সন্ধি।
১৫৭৯ ,, —উইলিয়াম অব্‌ অরেঞ্জের নেতৃত্বে "ইউনিয়ন অব্‌ ইউট্রেক্ট" গঠন।
১৫৮১ ,, —'ইউনিয়ন অব্‌ ইউট্রেক্ট' কর্তৃক স্পেনের থেকে মুক্তি-ঘোষণা।
১৫৮৪ ,, —উইলিয়াম অব্‌ অরেঞ্জের মৃত্যু।
১৬৪৮ ,, —ইউট্রেক্টের সন্ধিতে নেদারল্যাণ্ডের উত্তরাংশ হল্যাণ্ড ও দক্ষিণাংশ বেলজিয়াম নামে ছুটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি।

পঞ্চম অধ্যায়

১৬৪০ খ্রীঃ—দীর্ঘ পার্লামেণ্ট আহ্বান।
১৬৪২ ,, —গৃহযুদ্ধের সূচনা।
১৬৪৯ ,, —প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
১৬৫৩ ,, —অলিভার ক্রম্‌ওয়েলের 'লর্ড প্রটেক্টর' উপাধি নিয়ে শাসনক্ষমতা দখল।
১৬৬০ ,, —রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
১৬৮৭ ,, —দ্বিতীয় জেম্‌সের "ডিক্লারেশন অব্‌ ইন্‌ডাল্‌জেন্স" জারী।

১৬৮৮ খ্রীঃ—গৌরবময় বিপ্লব।
১৬৮৯ ,, —বিল অব্ রাইট্‌স পাস।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১৫২৬ খ্রীঃ—বাবর কর্তৃক ভারতের মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।
১৫০৪ ,, —বাবরের কাবুল দখল।
১৫২৪ ,, —দৌলত খানের আক্রমণে বাবরের পাঞ্জাবে আগমন।
১৫২৫ ,, —বাবরের পুনরায় পাঞ্জাবে আগমণ ও পাঞ্জাব দখল।
১৫২৬ ,, —পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়।
১৫২৭ ,, —খানুয়ার যুদ্ধে সংগ্রামসিংহের পরাজয়।
১৫২৯ ,, —গোগরার যুদ্ধে আফগান দলপতিদের পরাজয়।
১৫৩০ ,, —বাবরের মৃত্যু।
১৫৩০-৪০ ; ১৫৫৫-৫৬ খ্রীঃ—হুমায়ুনের রাজত্বকাল।
১৫৩২ খ্রীঃ—দেওরিয়ার যুদ্ধে মামুদ লোদীর পরাজয়।
১৫৩৭ ,, —শের খানের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের যুদ্ধযাত্রা।
১৫৩৯ ,, —চৌসার যুদ্ধে শের খানের কাছে হুমায়ুনের পরাজয়।
১৫৪০ ,, —বিল্লগ্রামের যুদ্ধে শের শাহের কাছে হুমায়ুনের পরাজয়।
১৫৫৫ ,, —সর্‌হিন্দের যুদ্ধে সেকেন্দার শূরের পরাজয়।
১৫৫৬ ,, —হুমায়ুনের মৃত্যু।
১৫৪০-৪৫ খ্রীঃ—শের শাহের রাজত্বকাল।
১৫৪৫ খ্রীঃ—কালিঞ্জর দুর্গ অবরোধকালে শের শাহের মৃত্যু।
১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ—আকবরের রাজত্বকাল।
১৫৫৬ খ্রীঃ—পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুর পরাজয়।
১৫৬৪ ,, —আকবরের গণ্ডোয়ানা দখল।
১৫৬২ ,, —অম্বররাজ বিহারীমলের কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহ।
১৫৬৭ ,, —আকবরের মেবার আক্রমণ ও চিতোর দখল।
১৫৭২ ,, —রানা উদয় সিংহের মৃত্যু।
১৫৭৬ ,, —হলদিঘাটের যুদ্ধে রানা প্রতাপের পরাজয়।
১৫৭৩ ,, —আকবরের গুজরাট জয়।
১৫৭৫-৭৬ খ্রীঃ—আকবরের বাংলা জয়।
১৫৮৫ খ্রীঃ—আকবরের কাশ্মীর জয়।
১৫৯৫ ,, —আকবরের কান্দাহার দুর্গ দখল।
১৬০১ ,, —আকবরের আসীরগড় দুর্গ দখল।
১৬০৩ ,, —যুবরাজ সেলিমের বিদ্রোহ।
১৬০৫ ,, —আকবরের মৃত্যু।

১৬০৫-১৬২৭ খ্রীঃ—জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল।

১৬১১ খ্রীঃ—শের আফগানের বিধবা স্ত্রী মেহেরুন্নেসাকে বিবাহ।

১৬১৭ ,, —রাজপুত্র খুর্‌রম কর্তৃক মালিক অম্বর পরাজিত।

১৬২২ ,, —পারস্যসম্রাট কর্তৃক কান্দাহার দখল।

১৬২৭ ,, —জাহাঙ্গীরের মৃত্যু।

১৬২৮-১৬৫৮ খ্রীঃ—শাহজাহানের রাজত্বকাল।

১৬২৮ খ্রীঃ—শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ।

১৬৩৮ ,, —কান্দাহার পুনরুদ্ধার।

১৬৪৯ ,, —পারস্য কর্তৃক পুনরায় কান্দাহার দখল।

১৬৪৯, ১৬৫২, ১৬৫৩ খ্রীঃ—শাহজাহানের কান্দাহারের পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা।

১৬৫২ খ্রীঃ—ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের শাসক নিযুক্ত।

১৬৫৭ ,, —শাহজাহানের অসুস্থতা ও রাজপুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ।

১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ—ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল।

১৬৮১ খ্রীঃ—মেবারের সঙ্গে সন্ধি।

১৬৬৫ ,, —শিবাজীর সঙ্গে পুরন্দরের সন্ধি।

১৬৮০ ,, —শিবাজীর মৃত্যু ও শম্ভুজীর মারাঠাদের নেতৃত্ব গ্রহণ।

১৬৮২ ,, ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য গমন।

১৬৮৬ ,, —ঔরঙ্গজেবের বিজাপুর দখল।

১৬৮৭ ,, —ঔরঙ্গজেবের গোলকুণ্ডা জয়।

১৬৮৯ ,, ঔরঙ্গজেব কর্তৃক শম্ভুজীকে বন্দী ও হত্যা।

১৭০৭ ,, —ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু।

১৭০৭ ,, —ঔরঙ্গজেবের পুত্রদের সিংহাসন নিয়ে লড়াই।

১৭৩৯ ,, —নাদির শাহের ভারত আক্রমণ।

১৪৯৮ ,, —ভাস্কো-দা-গামার কালিকটে আগমন।

১৫০০ ,, কেরালের কোচিনের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব।

১৫০৯ ,, —আলবুকার্ক ভারতে পর্তুগীজ গভর্নর নিয়োগ।

১৫১০ ,, —পর্তুগীজদের গোয়া দখল।

১৬০০ ,, —রানী এলিজাবেথের সনদে ইংলণ্ডে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন।

১৬০১ ,, —সুরাটে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপন।

১৬৪৬-১৬৬৭ খ্রীঃ—ওলন্দাজ কোম্পানীর সঙ্গে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ।

১৬৩৯ খ্রীঃ—ইংরেজদের মাদ্রাজ জয়।

১৬৬৮ ,, —রাজা দ্বিতীয় চার্লসের কাছ থেকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোম্বাই লাভ।

১৬৮৬ ,, মুঘলদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ।

১৬৯০ ,, —জব চার্নক কর্তৃক কলকাতা শহরের পত্তন।

১৭১৪ খ্রীঃ—সম্রাট ফারুখ্‌শিয়ারের কাছ থেকে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনাশুল্কে ব্যবসার ফরমান লাভ।

১৬৬৪ খ্রীঃ—ফরাসী ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গঠন।

১৭৪০-১৭৬৩ খ্রীঃ—দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

১৭৬৩ খ্রীঃ—ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধিতে ফরাসীদের কেবলমাত্র পণ্ডিচেরী, মাহে, কারিকল, ইয়ানান ও চন্দননগর-এ ব্যবসার অধিকার লাভ।

১৬২৭ অথবা ১৬৩০ খ্রীঃ—শিবাজীর জন্ম।

১৬৪৬ খ্রীঃ—শিবাজীর তোরণা দুর্গ দখল।

১৬৬৩ ,, —শিবাজীর কাছে শায়েস্তা খাঁর পরাজয়।

১৬৬৪ ,, —শিবাজীর সুরাট লুণ্ঠন।

১৬৬৫ ,, —শিবাজীর সঙ্গে মুঘলদের পুরন্দরের সন্ধি।

১৬৭৪ ,, —রায়গড়ে শিবাজীর অভিষেক।

১৬৮০ ,, —শিবাজীর মৃত্যু।

১৬৮৯ ,, —সংগ্রামেশ্বরে শম্ভূজী ঔরঙ্গজেবের কাছে বন্দী ও নিহত।

১৭০০ ,, —রাজারামের মৃত্যু।

১৭০৭ ,, —শাহুর মুক্তিলাভ।

১৭১৩ ,, —শাহু ও দ্বিতীয় শিবাজীর মধ্যে বার্নারের সন্ধি।

১৭১৯ ,, —পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথের হুসেন আলীর সঙ্গে দিল্লী গমন।

১৭২০ ,, —বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু।

১৭৩৭ ,, —পেশোয়া বাজীরাও-এর দিল্লীর সন্নিকটে উপস্থিতি।

১৭৩৮ ,, —বাজীরাও-এর কাছে নিজামের পরাজয়।

১৭৪৯ ,, —শাহুর মৃত্যু ও পেশোয়াকে সব অধিকার দান।

১৭৬১ ,, —পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ও আহম্মদ শাহ আবদালীর কাছে মারাঠাদের পরাজয়।

১৬২৮ ,, —শিখগুরু হরগোবিন্দের কিরাতপুরে আশ্রয়গ্রহণ।

সপ্তম অধ্যায়

১৭৫৬ খ্রীঃ—সিরাজদ্দৌলা বাংলার নবাব হন।

১৭৫৬ খ্রীঃ, ২০শে জুন—সিরাজের কলকাতা দখল।

১৭৫৭ খ্রীঃ, ২৩শে জুন—পলাশীর যুদ্ধ।

১৭৬০ খ্রীঃ—মীরজাফরের পদচ্যুতি ও মীরকাশিম নবাব হন।

১৭৬৪ ,, —বক্সারের যুদ্ধ ও মীরকাশিম পরাজিত।

১৭৬৫ ,, —ক্লাইভের সঙ্গে অযোধ্যার নবাবের এলাহাবাদের সন্ধি ও ইংরেজদের দেওয়ানি লাভ।

১৭৭২ ,, —ওয়ারেন হেস্টিংসের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসা। পেশোয়া মাধব রাও-এর মৃত্যু।

১৭৮২ খ্রীঃ—পেশোয়ার সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি ও প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান।
১৭৬৯ ,, —হায়দর আলির সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি ও প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান।
১৭৭১ ,, —মারাঠারা হায়দার আলিকে আক্রমণ করে।
১৭৮০ ,, —দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূত্রপাত।
১৭৮২ ,, —হায়দার আলির মৃত্যু।
১৭৮৪ ,, —ম্যাঙ্গালোরের সন্ধিতে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান।
১৭৮৬ ,, —লর্ড কর্নওয়ালিশ ভারতে গভর্নর জেনারেল ও সেনাপতি হয়ে আসেন।
১৭৯৮ ,, —লর্ড ওয়েলেস্‌লী ভারতে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন।
১৮০০ ,, —নানা ফড়নবীশের মৃত্যু।
১৮১৩ ,, —আর্ল অব্ হেস্টিংসের গভর্নর জেনারেল হয়ে আগমন।
১৮১৮ ,, —তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় ও পেশোয়া পদের অবলুপ্তি।
১৮২৬ ,, —ইয়ান্দাবুর সন্ধিতে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান।
১৮০৯ ,, —রঞ্জিত সিংয়ের সঙ্গে ইংরেজদের অমৃতসরের সন্ধি।
১৮৪২ ,, —প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয়।
১৮৪৫ ,, —প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ।
১৮৪৬ ,, —লাহোরের সন্ধি ও প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের অবসান।
১৮৪৬-৫৬ খ্রীঃ—লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল।
১৮৫৭ খ্রীঃ, ২৯শে মার্চ—ব্যারাকপুরে সিপাহী-বিদ্রোহের সূত্রপাত।

অষ্টম অধ্যায়

১৭৬৩ খ্রীঃ—সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়।
১৭৬৫ ,, —লর্ড গ্রেন্‌ভিলের স্ট্যাম্প আইন।
১৭৭০ ,, —লর্ড নর্থ কর্তৃক চায়ের ওপর তিন পেনি কর বসানো।
১৭৭৪ ,, —প্রথম ফিলাডেল্‌ফিয়া কংগ্রেস।
১৭৭৫ ,, লেক্সিংটনে ছোটখাট সংঘর্ষ।
১৭৭৬ খ্রীঃ, ৪ঠা জুলাই—আমেরিকার স্বাধীনতা-ঘোষণা।
১৭৮৩ খ্রীঃ—ভার্সাই-সন্ধিতে আমেরিকার স্বাধীনতা-লাভ।
১৭৩৩ ,, —জন কে উড়ন্ত মাকু আবিষ্কার করেন।
১৭৬৯ ,, —রিচার্ড আর্করাইট ওয়াটার ফ্রেম আবিষ্কার করেন।
১৭৬৯ ,, —জেম্‌স্ ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন।
১৭৮৫ ,, —বাষ্পের সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালানো শুরু হয়।
১৮০৭ ,, —ফাল্‌টন প্রথম বাষ্পীয় পোত আবিষ্কার করেন।
১৮১২ ,, —ইংলণ্ডে নিয়মিত স্টিমার চলতে শুরু করে।
১৮১৪ ,, —জর্জ স্টিফেন্‌সন্ খনি থেকে তোলার জন্য বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরী করেন।

১৮৩০ খ্রীঃ—ভোটাধিকারের জন্য ইংলণ্ডে আন্দোলন।

১৮৩২ ,, — ইংলণ্ডে সংস্কার প্রবর্তন।

১৬৮৯-১৭৫৫ খ্রীঃ—মণ্টেস্কুর কাল।

১৭১২-১৭৭৮ ,, — জাঁ জেকুইস্ রুশোর কাল।

১৭৮৯ খ্রীঃ—ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়।

১৭৮৯ খ্রীঃ, ১৭ই জুন—তৃতীয় শ্রেণীর একত্রে অধিবেশন ও মাথাপিছু ভোটের দাবি।

১৭৮৯ ,, ২৭শে জুন—রাজা ও তৃতীয় শ্রেণীর একত্রে অধিবেশন ও মাথাপিছু ভোটের দাবি মেনে নেন।

১৭৮৯ ,, ১৪ই জুলাই—বাস্তিলের পতন।

১৭৯৩ ,, ২১শে জানুয়ারি—রাজা ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড।

১৭৬৯ ,, — নেপোলিয়নের জন্ম।

১৭৯৫ ,, —নেপোলিয়ন প্রতিনিধি-সভাকে রক্ষা করেন।

১৮০২ ,, —ইংলণ্ডের সঙ্গে নেপোলিয়নের এ্যামিয়েন্সের সন্ধি।

১৮০৪ ,, নেপোলিয়নের সম্রাট উপাধি গ্রহণ।

১৮০৫ ,, —ট্রাফাল্‌গারের নৌ-যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়।

১৮০৭ ,, —রাশিয়ার সঙ্গে নেপোলিয়নের টিল্‌জিটের সন্ধি।

১৮১২ ,, —নেপোলিয়নের মস্কো অভিযান ও পরাজয়।

১৮১৩ ,, —লাইপ্‌জিগের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয়।

১৮১৪ ,, —প্যারিসের পতন।

নবম অধ্যায়

১৮৩০ খ্রীঃ—ফ্রান্সে ও ইউরোপে বিপ্লব।

১৮৪৮ ,, —ফ্রান্সে ও ইউরোপে বিপ্লব।

১৮১৫-১৮৫০ খ্রীঃ—সাফল্য থেকে আকাঙ্ক্ষার যুগ।

১৮১৮ খ্রীঃ—চতুঃশক্তির চুক্তি।

১৮২০ ,, —ট্রপ্পোর সিদ্ধান্ত।

১৮১৫-১৮৪৮ খ্রীঃ মেটারনিকের যুগ।

১৮১৫ খ্রীঃ—ভিয়েনা-সম্মেলন।

ইটালী

১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীঃ—ইটালীতে কার্বোনারীর চেষ্টায় বিদ্রোহ।

১৮০৫ খ্রীঃ—ম্যাৎসিনির জেনোয়াতে জন্মগ্রহণ।

১৮৩০ ,, —ম্যাৎসিনির কারাবরণ।

১৮৩১ ,, —ম্যাৎসিনি কর্তৃক "নব্য ইটালী" দল গঠন।

১৮৪৮ ,, —ইটালীতে বিদ্রোহ ও ব্যর্থতা।

১৮১০ খ্রীঃ—কাভুরের জন্মগ্রহণ।
১৮৫০ ,, —কাভুর পিড্‌মণ্ট সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত।
১৮৬১ ,, —রাজা ইম্যানুয়েলকে গ্যারিবল্ডী কর্তৃক নেপল্‌সে "ইটালীর রাজা" বলে বরণ করা।
১৮৬৬ ,, —ইটালীর অস্ট্রো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে যোগদান।
১৮৭০ ,, —ফ্রান্স কর্তৃক রোম থেকে সৈন্য অপসারণ ও ইটালীর রোম দখল।
১৮৭১ ,, —ইটালীর ঐক্য সম্পন্ন।

জার্মানি

১৮১৮ খ্রীঃ—প্রাশিয়ার নেতৃত্বে "জোল্‌ভারেন" নামে শুল্ক-সংঘ স্থাপন।
১৮৪৮ ,, —জার্মানিতে বিপ্লব। ফ্রাঙ্কফুর্ট পার্লামেণ্ট আহ্বান।
১৮৬১ ,, —প্রথম উইলিয়ামের প্রাশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ।
১৮৬২ ,, —অটোভন্ বিস্মার্ক প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত।
১৮১৫ ,, ব্রাডেন্‌বার্গের অভিজাত পরিবারে বিস্মার্কের জন্ম।
১৮৬৪ ,, —ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।
১৮৬৬ ,, —অস্ট্রিয়ার সঙ্গে স্যাডোয়ার যুদ্ধ।
১৮৭১ ,, ১৮ই জানুয়ারি—ভার্সাই রাজপ্রাসাদে রাজা উইলিয়াম সমগ্র জার্মানির সম্রাট বলে ঘোষিত।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ

১৮৩২ খ্রীঃ—শুল্কের প্রশ্নে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পৃথক রাজ্য গঠনের চেষ্টা ও ব্যর্থতা।
১৮৬১ ,, —আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচন।
১৮৬৩ ,, ১লা জানুয়ারি—লিঙ্কন দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে ক্রীতদাস-প্রথা বিলোপ করে ঘোষণা জারী করেন।
১৮৬৫ ,, —দক্ষিণের রাজ্যগুলির পরাজয় ও গৃহযুদ্ধের অবসান।

ইউরোপের শিল্পায়ন

১৭৮১ খ্রীঃ—লিয়ঁ শহরে বৃটিশ শিল্পপতির ধাতু গলাবার কারখানা স্থাপন।
১৮৩৪ ,, —সমগ্র বেলজিয়ামে রেলপথ নির্মিত হল।
১৮৬১ ,, —রাশিরাতে সার্ফ-প্রথার উচ্ছেদ ও শ্রমিকের অভাব দূর।
১৮০২ ,, —ফ্যাক্টরী আইন পাস ও শিশুদের ১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করার বিধি।
১৮১৯ ,, —৯ বছরের নীচে শিশুদের কাজে নেওয়া নিষিদ্ধকরণ।
১৮২৪ ,, —শ্রমিক-সংঘ গঠনের বিরুদ্ধে আইন বাতিল।
১৮৪৮ ,, —"কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো" প্রকাশ।

দশম অধ্যায়

(ক) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ

১৮৩৯ খ্রী:—লীনের বেআইনী ব্যবসা দমনের ভার গ্রহণ।

১৮৩৯-৪২ খ্রী:—অহিফেন-যুদ্ধ।

১৮৫৮ খ্রী:—টিয়েনসিনের সন্ধি।

১৮৫৩ ,, —রাশিয়া কর্তৃক চীনের আমুর নদী পর্যন্ত দখল।

১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ—চীন-জাপান যুদ্ধ।

১৮৯৭ খ্রীঃ—জার্মানি কর্তৃক কিয়াওচাউ দখল।

১৮৯৮ ,, —রাশিয়া কর্তৃক পোর্ট আর্থার ২৫ বছরের জন্য দখল।

১৮৯৯ ,, —আমেরিকার পররাষ্ট্র-সচিব হের "উন্মুক্ত দ্বার" নীতি ঘোষণা।

১৮৫০ ,, —চীনে তাইপিং বিদ্রোহ।

১৮৯৮ ,, —চীনে শতদিনের সংস্কার।

১৮৯৯ ,, —বক্সার বিদ্রোহ।

১৮৯৮ ,, —হো-চুয়ান্ বা মুষ্টিযোদ্ধারের গুপ্তসমিতি গঠন।

১৯০২-১৯০৮ খ্রীঃ—চীনে সংস্কার।

১৯০১খ্রীঃ—সৈন্যবাহিনীর সংস্কার।

১৯০৩ ,, —শিক্ষা-মন্ত্রক প্রতিষ্ঠা।

১৯০৮ ,, —সামরিক সংবিধান গ্রহণ ও সম্রাজ্ঞী জুসি ও সম্রাট কোয়াংসুর মৃত্যু।

১৯১১ ,, —উচ্চাং-এ সেনাদলের বিদ্রোহ।

(খ) জাপান

১৮৫৩ খ্রী:—কমোডর পেরীর মার্কিন নৌবহর নিয়ে উপস্থিতি।

১৮৫৪ ,, —জাপানের দুটি বন্দর উন্মুক্ত।

১৮৬৭ ,, —মেইজি ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

১৮৭১ ,, —সামন্ত-প্রথার অবসান।

১৮৮৯ ,, —নতুন সংবিধান গ্রহণ।

১৮৭৫ ,, —কিউরাইল দ্বীপ দখল।

১৮৭৬ ,, —জাপান ও কোরিয়ার মধ্যে বাণিজ্য-চুক্তি।

১৮৯৫ ,, —সিমোনসেকির সন্ধি।

১৯০২ ,, —জাপান ও ইংলণ্ডের মধ্যে চুক্তি।

১৯০৪ ,, —রুশ-জাপান যুদ্ধ।

১৯০৫ ,, —পোর্টস্‌মাউথের সন্ধি।

১৯১০ ,, —জাপান কর্তৃক কোরিয়া দখল।

১৯১৫ ,, —চীনের উপর 'একুশ দফা' দাবি পেশ।

একাদশ অধ্যায়

নতুন শাসনব্যবস্থা

১৮৫৮ খ্রীঃ, ২রা আগস্ট—ভারত-শাসন আইন পাস।

ইংরেজ শক্তির সাম্রাজ্য-বিস্তার

১৮৬৩ খ্রীঃ—আফগান আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু।
১৮৭৬ „ —লর্ল লিটনের ভারতবর্ষে আগমন।
১৮৮৬ „ —ব্রহ্মদেশ বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।
১৮৯৯ „ —লর্ড কার্জন ভারতের ভাইস্‌রয় হয়ে আসেন।
১৯০৪ „ —তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজদের চুক্তি।

উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ-সংস্কার

১৮১৫ খ্রীঃ—রাজা রামমোহন কর্তৃক 'আত্মীয়-সভা' প্রতিষ্ঠা।
১৮২৮ „ —ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৬৭ „ —মহারাষ্ট্রে মহাদেব গোবিন্দ রানাডে কর্তৃক প্রার্থনা-সমাজ প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৩ „ —আমেরিকার শিকাগো শহরে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে যোগদান।
১৮৮২ „ —মাদ্রাজে থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৩ „ —এ্যানি বেসান্তের থিওসফিক্যাল সোসাইটির নেতৃত্ব গ্রহণ।

জাতীয়তাবাদী মনোভাবের প্রকাশ

১৮৩৭ খ্রীঃ—কলকাতায় ল্যাণ্ডহোলার্ড সোসাইটি প্রতিষ্ঠা।
১৮৪৩ „ —বেঙ্গল বৃটিশ সোসাইটির প্রতিষ্ঠা।
১৮৫১ „ —বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।
১৮৭৮ „ —দেশীয় সংবাদপত্র-আইন পাস।
১৮৭৯ „ —অস্ত্র-আইন পাস।
১৮৭৬ „ —সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক "ভারত-সভা" প্রতিষ্ঠা।
১৮৮৩ „ —সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক 'সর্বভারতীয় সম্মেলন' আহ্বান। হিউম্ কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের কাছে খোলাচিঠি প্রেরণ।
১৮৮৫ „ —বোম্বাই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা।
১৮৮৬ „ সুরেন্দ্রনাথ কর্তৃক জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান।
১৯০৫ „ —বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ঘোষণা।
১৯০৬ „ —কলকাতা কংগ্রেসে "বয়কট" ও "স্বদেশী"র প্রস্তাব গ্রহণ।
১৯০৭ „ —সুরাট কংগ্রেসে চরম ও নরম পন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ।
১৯০৮ „ —আলিপুর বোমার মামলা শুরু।
১৯১৪-১৯১৫ খ্রীঃ—পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সৈন্যদলের সঙ্গে যোগাযোগ ও সরকারী অর্থ লুট।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ

১৯০৮ খ্রী:—অস্ট্রিয়ার বসনিয়া ও হরাজিগভনিয়া দখল।
১৮৮২ „ —জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে ত্রিশক্তি-চুক্তি।
১৯১৪ „ ২৮শে জুন—বসনিয়ার রাজধানী সেরাজেভোতে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ-দম্পতি নিহত।
১৯১৪ „ ২৮শে জুলাই—অস্ট্রিয়ার সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব

১৯১৮ খ্রীঃ—গান্ধীজীর স্বায়ত্তশাসন দাবি।
১৯১৩ „ —আমেরিকায় 'গদর' পত্রিকা প্রকাশ।
১৯১৫ „ ২১শে ফেব্রুয়ারি—ভারতের বিপ্লবীদের ব্রিটেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নির্দিষ্ট তারিখ ছিল।
১৯১৬ „ —অ্যানি বেসান্ত কর্তৃক হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌ-চুক্তি।
১৯১৭ „ ২০শে আগস্ট—সেক্রেটারী অব্ স্টেট মণ্টেগু কর্তৃক সংস্কার-নীতি ঘোষণা।
১৯১৯ „ —মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড আইন পাস ও রাওলাট আইন পাস।
১৯১৯ „ ৬ই এপ্রিল—গান্ধীজীর হরতালের আহ্বান।
১৯১৯ „ ১৩ই এপ্রিল—জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১৯০৫ খ্রীঃ—রাশিয়াতে বিপ্লব।
১৮৮৩ „ —প্লেখানভের নেতৃত্বে "সমাজবাদী গণতান্ত্রিক দল তৈরি।
১৮৯৮ „ —"সমাজবাদী গণতান্ত্রিক শ্রমিক দল" প্রতিষ্ঠা।
১৯১৭ খ্রীঃ ১৫ই মার্চ—জার কর্তৃক সিংহাসন ত্যাগ (রাশিয়ান বর্ষপঞ্জী অনুসারে ২৭শে ফেব্রুয়ারি)।
১৯১৭ „ ৭ই নভেম্বর—(রাশিয়ান বর্ষপঞ্জী অনুসারে ২৫শে অক্টোবর)—বল্‌শেভিক দলের ক্ষমতা দখল।
১৯১৯ „ —তৃতীয় কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশানাল বা কমিণ্টার্ন প্রতিষ্ঠা।

চতুর্দশ অধ্যায়

প্যারিস শান্তি-সম্মেলন

১৯১৮ খ্রীঃ নভেম্বর—জার্মানি কর্তৃক যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা।
১৯১৯ „ —ভার্সাই-সন্ধি।

১৯১৮ খ্রীঃ ৮ই নভেম্বর—আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন কর্তৃক "চৌদ্দ দফা" প্রস্তাব উত্থাপন।

ফ্যাসিবাদের উদ্ভব

১৮৮৩ খ্রীঃ—বেনিত্তো মুসোলিনীর জন্ম।

১৯২২ ,, অক্টোবর—মুসোলিনীর রোম অভিযান ও ক্ষমতা দখল।

নাৎসীবাদের উদ্ভব

১৮৮৯ খ্রীঃ—এডল্‌ফ হিটলারের জন্ম।

১৯২৩ ,, —জেনারেল লুডেন্‌ডর্ফের সঙ্গে একত্রিত হয়ে হিটলারের অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টা।

১৯৩২ ,, —নাৎসীদল আইন-সভায় একমাত্র বড় দলে পরিণত ও হিটলারের প্রধানমন্ত্রী-পদে নিযুক্তি।

১৯৩৪ ,, —প্রেসিডেণ্ট হিডেন্‌বুর্গের মৃত্যুর পর হিটলার একই সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী হন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১৯৩৩ খ্রীঃ—হিটলার জার্মানিকে জাতিসংঘ থেকে সরিয়ে আনেন।

১৯৩৮ ,, —হিটলার কর্তৃক অস্ট্রিয়া দখল।

১৯৩৯ ,, —চেকোশ্লোভাকিয়া দখল ও পোল্যাণ্ড আক্রমণ।

১৯৩১ ,, —জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখল।

১৯৩৬ ,, —জার্মানি ও জাপানের মধ্যে 'কমিণ্টার্ন-বিরোধী' চুক্তি।

১৯৩৭ ,, —ইটালীর 'কমিণ্টার্ন-বিরোধী' চুক্তিতে যোগদান।

১৯৩৯ ,, —জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ-চুক্তি স্বাক্ষর।

১৯৩৯ ,, ১লা সেপ্টেম্বর—হিটলার কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণ।

১৯৩৯ ,, ৩রা সেপ্টেম্বর—ইংলণ্ড ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা।

ষোড়শ অধ্যায়

অসহযোগ আন্দোলন

১৯২০ খ্রীঃ—কলকাতা কংগ্রেসে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপন্থা গ্রহণ।

১৯২২ ,, —অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা।

১৯২৪ ,, —মহাত্মা গান্ধীর জেল থেকে মুক্তি।

১৯২৭ ,,—সাইমন কমিশনের আগমন। মাদ্রাজ কংগ্রেসে পূর্ণস্বরাজের প্রস্তাব গ্রহণ।
১৯২৮ ,, —কলকাতা কংগ্রেসে নেহেরু-রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা।
১৯২৯ ,, —বড়লাট আরউইন কর্তৃক ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ও লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের আদর্শ গ্রহণ।
১৯২৯ ,, ৩০শে ডিসেম্বর—জওহরলাল নেহেরুর ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত।
১৯৩০ ,, ২৬শে জানুয়ারী—স্বাধীনতা দিবস পালন।
১৯৩১ ,, —গান্ধীজী ও আরউইন চুক্তি।
১৯৩৫ ,, —ভারত সরকার আইন পাস।
১৯৩৯ ,, —দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু ও কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা ত্যাগ।
১৯৪০ ,, —লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগের "পাকিস্তান" প্রস্তাব গ্রহণ ও ভাইসরয় কর্তৃক ভারতকে যুদ্ধশেষে ডোমিনিয়ন মর্যাদা দানের প্রতিশ্রুতি।
১৯৪২ ,, ১৪ই জুলাই—কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" প্রস্তাব গ্রহণ।
১৯৪২ ,, ৭ই আগস্ট—অহিংস গণ-আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
১৯৪২ ,, ৯ই আগস্ট—গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজ

১৯৪৩ খ্রীঃ, জুন—সুভাষচন্দ্রের জার্মানি থেকে টোকিওতে আগমন।
১৯৪৩ ,, ২১শে অক্টোবর—সুভাষচন্দ্র কর্তৃক স্বাধীন ভারত সরকার গঠনের কথা ঘোষণা।

ক্ষমতা-হস্তান্তর ও স্বাধীনতা-লাভ

১৯৪৬ খ্রীঃ, ১৮ই ফেব্রুয়ারি—বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ।
১৯৪৬ ,, —সংবিধান-সভার নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন।
১৯৪৬ ,, ২রা সেপ্টেম্বর—জওহরলাল নেহরুর অন্তর্বর্তী সরকার গঠন।
১৯৪৭ ,, ১৫ই আগস্ট—ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভ।

সপ্তদশ অধ্যায়

চীনের বিপ্লব

১৯১২ খ্রীঃ—সান্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।
১৯১৬ ,, —ইউয়ান্-সিকাই-এর মৃত্যু।
১৯১৭ ,, —ডাঃ সান্ কর্তৃক ক্যান্টনে প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠন।

১৯১৯ খ্রীঃ—চীনে ৪ঠা মে আন্দোলন।
১৯২৫ „ —ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেনের পরলোকগমন।
১৯২১ „ —চীনে কমিউনিস্ট দলের সৃষ্টি হয়।
১৯২২ „ —ডাঃ সানের সঙ্গে সেনাপতি জেনারেল চেন্-এর মতবিরোধ।
১৯২৩ „ —ডাঃ সান্-ইয়াৎ-সেন পুনরায় চীন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।
১৯২৬ „ —উত্তরে চীন অভিযানের সময় চিয়াং কাইশেকের সঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরোধ।
১৯২৮ খ্রীঃ—চিয়াং কাইশেক পিকিং দখল করেন।
১৯৩৪ „ অক্টোবর—মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে লং-মার্চের শুরু।
১৯৩৫ „ অক্টোবর—মাও-সে-তুং-এর বিখ্যাত লং-মার্চের শেষ।
১৯৩১ „ —জপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে।
১৯৩৬ „ —সিয়াং-এ চিয়াং কাইশেক নিজ-সৈন্যের হাতে বন্দী হন। কমিউনিস্ট-দের ও চিয়াং-এর মধ্যে চুক্তি।
১৯৪৫ „ —চীনে গৃহযুদ্ধ পুনরায় শুরু হয়।
১৯৪৯ „ —লাল সেনা পিকিং দখল করে।

ইন্দোচীন

১৯৪৫ খ্রীঃ, আগস্ট—গণতান্ত্রিক ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।
১৯৪৬ „ —বাও দাই-এর নেতৃত্বে পুতুল-সরকার প্রতিষ্ঠিত।
১৯৫৪ „ —দিয়েন্ বিয়েন্ ফু'র বিখ্যাত যুদ্ধ ও জেনেভাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন।
১৯৬০ „ —আমেরিকার হস্তক্ষেপ।
১৯৭৫ „ ৩০শে এপ্রিল—আমেরিকার সৈন্য অপসারণ।

ব্রহ্মদেশ

১৯৩৭ খ্রীঃ—ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করা স্বায়ত্তশাসন লাভ।
১৯৪২ „ —বাম'র নেতৃত্বে স্বাধীন সরকার।
১৯৪৭ „ অক্টোবর—বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এট্‌লীর স্বাধীনতা-চুক্তিতে সই।
১৯৪৮ „ ৪ঠা জানুয়ারি—ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা লাভ।

মালয়েশিয়া

১৯০৯ খ্রীঃ—মালয়েশিয়া বৃটিশ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।
১৯৪৮ „ —মালয় ফেডারেশন সৃষ্টি।
১৯৫৭ „ —পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ।

ইন্দোনেশিয়া

১৮০০ খ্রীঃ—ডাচদের দখল।

১৯০৮ „ — জাতীয়তাবাদী সংস্থা "বুডি উতামো" প্রতিষ্ঠা।

১৯১২ „ —'সারেকত ইসলামে'র স্বাধীনতা দাবি।

১৯১৯ „ —কমিউনিস্ট দল তৈরি।

১৯৪৯ „ ২রা নভেম্বর—হেগে স্বাধীনতা-আলোচনা শুরু।

১৯৪৯ „ ২৭শে ডিসেম্বর—স্বাধীনতা লাভ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ

১৯৪১ খ্রীঃ—"অতলান্তিক চার্টার" ঘোষণা।

১৯৪২ „ —২৬টি দেশের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণা প্রচার।

১৯৪৩ „ —রাশিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড ও চীনের মস্কো-ঘোষণা।

১৯৪৫ „ —আমেরিকার সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো শহরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ গ্রহণ।

১৯৪৮ „ —পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সরকারে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব বৃদ্ধি।

১৯৪৯ „ —মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনে কমিউনিস্ট দল ক্ষমতায় আসে।

১৯৪৭ „ —ফ্রান্সে কমিউনিস্ট দলের সরকার ত্যাগ ও ইটালীতেও কমিউনিস্ট দলের সরকার ত্যাগ।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও :

১। ইউরোপের মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতি কিসের দান? ২। সামন্তরা তাদের জমি কি করতেন? ৩। জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে তাদের প্রাপ্য কিসে নিতেন? কোন্ জাতীয় ফসল চাষ করলে জমির উর্বরতা বাড়ে? ৫। বাড়তি শস্য কৃষকরা কি করত?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। মধ্যযুগের শেষদিকে — — নানাবিধ পরিবর্তন দেখা দেয়।
২। মধ্যযুগে সমাজ ও অর্থনীতি —— দান।
৩। সামন্তরা তাদের সমস্ত জমি নির্দিষ্ট —— কাউকে দিয়ে দিত।
৪। জমিদারেরা হয় —— বা —— ভাড়া নিতেন।
৫। এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা —— ব্যবসা শুরু করল।
৬। কারিগররা মূলধনীর অধীনে —— পরিণত হল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও :

১। 'নবজাগরণ' শব্দটির অর্থ কি? ২। সাধারণভাবে নবজাগরণ বলতে কি বোঝায়? ৩। নবজাগরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? ৪। ইউরোপ তার মধ্যযুগীয় তন্দ্রা থেকে মুক্তি পায় কখন? ৫। নেদারল্যাণ্ডের একজন চিত্রশিল্পীর নাম কর। ৬। দান্তে কোন্ দেশের কবি ছিলেন? ৭। দান্তের নিজস্ব ভাষা কি ছিল? ৯। "ক্যাণ্টারবেরী টেল্স" কার রচনা? ৯। জিওফ্রে চসারের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কি? ১০। "ডন্ কুইট্জোট" নামক বইটি কার লেখা? ১১। টেলিস্কোপ কে আবিষ্কার করেন?

(খ) সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও :

১। নবজাগরণের প্রথম শুরু হয়—ফ্রান্সে/জার্মানিতে/ইংলণ্ডে। ২। "দ্বিতীয় এথেন্স" আখ্যা দেওয়া হয় কোন্ শহরকে?—মিলান/ভেনিস/ফ্লোরেন্স। ৩। "প্যারাডাইস লস্ট" ও "প্যারাডাইস রিগেণ্ড"—মহাকাব্য দুটির লেখক—শেক্স্পীয়র/মিলটন/র‍্যামব্র্যাণ্ট। ৪। "ডন কুইট্জোট" বইটির লেখক—বেকন্/সার্ভান্তিস্/শেক্স্পীয়র ৫। "মোনালিসা"

চিত্রটির শিল্পী—রোজার বেকন্/স্যার ফ্রান্সিস্ বেকন্/লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি। ৬। ছাপার যন্ত্র আবিষ্কার করেন—দান্তে/গ্যালিলিও/যোহান্ গুটেন্বার্গ।

(গ) নিম্নলিখিত চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিকগণ কোন্ কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন ?

লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, রাফায়েল, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, র‍্যামব্র্যান্ট, রুবেন, ইরাস্মাস, মিরটন, খ্রীস্টফার মার্লো, সারভান্তিস্, শেক্স্পীয়র, আইক্ ভ্রাতৃদ্বয় ও আল্ব্রেক্ট ডুয়ার।

(ঘ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। নবজাগরণ শব্দটির মূল অর্থ — ।
২। ব্যাপকভাবে বুঝতে গেলে নবজাগরণ হল মানুষের —, — ।
৩। মধ্যযুগের ইউরোপে সবকিছু — ঘিরে আবর্তিত হত।
৪। নবজাগরণ প্রথম শুরু হয় — ।
৫। মিলানে — চেষ্টায় নবজাগরণ হয়।
৬। — ছিলেন একজন বিখ্যাত জার্মান চিত্রশিল্পী।
৭। দান্তে ছিলেন — দেশের প্রতিভাশালী কবি।
৮। "ক্যান্টারবেরী টেল্স" রচনা করেন — ।
৯। উইলিয়ম শেক্স্পীয়রের রচিত মিলনান্ত নাটক (ক) — (খ) — ।
১০। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির প্রথম ছবি — ।
১১। রোজার বেকন্ একজন — ছিলেন।
১২। কোপারনিকাস ছিলেন — যাজক।

তৃতীয় অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। পর্তুগালের যুবরাজের নাম কি ছিল? ২। বারথেলোমিউ ডিয়াজ কত খ্রীষ্টাব্দে সমুদ্রযাত্রা করেন ? ৩। ভাস্কো-ডা-গামা কে ছিলেন ? ৪। বাল্বোয়া কে ছিলেন ? ৫। কেব্রালের সঙ্গী ছিলেন কে ? ৬। কলম্বাস কে ছিলেন ? ৭। আমেরিগো ভেস্পুচি কে ছিলেন ?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর।

১। ইউরোপীয় সভ্যতায় — দান অপরিসীম।
২। ভৌগোলিক আবিষ্কারে — সব থেকে আগ্রহী ছিল।
৩। বারথেলোমিউ ডিয়াজ ছিলেন একজন — ।

৪। ভাস্কো-ডা-গামা — খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা করেন।
৫। আমেরিগো ভেস্পুচি ছিলেন —।
৬। ভৌগোলিক আবিষ্কারের দুঃখজনক ফল হল — —।

(গ) নিম্নলিখিত খ্রীষ্টাব্দগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব লেখ ঃ
১৪৯৮ খ্রীঃ, ১৫০০ খ্রীঃ, ১৫০১ খ্রীঃ, ১৫০৯ খ্রীঃ, ১৫১৩ খ্রীঃ।

চতুর্থ অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের পোপ ও যাজকরা কি ধরনের জীবনযাপন করতেন? ২। সাধারণ লোকের ওপর করের বোঝা অত্যধিক হত কেন? ৩। ইংলণ্ডের কে প্রথম যাজকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন? ৪। কে ইংরেজীতে বাইবেল অনুবাদ করেন? ৫। জন হাসের মতে শেষ বিচারক কে? ৬। মার্টিন লুথার কে ছিলেন? ৭। ক্যাল্ভিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ৮। জেসুইট সংঘের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? ৯। কত খ্রীষ্টাব্দে ইউট্রেক্ট-এর সন্ধি হয়?

(খ) নিম্নলিখিত খ্রীষ্টাব্দগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব লেখ ঃ

১৫১০ খ্রীঃ, ১৫৩৪ খ্রীঃ, ১৫৩০ খ্রীঃ, ১৫৫৫ খ্রীঃ, ১৫২১ খ্রীঃ, ১৫৪৮ খ্রীঃ, ১৫৮৪ খ্রীঃ।

(গ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। ষোড়শ শতাব্দীতে চার্চ ও গির্জার পোপ ও উচ্চপদস্থ যাজকরা — জীবনযাপন করতেন।
২। ইন্ডাল্জেন্স কথার অর্থ —।
৩। জুইংলির মত ছিল —।
৪। "দি ইনষ্টিটিউট" নামক গ্রন্থের লেখক ছিলেন —।
৫। আত্মশুদ্ধির আন্দোলনের প্রথম শুরু হয় —।
৬। বর্তমান — ও — নিয়ে গঠিত ছিল নেদারল্যাণ্ড।
৭। নেদারল্যাণ্ডে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন —।
৮। — সঙ্গে বন্ধুত্ব না থাকলে — ওপর কর্তৃত্ব রাখা মুশকিল।

পঞ্চম অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। পার্লামেণ্ট ও রাজার মধ্যে বিবাদের মূল কারণ কি ছিল? ২। পার্লামেণ্ট "অধিকারের আবেদন" জানায় কেন? ৩। প্রথম চার্লস কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন? ৪। ক্যাভলিয়ার কাদের বলা হত? ৫। ইংলণ্ডের গৃহযুদ্ধ কখন শুরু হয়? ৬। অলিভার ক্রম্ওয়েল কে ছিলেন? ৭। অলিভার ক্রম্ওয়েল পার্লামেণ্ট ভেঙ্গে দেন কেন? ৮। কত খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব হয়? ৯। গৌরবময় বিপ্লবের পর ইংলণ্ডে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজারা —— বিশ্বাসী ছিলেন।
২। স্টুয়ার্ট রাজত্বকালে পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য নির্বাচিত হতেন — থেকে।
৩। পার্লামেণ্ট ও রাজার মধ্যে বিবাদের মূল কারণ ছিল — —।
৪। পার্লামেণ্টের বেশির ভাগ সদস্য ছিলেন ——।
৫। প্রথম চার্লসের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা —— নামে পরিচিত।
৬। যাঁরা পার্লামেণ্টের পক্ষে ছিলেন তাঁদের ——বলা হত।
৭। পার্লামেণ্ট এক —— প্রতিষ্ঠা করেন।
৮। দ্বিতীয় জেম্স ছিলেন —— পন্থী।
৯। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেণ্ট —— পাস করে।

(গ) নিম্নলিখিত খ্রীষ্টাব্দগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব লেখ ঃ

১৬৪৯ খ্রীঃ, ১৬৫৩ খ্রীঃ, ১৬৬০ খ্রীঃ, ১৬৮৭ খ্রীঃ, ১৬৮৯ খ্রীঃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। মুঘলদের ভাষা কি ছিল? ২। বাবরের আসল নাম কি? ৩। বাবরের সঙ্গে ইব্রাহিম লোদীর কোথায় যুদ্ধ হয়? ৪। কত খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়? ৫। গোগ্রার যুদ্ধ কার কার সঙ্গে হয়? ৬। কোন্ যুদ্ধে শের খান হুমায়ুনকে পরাজিত করেন? ৭। শের শাহের আসল নাম কি ছিল? ৮। মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? ৯। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়? ১০। শাহজাহানের পর দিল্লীর সিংহাসনে কে বসেন? ১১। আকবরের রাজত্বকালে কোন্ বিদেশী পর্যটক ভারতে আসেন? ১২। ফারুকশিয়ার কে ছিলেন? ১৩। কত খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানি গঠিত হয়? ১৪। কত খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর জন্ম হয়েছিল? ১৫। কত খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়? ১৬। বাজীরাও-এর পুত্রের নাম কি ছিল? ১৭। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে কারা পরাজিত হয়? ১৮। শিখদের নবম গুরুর নাম কি ছিল? ১৯। পেশোয়াতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কে?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। ভারতের ইতিহাসে সুলতানী রাজত্বের পর ——রাজত্ব আরম্ভ হয়।
২। মুঘলদের শরীরে——ও ——রক্তের মিলন ঘটেছিল।
৩। বাবরের আসল নাম ছিল ——।
৪। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ——পরাজিত হন।
৫। খানুয়ার যুদ্ধে——পরাজিত হন।
৬। শের খান—— নামক স্থানে হুমায়ুনকে পরাজিত করেন।
৭। শের শাহের আসল নাম ছিল——।
৮। ঔরঙ্গজেব শিখগুরু——কে হত্যা করেন।
৯। আকবরের অভিভাবক ছিলেন——।
১০। দাক্ষিণাত্যের——আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে।
১১। বিদেশী পর্যটক——মুঘলযুগের শাসনব্যবস্থার ভিতরের চিত্র তুলে ধরেছেন।

(গ) সঠিক উত্তর দাও ঃ

১। নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করেন—১৫২৬ খ্রীঃ/১৭৬১ খ্রীঃ/১৭৩৯ খ্রীঃ। ২। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ হয়—১৫২৬ খ্রীঃ/১৫৫৬ খ্রীঃ/১৭৬১ খ্রীঃ। ৩। "আলমগীর" উপাধি গ্রহণ করেন কোন্ মুঘল সম্রাট—আকবর/জাহাঙ্গীর/ঔরঙ্গজেব। ৪। "আদিগ্রন্থ" সংকলিত করেন—নানক/হরগোবিন্দ/অর্জুন। ৫। শিখগুরু অর্জুন সিংকে হত্যা করেন—জাহাঙ্গীর/আকবর/শাহজাহান। ৬। বিদেশী পর্যটক বার্নিয়ে ভারতে আসেন—আকবর/শাহজাহান/ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে।

(ঘ) নিম্নলিখিত যুদ্ধগুলি কার কার সঙ্গে হয় ঃ

পানিপথের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুদ্ধ। খানুয়ার যুদ্ধ, গোগ্রার যুদ্ধ, চৌসার ও বিলগ্রামের যুদ্ধ, সরহিন্দের যুদ্ধ ও হলদিঘাটের যুদ্ধ।

সপ্তম অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। কোন্ যুদ্ধের পর ভারতে ইংরেজদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে? ২। কত খ্রীষ্টাব্দে সিরাজদ্দৌলা বাংলার নবাব হন? ৩। সিরাজের পর বাংলার নবাব হন

কে? ৪। 'দস্তক' বলতে কি বোঝ? ৫। বক্সারের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে কার কার সঙ্গে হয়? ৬। নানা ফড়নবীশ কে ছিলেন? ৭। হায়দর আলি কে ছিলেন? ৮। কখন তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ শুরু হয়? ৯। ব্রহ্মদেশের রাজার নাম কি ছিল? ১০। রণজিৎ সিং কে ছিলেন? ১১। দোস্ত মহম্মদ কে ছিলেন?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর:

১। ——যুদ্ধের পর ভারতে ইংরাজদের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে।
২। আলিবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর——বাংলার নবাব হন।
৩। সিরাজের পর বাংলার নবাব হন——।
৪। ——খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ হয়।
৫। মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর——পেশোয়া হন।
৬। ——খ্রীষ্টাব্দে হায়দার আলির মৃত্যু হয়।
৭। টিপুর সঙ্গে ইংরাজদের——সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়।
৮। ——রাজত্বকালে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ হয়।
৯। দোস্ত মহম্মদ ছিলেন——।
১০। প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শিখরা——সন্ধি স্বাক্ষর করে।
১১। সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম নেতা ছিলেন——।

(গ) নিম্নলিখিত নবাব ও গভর্নর জেনারেলদের রাজত্বকাল পর্যায়ক্রমে সাজাও:

১। মীরকাশিম, সিরাজদ্দৌলা, মীরজাফর ও আলীবর্দী খাঁ। ২। নারায়ণ রাও, মাধব রাও, রঘুনাথ রাও, মাধব রাও নারায়ণ। ৩। লর্ড ওয়েলেস্‌লী, ওয়ারেন হেষ্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিশ, লর্ড বেন্টিঙ্ক ও লর্ড ডালহৌসি।

(গ) নিম্নলিখিত খ্রীষ্টাব্দগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর:

১৭৫৭ খ্রীঃ, ১৭৬৫ খ্রীঃ, ১৭৮২ খ্রীঃ, ১৮০০ খ্রীঃ, ১৮২৬ খ্রীঃ, ১৮০৯ খ্রীঃ, ১৮৪৬ খ্রীঃ, ১৮৫৭ খ্রীঃ।

অষ্টম অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও:

১। আমেরিকা কে আবিষ্কার করেন? ২। কোন্ কোন্ জিনিস উপনিবেশগুলিকে ইংলণ্ড থেকে কিনতে হত? ৩। কোন্ কোন্ জিনিস একমাত্র ইংলণ্ড রপ্তানি করতে পারত? ৩। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? ৫। "স্ট্যাম্প

আইন" কে প্রবর্তন করেন ? ৬। "ঘোষণার আইন" পাস করা হয় কেন ? ৭। চা-এর ওপর কি পরিমাণ কর বসানো হয় ? ৮। লর্ড নর্থ কত খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আসেন ? ৯। "স্পিনিং জেনী" কে আবিষ্কার করেন ? ১০। বাষ্প-চালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন কে? ১১। পাকা রাস্তা তৈরীর উপায় উদ্ভাবন করেন কে কে ?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। ——আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

২। সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম উপকূলে——উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

৩। ——ছিল উপনিবেশগুলির শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৪। ——অনুযায়ী উপনিবেশগুলিকে কেবলমাত্র ইংলণ্ডের জাহাজেই পণ্য আমদানী-রপ্তানী করতে হত।

৫। ——ও—— কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই রপ্তানী করতে বাধ্য ছিল।

৬। শিল্প-বিপ্লব প্রথম দেখা দেয় ইউরোপে——।

৭। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে——নামে এক নাপিত——যন্ত্র আবিষ্কার করে।

(গ) নিম্নলিখিত সন্ধিগুলি কার কার সঙ্গে হয় ঃ

১। ভার্সাই-সন্ধি। ২। ক্যাম্পোকোমিওর সন্ধি। ৩। লুনেভিলের সন্ধি। ৪। এ্যামিয়েন্সের সন্ধি। ৫। প্রেস্‌বার্গের সন্ধি। ৬। টিল্‌জিটের সন্ধি।

নবম অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ইউরোপের ইতিহাসে কিসের যুগ বলা হয় ? ২। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি কার আমন্ত্রণে ভিয়েনাতে মিলিত হয় ? ৩। ভিয়েনা-সম্মেলনে নেতৃত্ব করে কোন্ কোন্ দেশ ? ৪। ভিয়েনা-সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কে ? ৫। মেটারনিক কে ছিলেন ? ৬। ইটালীর ঐক্য-আন্দোলন শুরু করে কারা ? ৭। ইটালীর গুপ্ত সংস্থার নাম কি ছিল ? ৮। ম্যাৎসিনির প্রতিষ্ঠিত দলের নাম কি ? ৯। গ্যারিবল্ডী কে ছিলেন ? ১০। কাভুর কে ছিলেন ? ১১। তৃতীয় নেপোলিয়ন কে ছিলেন ? ১২। বিসমার্ক কে ছিলেন ? ১৩। কোন্ যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হয় ? ১৪। লিওপোল্ড কে ছিলেন ? ১৫। "দাস ক্যাপিটাল" কার লেখা ?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে ইউরোপের ইতিহাসে ——থেকে——যুগ বলা হয়।

২। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি—আমন্ত্রণে ভিয়েনাতে মিলিত হয়।

৩। ভিয়েনা-সম্মেলনে নেতৃত্ব করে —, , —ও—।

৪। —, —, —ও—কে নিয়ে চতুঃশক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৫। চতুঃশক্তির—অধিবেশন হয়।

৬। ম্যাৎসিনির প্রতিষ্ঠিত দলের নাম — ।

৭। গ্যারিবল্ডীর সেনাবাহিনীর নাম ছিল — ।

৮। — খ্রীষ্টাব্দে "ফ্যাক্টরী আইন" চালু হয়।

(গ) সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও ঃ

১। "রাজত্ব করুন—পরিবর্তন করবেন না"—এই নীতি কার—বিস্‌মার্ক/কাভুর/মেটার্‌নিক। ২। ইটালীর ঐক্য-আন্দোলন শুরু করে—কার্বোনারী দল/নব্য ইটালী দল। ৩। জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করেন—গ্যারিবল্ডী/মেটার্‌নিক/বিস্‌মার্ক। ৪। দাস-প্রথা উচ্ছেদ করেন—জর্জ ওয়াশিংটন/আব্রাহাম লিঙ্কন। ৫। "মূলধনী ব্যবস্থার বিপরীত গুণগুলিই এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করবে"—কে বলেছেন? ফ্রেডারিক এ্যাঙ্গেল্‌স/কার্ল মার্কস/রবার্ট ওয়েন্‌।

দশম অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। ইউরোপীয়রা কেন চীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়? ২। চীনে কোন্‌ বংশীয় রাজারা বিদেশীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন? ৩। কত খ্রীষ্টাব্দে অহিফেন-যুদ্ধ হয়? ৪। টিয়েন্‌সিনের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে হয়? ৫। সিমনোসেকির সন্ধি কার কার সঙ্গে হয়? ৬। 'তাইপিং' কথার অর্থ কি? ৭। চীনের দ্বিতীয় রাজধানীর নাম কি? ৮। জুসি কে ছিলেন? ৯। আমেরিকানরা কত খ্রীষ্টাব্দে জাপানে আসেন? ১০। জাপানের সংবিধান কোন্‌ দেশের অনুকরণে তৈরি হয়? ১১। চীন-জাপান যুদ্ধে কে পরাজিত হয়? ১২। জাপানে 'শোগুন' কথার অর্থ কি?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। ভারতবর্ষের পরেই পাশ্চাত্য দেশসমূহের দৃষ্টি পড়ে —'র দিকে।

২। —সন্ধি দ্বারা অহিফেনের-যুদ্ধের অবসান হয়।

৩। খ্রীষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধ হয়।

৪। ১৮৫০ খ্রীঃ তাইপিং সেনাদল—সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

৫। —চীনে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন।

৬। সান্‌-ইয়াৎ-সেন ছিলেন একজন — ।

৭। —খ্রীষ্টাব্দে চীনে—ঘোষিত হয়।

৮। —ছিলেন চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

(গ) ঘটনাগুলি পর্যায়ক্রমে সাজাও ঃ

বক্সার যুদ্ধ, তাইপিং বিদ্রোহ, চীনে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, অফিহেনের যুদ্ধ, চীন-জাপান যুদ্ধ।

একাদশ অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। ভারতে কোম্পানী শাসনের অবসান হয় কখন? ২। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে ভারতের শাসনভার কাকে দেওয়া হয়? ৩। ভারত-সচিবকে সাহায্য করবার জন্য কারা ছিল? ৪। লর্ড ক্যানিং-এর পর কে ভারতে ভাইসরয় হন? ৫। দোস্ত মহম্মদ কে ছিলেন। ৬। লর্ড ডিস্‌রেলী কে ছিলেন? ৭। দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে কে পরাজিত হয়? ৮। দালাই লামা কে ছিলেন? ৯। ভারতে নবজাগরণের পথিকৃৎ কে ছিলেন? ১০। ভারতের জনক কাকে বলা হয়? ১১। ব্রাহ্ম-সমাজ কত খ্রীষ্টাব্দে কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১২। শুদ্ধি-অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেন কে? ১৩। ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত করেন কে? ১৪। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন কে? ১৫। বালগঙ্গাধর তিলক কে ছিলেন?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। ভারতের গভর্নর জেনারেলকে — বলা হয়।
২। দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে — পরাজিত হয়।
৩। ব্রহ্মদেশের রাজার নাম ছিল —।
৪। — আত্মীয়-সভা প্রতিষ্ঠা করেন।
৫। — খ্রীষ্টাব্দে — ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
৬। — দাক্ষিণাত্যের শিক্ষা-সমিতি গঠন করেন।
৭। — থিওসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।
৮। উগ্রপন্থী নেতা — পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের উৎসাহ দেন।

(গ) সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও ঃ

১। "ডুরাণ্ড লাইন" টানা হয় —১৯০৩ খ্রীঃ/১৮৮৫ খ্রীঃ/১৮৯৩ খ্রীঃ। ২। লর্ড কার্জন ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন—১৮৯৯ খ্রীঃ/১৮০৭খ্রীঃ/১৮৫৮ খ্রীঃ। ৩। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন—তিলক/দামোদর সাভারকার/রামমোহন। ৪। প্রার্থনা-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন—তিলক/বিদ্যাসাগর/রানাডে। ৫। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় —লক্ষ্ণৌ/দিল্লী/বোম্বাই শহরে।

দ্বাদশ অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সম্রাটের নাম কি ছিল ? ২। বিস্‌মার্ক কত খ্রীষ্টাব্দে ত্রিশক্তি-চুক্তি করেন ? ৩। কত খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয় ? ৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ কি ছিল ? ৫। জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করে কেন ? ৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে কোন্ কোন্ রাজবংশের পতন হয় ? ৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে রাশিয়াতে কি প্রতিষ্ঠিত হয় ? ৮। গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় কোথায় ? ৯। লক্ষ্ণৌ-চুক্তি সাক্ষরিত হয় কত খ্রীষ্টাব্দে ? ১০। মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড আইন পাস হয় কত খ্রীষ্টাব্দে ? ১১। রাওলাট আইন কত খ্রীষ্টাব্দে পাস হয় ? ১২। জালিয়ানওয়ালাবাগ কোথায় অবস্থিত ?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। — ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সম্রাট।
২। উইলিয়ামের — ও — সাম্রাজ্যগঠনের স্বপ্ন ইংলণ্ডের স্বার্থের বিরোধী ছিল।
৩। বল্‌কান অঞ্চলে — ও রাশিয়া ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী।
৪। রাশিয়া ছিল —র সমর্থক।
৫। সার্বিয়া এক স্বাধীন — রাষ্ট্র।
৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে — সাফল্য লাভ করে।
৭। গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় —।
৮। — খ্রীষ্টাব্দে মন্টেগু-চেম্‌সফোর্ড আইন পাস করেন।
৯। রাওলাট আইনের চরম পরিণতি ঘটে পাঞ্জাবের —।
১০। — ছিল ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ প্রতিনিধি —।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। রাশিয়ার সম্রাটকে কি বলা হত ? ২। রোমান বংশ রাশিয়াতে কতদিন বাস করে ? ৩। রাশিয়ার শাসনব্যবস্থা কি রকম ছিল ? ৪। রাষ্ট্রে সব ক্ষমতার উৎস ছিলেন কে ? ৫। রাসপুটিন কে ছিলেন ? ৬। শ্লাভরা কাদের অনুগামী ছিল ? ৭। 'ভদ্‌কা' বলতে কি বোঝ ? ৮। "মেনশেভিক" কাদের বলা হত ? ৯। "বল্‌শেভিক" কাদের বলা হত ? ১০। রুশ-বিপ্লবের প্রত্যক্ষ কারণ কি ? ১১। ট্রট্‌স্কি কে ছিলেন ? ১২। যোশেফ স্টালিন কে ছিলেন ?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের ইতিহাসে অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা রাশিয়ার— বিপ্লব।
২। রাশিয়ার সম্রাটকে — বলা হত।

৩। রোমান বংশ রাশিয়াতে — বছর রাজত্ব করে।
৪। জার —— রাজত্ব করতেন।
৫। জারের — ও — পত্রই ছিল আইন।
৬। 'মির' কথার অর্থ —।
৭। 'ডুমা' শব্দের অর্থ —।
৮। সাম্যবাদী ভাবধারা — বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
৯। সাম্যবাদ — বিরোধী ছিল।
১০। রাশিয়ার বল্‌শেভিক বিপ্লব — অবসান ত্বরান্বিত করে।

(গ) নিম্নলিখিত খ্রীষ্টাব্দগুলি কিসের জন্য বিখ্যাত ঃ

১৮৮৩ খ্রীঃ, ১৮৯৮ খ্রীঃ; ১৯০৫ খ্রীঃ, ১৯১৭ খ্রীঃ, ১৯১৮ খ্রীঃ, ১৯১৯ খ্রীঃ।

চতুর্দশ অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও ঃ

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়? ২। কোন্ সন্ধি দ্বারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়? । কত খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়? ৪। যুদ্ধ-বিরতির পর পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ ফ্রান্সের আমন্ত্রণে কোথায় মিলিত হয়? ৫। ক্লেমেন্‌সো কে ছিলেন? ৬। জার্মানরা ভার্সাই-সন্ধিকে কি বলে? ৭। জাতিসংঘ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ৮। বেনিত্তো মুসোলিনী কি ছিলেন? ৯। হিটলার যে দল গঠন করেন, তার নাম কি? ১০। হিটলারের পররাষ্ট্র-নীতির উদ্দেশ্য কি ছিল? ১১। জাতিসংঘের সদর-দপ্তর ছিল কোথায়?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ — খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়?
২। ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন —।
৩। ইটালীর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন —।
৪। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে — সন্ধি হয়।
৫। হাঙ্গেরীর সঙ্গে — সন্ধি হয়।
৬। ফ্যাসিস্ট দলের সদস্যরা — পড়ত।
৭। — খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
৮। — ছিলেন জার্মানির প্রথম রাষ্ট্রপতি।

(গ) নিম্নলিখিত খ্রীষ্টাব্দগুলি কিসের জন্য বিখ্যাত ঃ—

১৯১৯ খ্রীঃ, ১৮৮৩ খ্রীঃ, ১৯১৮ খ্রীঃ, ১৮৮৯ খ্রীঃ, ১৯২৩ খ্রীঃ, ১৯৩২ খ্রীঃ,।

পঞ্চদশ অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও :

১। জার্মানি ভার্সাই-চুক্তির শর্তগুলি ভাঙ্গতে বদ্ধপরিকর ছিল কেন? ২। কত খ্রীষ্টাব্দে হিটলার রাইন অঞ্চল দখল করেন? ৩। কত খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে? ৪। রাশিয়া অনাক্রমণ-চুক্তি সই করতে রাজী হয় কেন? ৫। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয় কখন?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর স্বাক্ষরিত ভার্সাই-চুক্তির মধ্যে —— কারণ নিহিত ছিল।
২। জার্মানিতে — উত্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ।
৩। হিটলারের — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য বহুলাংশে দায়ী।
৪। — খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া দখল করে।
৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের — নামে এক আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে ওঠে।
৬। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী —, — ও — এই তিন শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়।

(গ) নিম্নলিখিত খ্রীষ্টাব্দগুলি কিসের জন্য বিখ্যাত :

১৯৩৩ খ্রীঃ; ১৯৩৮ খ্রীঃ, ১৯৩১ খ্রীঃ, ১৯৩৬ খ্রীঃ, ১৯৩৯ খ্রীঃ।

ষোড়শ অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও :

১। কংগ্রেস 'সাইমন কমিশন' বয়কট করে কেন? ৩। লর্ড আরউইন কে ছিলেন? ৩। "খোদাই খিদমতগার" কথার অর্থ কি? ৪। 'লালকোর্তা' কাদের বলা হত? ৫। ডাঃ আম্বেদকর কে ছিলেন? ৬। চার্চিল কে ছিলেন? ৭। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কে সরকার গঠন করেন?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। অসহযোগ আন্দোলনে — স্থান ছিল না।
২। — খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী জেল থেকে মুক্তি পান।
৩। — খ্রীষ্টাব্দে — পাস হয়।
৪। কংগ্রেস নেতা — চেষ্টায় নৌ-বিদ্রোহ শান্ত হয়।
৫। — ক্ষমতা হস্তান্তরের পরোয়ানা নিয়ে ইংলণ্ড থেকে ভারতে আসেন।

(গ) সঠিক উত্তরে দাগ দাও :

১। আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করেন — নেতাজী/রাসবিহারী বসু। । ভারতের শেষ ভাইসরয় ছিলেন — লর্ড ওয়াভেল/লর্ড মাউন্টব্যাটেন। ৩। মহম্মদ আলী জিন্না পাকিস্তান দাবি করেন কোন্ অধিবেশনে—লাহোর অধিবেশনে/কলকাতার অধিবেশনে/ বোম্বাইয়ের অধিবেশনে। ৪। ভারত সরকার-আইন পাস হয় কত খ্রীষ্টাব্দে — ১৯৩৬ খ্রীঃ/১৯৪২ খ্রীঃ/১৯৩৫ খ্রীঃ। ৫। রাওলাট আইন কত খ্রীষ্টাব্দে পাস হয়—১৯০২ খ্রীঃ/ ১৯১৬ খ্রীঃ/১৯১৯ খ্রীঃ।

সপ্তদশ অধ্যায়

(ক) এক কথায় উত্তর দাও :

১। চীনে সাধারণতন্ত্র কত খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়? ২। রাষ্ট্রপতি ইউ-য়ান্-সিকাই চীনে গণতন্ত্রের পরিবর্তে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন? ৩। কুয়োমিন্-তাঙ্ দলের প্রতিষ্ঠাতা কে? ৪। ইউ-য়ান্-সিকাই-এর মৃত্যুর পর চীনের সব ক্ষমতা কার হাতে চলে যায়? ৫। ডাঃ সানের জাতীয়তাবাদে কিসের প্রতি আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে? ৬। ডঃ সানের আদর্শ কি ছিল? ৭। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন কোন্ দলে যোগদান করে? ৮। "চীনের বিপ্লবের জনক" বলা হয় কাকে? ৯। ডাঃ সানের প্রধান শিষ্যের নাম কি ছিল? ১০। বোরোদিন কে ছিলেন? ১১। হো-চি-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের লোকেরা কোন্ দল গঠন করে? ১২। ব্রহ্মদেশে AFPFL গঠিত হয় কখন? ১২। মালয়ের নতুন নাম কি? ১৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোন্ আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়?

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর :

১। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সান্-ইয়াৎ-সেনের নেতৃত্বে চীনে — অবসান হয়ে — প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

২। ডাঃ সান্ স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতি-পদ ত্যাগ করে — সেই পদে বসান।

৩। নতুন রাষ্ট্রপতি গণতন্ত্রের বদলে — প্রতিষ্ঠা করলে বিপ্লবীরা হতাশ হয়ে পড়ে।

৪। বস্তুতপক্ষে চীন — ও — এর প্রজাতন্ত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

৫। —খ্রীষ্টাব্দে ইউ-য়ান্-সিকাই-এর মৃত্যুর পর চীনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে চীন — পক্ষে যোগ দিয়েছিল।

৭। — ছিলেন ডাঃ সানের শিষ্য।

৮। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান — দখল করে।

৯। — চীনা গণ-প্রজাতন্ত্রের — নির্বাচিত হন।

১০। ভিয়েতনামের বড় নেতা ছিলেন — ।

১১। ভিয়েতমিনদের সঙ্গে — র যুদ্ধ শুরু হয়।

১২। মালয়েশিয়া — অধিকারে ছিল।

(গ) সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও ঃ

১। নতুন রাষ্ট্রপতি চীনে কোন্ ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন — গণতন্ত্র/একনায়কতন্ত্র/প্রজা-সাধারণতন্ত্র। ২। কুয়োমিন্-তাঙ্ দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন — হো-চি-মিন/মাও-সে-তুং/সান-ইয়াৎ-সেন। ৩। ইউ-য়ান-সিকাই-এর মৃত্যু হয় — ১৯১৯ খ্রীঃ/১৯১২ খ্রীঃ/১৯১৬ খ্রীঃ। ৪। লাল বাহিনী পিকিং দখল করে — ১৯৪৯ খ্রীঃ/১৯৪৮ খ্রীঃ/১৯৪৭ খ্রীঃ। ভিয়েতনামের বড় নেতা ছিলেন—সুকর্ণ/চৌ-এন-লাই/হো-চি-মিন।